# অন্তত একজন

প্রভাস ভদ্র

অন্তত একজন / প্রভাস ভদ্র
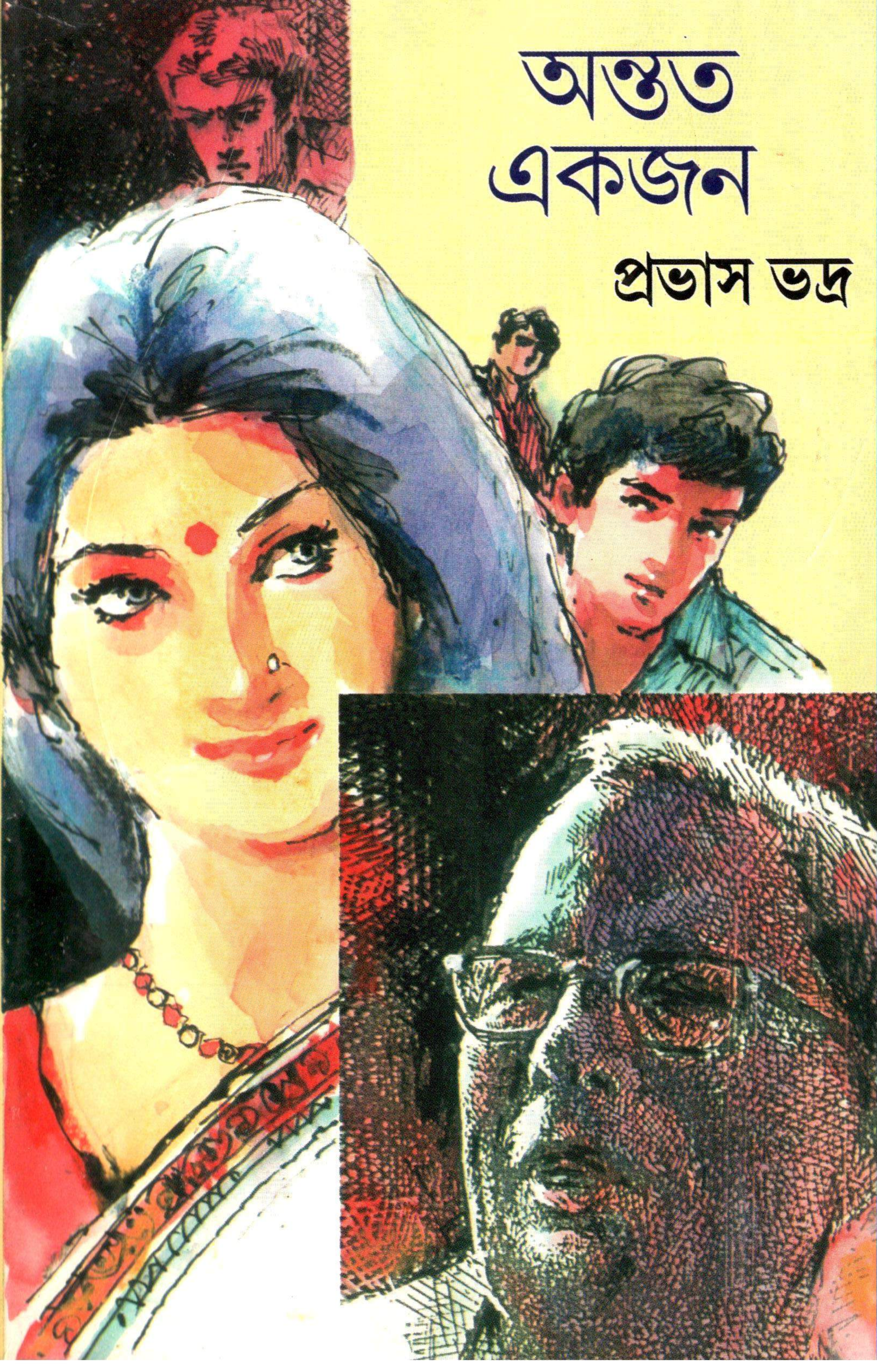
সুবর্ণরেখা

# অন্তত একজন

প্রভাস ভদ্র

সুবর্ণরেখা
৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

ANTATA EKJAN

*A collection of Short stories*

by

Provash Bhadra



প্রথম প্রকাশ

বইমেলা ২০০৬

প্রকাশক

ইন্দ্রনাথ মজুমদার

সুবর্ণরেখা

৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড

কলকাতা-৭০০ ০৭৩

বর্ণ বিন্যাস / মুদ্রক

স্মিতা আচারিয়া

অ্যাঞ্জেল প্রিন্টার্স

৯ নলিন সরকার স্ট্রীট

কলকাতা-৭০০ ০০৪

প্রচ্ছদ

সুধীর মৈত্র

মূল্য

একশো টাকা

সাংবাদিক

শ্রীহীরেন বসু

ও

সাহিত্যিক

শ্রীসমরেশ মজুমদার

সুহৃদ্বরেষু

## সূচী

লেখকের আরও অজস্র গল্প

যে সকল গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে

গল্প

গল্প দশক

সমকালের গল্প

সময়ের কণ্ঠস্বর

স্বয়ং নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী

সিম্ফনী

নীলনীলা

প্রাকৃতিক (যন্ত্রস্থ)

*'অন্তত একজন' গল্পটি নাট্যাকারে একাধিক মঞ্চে অভিনীত।*

# কালের কুশীলব

দেহাতি জায়গাটা ছিল শুনশান। পাকা সড়কের ধারে মাপা ব্যবধানে বড় বড় গাছের সারি। অশোক বট অশ্বত্থ সেগুন তেঁতুল আম আরও কত কী! ঝাঁকড়া পাতার আড়ালে বাদুর ডানা ঝাপটাত। পাখিরা কিচির মিচির ওড়াউড়ি করত। নয়নজুলির ওপারে ছিল আবাদি ক্ষেত জমি।

সড়ক দিয়ে তেমন কিছু যানবাহন যাতায়াত ছিল না। প্রায় রোজ ভোর রাতের দিকে পর পর অগুনতি পাট বোঝাই ভারী ট্রাক দেখতে পাওয়া যেত। রাত জাগার ক্লান্তিতে সেগুলির গতি থাকত ধীর, শান্ত। নিকট দূরের জুটমিলে যেত। বেশি চলত বার্মাসেলের তেল-ডিপোর ট্যাঙ্কার। নির্দিষ্ট কোনও সময় ছিল না। যখন তখন দাপিয়ে যেত। আঠারো চাকার পেল্লাই ট্যাঙ্কারগুলি তো মাটি কাঁপিয়ে রীতিমতো জানান দিত। দেখতেও ছিল ভয়ঙ্কর দৈত্যের মতো। ট্যাঙ্কারগুলির পেছনে ভু-ছুঁই লোহার শিকলি ঝুলত। পিচের রাস্তায় ঘর্ষণে শ্রুতিমধুর এক ধরনের ঝিন্ ঝিন্ শব্দ ছড়িয়ে পড়ত। পাকা ধানের মতো রিন্ রিন্ আবেশ সৃষ্টি করত।

তখনও জনপদ গড়ে ওঠেনি বলে কোনও বাস স্টপ ছিল না। কিন্তু কেউ হাত তুললে বাস দাঁড়াত। যাত্রী উঠতে পারত। আবার কোনও যাত্রী জনসননগরে যাবে বললে ঠিকঠাক নামিয়েও দেয়া হত।

বড় সড়ক থেকে দু'মাইল দূর নদীর কিনারা ইস্তক ছিল জনসন সাহেবের এলাকা। মোট এলাকার সিকিভাগ জুড়ে পত্তন করা হয়েছিল জুটমিল আর নগর। বাকি তিনভাগের মাঝের কিছুটা অংশ রেল কোম্পানির সম্পত্তি। অনেক আগে থেকেই লোকাল ট্রেনের লাইন পাতা ছিল।

তখন ইংরেজ আমল। আইন শৃঙ্খলা নিয়ম কানুনে বিন্দুমাত্র ঢিলাঢালা ভাব ছিল না। সহজ-সম্ভব ছিল না রেলের জমির ওপর দিয়ে প্রাইভেট রাস্তা নিয়ে যাওয়া। অনুমতি আদায়ের জন্য জনসন সাহেব চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

বড় সড়ক থেকে জনসননগর, মিল অব্দি চওড়া ছাতির সিধা রাস্তাটা কাঁচা অবস্থাতেই রয়ে গিয়েছিল। বর্ষায় দইকাদা থকথক করত। সেসময় পায়ে হাঁটাও অসম্ভব ছিল।

রেলপথই ছিল জনসননগর আর জুটমিলে যাওয়ার প্রধান ভরসা। ভারী মাল আমদানি রপ্তানির জন্য রেলস্টেশন থেকে জুটমিলের অন্দর পর্যন্ত নিজস্ব রেল লাইন বসিয়েছিলেন জনসন সাহেব। মিলের লাগোয়া জেটিতে জাহাজ গাদাবোট এসে ভিড়ত। পরের দিকে অবশ্য নদীর বাঁধের ওপর দিয়ে একটা পাকা রাস্তা বিস্তর ঘুরপথে সদরের সঙ্গে যোগসূত্র গড়েছিল। সহজ সিধা কাঁচা রাস্তাটা হয়ে পড়েছিল গুরুত্বহীন।

মূল্যবান আবাদি জমি অবহেলায় ফাঁকা ফেলে রাখা জনসন সাহেবের অপছন্দ ছিল। তাই নানা পরিকল্পনা নিয়েছিলেন। ছোটখাটো খামার লেক পার্ক গড়ে তুলেছিলেন। জলা জমিতে ধান পাট আখের চাষ করাতেন। মজা পুকুর ডোবাগুলিকে দিঘির আকারে আনিয়ে মাছ ছেড়েছিলেন। ডেয়ারি বসিয়েছিলেন।

এইসব অনেককাল আগেকার কথা।

কালে কালে বদলে যায় অনেক কিছুই। ইংরেজরা একসময় ভারত শাসন ছাড়তে বাধ্য হল। তামাম সাহেব ব্যবসায়ীরা ব্যবসা গুটিয়ে নিতে শুরু করলেন। জনসন সাহেব কিন্তু এ দেশকে ভালবেসে ফেলেছিলেন। তাই নানা স্বপ্ন নিয়ে থেকে গেলেন।

তারপর একসময় এল যখন মানুষ বিদেশী পুঁজিপতিদেরকে বিষদৃষ্টিতে দেখতে শুরু করল। এল জাতীয়করণের যুগ। মুনাফাখোরদের বিরুদ্ধে ট্রেড ইউনিয়ন। কর্তব্যে গাফিলতি। কঠোর শ্রমে অনীহা। নিষ্ঠায় ফাঁকি। প্রফেশনাল নেতাদের দালালি দাদাগিরি। রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে শ্রমিকে শ্রমিকে ভেদাভেদ, হানাহানি। কথায় কথায় কাম বন্ধ্ ঘেরাও। ওপরতলার সাহেবদেরকে পীড়ন, বেইজ্জতি।

জুটমিলের উৎপাদিত মালের গুণগত মান ক্রমশ হয়ে পড়ল নিম্নগামী। দেশ ও দেশের বাইরে দারুণ প্রতিদ্বন্দ্বিতার বাজারে পিছিয়ে পড়ছিল জনসন জুটমিল। প্রতিকার প্রতিরোধের কোনও উপায় খুঁজে পাচ্ছিলেন না জনসন সাহেব। নাকাল নাজেহাল পরিস্থিতিতে পড়ার আগেই সিদ্ধান্তটা নিয়ে ফেললেন তিনি। বিষয় আশয় ব্যবসা বিক্রিবাট্টা করে শেষমেশ পাড়ি দিলেন দেশে। নগর আর মিলের সঙ্গে 'জনসন' নামটা কিন্তু থেকেই গেল।

তিন বছরে তিন হাত ঘুরল জনসন জুট মিল। চতুর্থবার এক মারওয়াড়ি মালিকের মুঠোয় এসে তার হাত বদলে থিতু দিল।

তখন থেকেই অন্য এক ধরনের পরিবর্তন শুরু হল। ডেয়ারী খামার উঠে গেল। ধান পাট আখ মাছ চাষ বন্ধ। পরিবর্তে সিনেমা হল বসল একটা। নজরকাড়া মন্দির গড়া হল। থিক থিক গিজ গিজ কোয়ার্টার্স হল অজস্র। আগেকার মতো কম

ভাড়া না। ঢালাও মাগনা জল আলোর সুযোগ তুলে নেওয়া হল। ইলেকট্রিক মিটার বসল। জল সরবরাহ ব্যবস্থা নির্দ্দিষ্ট সময়মতো। আরও অনেক কিছু পরিবর্তন।

নতুন মালিকানায় সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ হল, রেল লাইনের ওপর দিয়ে সেতুবন্ধ। দীর্ঘকালের কাঁচা রাস্তাটা পাকা হয়ে গেল। শুনশান জায়গাটায় নতুন বাস স্টপের নাম হল জনসন মোড়।

জনসন মোড়ের দক্ষিণ দিকের গ্রামগুলির নাম ছিল হেতালখালি মিঠাপুকুর জেলেপাড়া ভুবনপুর শিবতলা। উত্তরদিকে মেহমানপুর চন্দনেশ্বর চিংড়িপোতা সানিপাড়া কাঞ্চনগাঁ। চাষী জেলে কুমোর ঘরামি গয়লা জনমজুর দর্জি—সবরকম লোকের মিলিজুলি বসবাস ছিল। বার্মা সেলের তেলের ডিপো জুটমিল আর জুতা কারখানায় কাজ করত অনেকে। সংখ্যায় খুবই কম। চাষবাসের বৃত্তিই ছিল বেশি। বিত্তবানেরা অধিকাংশই ছিল ব্যবসা বা উত্তরাধিকার সূত্রে ধানকল তেলকল ইটখোলার মালিক; নয়তো আড়তদার মহাজন পাইকারী কারবারী।

সদরমুখি অল্প দূরে খালপোল। বর্ষা ছাড়া অন্য সময় খালে না-থাকার মতো জল থাকত। পোল পার হলেই একদিকে জলা জমি ডোবা ঝোপ জঙ্গল। অন্যদিকে হরেক গাছাগাছালি পুকুর ডোবা ঘেরা হৃদয়পুর গাঁ। গাঁয়ে যাওয়ার বাস স্টপের নাম ছিল ন্যাড়া শিবতলা।

সেবার ইটখোলার মালিক গোবর্ধন নস্কর ভোটে দাঁড়িয়েছিলেন। ভোট প্রত্যাশায় বুড়ো বটের নিচে একটা ডিপ টিউবকল বসিয়েছিলেন। তো সেই থেকে লোক মুখে মুখে নতুন নাম হয়ে গেল জলকল। আর একবার পাট চালের আড়তদার ধনঞ্জয় মল্লিক ভোটপ্রার্থী হয়ে চন্দনেশ্বর গাঁয়ে যাওয়ার কেঠো পোল ভেঙে দিলেন। পরিবর্তে পাকাপোক্ত কালভার্ট গড়লেন। ব্যস, তেঁতুলতলা বাস স্টপের নাম বদলে নতুন নাম হল মল্লিক বাঁধ। এভাবেই তল্লাটের বাস স্টপগুলির নাম হয়েছিল প্রাণহরি পাঠশালা পালেদের রথতলা ক্ষুদি মন্ডলের ইশকুল বিজলিবাবুর প্রসূতিভবন নয়নতারার মাঠ—আরও অনেক রকম।

জনসননগরের রাস্তাটা ছিল মসৃণ ঝকঝকে। দু'ধারে সারিবদ্ধ কৃষ্ণচূড়া রাধাচূড়া গাছ বসানো হয়েছিল। থোক থোক লাল হলুদ ফুল ফোটার সময় দেখতে দারুণ লাগত।

প্রাইভেট রোড বলে প্রথম দিকে জনসননগরে সাধারণ যানবাহন চলায় বিধিনিষেধ ছিল। রাস্তার ওপর শাল বল্লার বাধা ঝুলিয়ে একজন রক্ষী পাহারা দিত। রুট চার্টে না থাকায় বাস ঢুকত না।

জনসন মোড়ে ক'খানা রিক্‌শা দাঁড়িয়ে থাকত। প্যাডেল মেরে অনেকটা উঁচু

জনসন ব্রিজ টপকানো খুবই কষ্টসাধ্য কাজ ছিল। তাই দুমদাম ভাড়া হাঁকত যাচ্ছেতাই। আবার প্রতিদিন পায়ে পায়ে দু'মাইল পথ পেরিয়ে জুটমিলের ভারী পরিশ্রমের কাজ করাও সম্ভব না। ফলে জনসননগরের অত সুন্দর রাস্তাটা কর্মীদের কোনও উপকারেই আসছিল না। এদিকে সিনেমা হলে সদ্য মুক্তি পাওয়া ছবি আনলে কী হবে, ওই যাতায়াতের অসুবিধার জন্যই দূরের দর্শক টানতে পারছিল না।

নিজেদের স্বার্থেই দীর্ঘ তদবির তদারকির পর একসময় জনসননগরে বাস ঢোকা চালু হল।

হঠাৎই একদিন ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুরের সময় দেখা গেল, জনসন মোড়ের ঝাঁকড়া পাতার বটগাছের নিচে এসে একটা ট্রাক দাঁড়াল। ট্রাকের ওপরে টিনের চালঅলা কাঠের একটা গুমটিঘর।

দু'জন খালাসি ট্রাক থেকে নেমে মেহমানপুরের দিকে গেল। কিছুক্ষণ পরেই ওরা আবার ফিরে এল। সঙ্গে বেশ কয়েকজন শক্তপোক্ত চেহারার জনমজুর।

খালাসি দু'জন ট্রাকের ডালা খুলে দিল। তারপর এককাট্টা সকলে অনেক ঘাম ঝরিয়ে ট্রাকের ওপর থেকে গুমটিঘরটা নামাল। সেটাকে ধরাধরি করে বটের ছায়াঘেরা ফাঁকা খাস জমিতে নিয়ে রাখল। যত্নআত্তি করে ঠিকঠাক বসিয়ে দিল। ভেতরে পাতল ছোট্ট একটা টেবিল আর টুল। তারপর ঝাঁপ বন্ধ করে তালা এঁটে দিল।

পরদিন ফার্স্ট বাসে একজন সর্দারজী এসে হাজির হল। নাম কর্তার সিং। মাঝবয়েসী কর্তারের পরনে ডোরাকাটা লুঙ্গি আর কুর্তা। মাথায় পাগড়ি নেই। ঝুঁটি করে চুল বাঁধা। তাগড়াই গোঁফ। গোঁফ দাড়ি চুল আধপাকা। দাঁতগুলি বেশ নিখুঁত ঝকঝকে। দেখলেই মালুম হয়, নকল নয়।

গুমটির তালা খুলে ভেতরে টুলে বসল কর্তার। কুর্তার পকেট থেকে সীল করা একটা কাঠের মোড়ক সুমুখে টেবিলের ওপর রাখল। চ্যাপ্টা মোড়কটার একদিকের কিছুটা অংশ গোল করে কাটা। সেই ফোঁকড় দিয়ে ঘড়ি দেখা যাচ্ছিল একটা।

টাইম কিপার হিসেবে একা কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল কর্তার। দিন সাতেক পরে বছর পনেরো ষোল বয়সী গাট্টাগোট্টা একটি ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে কাজে এল। সুশ্রী ছেলেটির নাম ভরত। জন্ম উড়িষ্যার অভাবী গাঁ-ঘরে। ভরতের চোখ দুটো গোল গোল উজ্জ্বল। মাথায় ঝাঁকড়া কুচকুচে কালো চুল। পরনে ছেঁটে হাফ করা প্যান্ট আর বেমানান বড় তাপ্পি দেওয়া শার্ট।

এখন আপ ডাউনের সব বাসই এক চক্কর জনসননগর ঘুরে আসে। তারপর মোড়ে দম ছেড়ে দিয়ে দাঁড়ায়। ড্রাইভার কন্ডাকটর হেলপার-তিনজন একে একে গুমটিঘরের দিকে এগিয়ে আসে।

কন্ডাকটরের হাতের কাগজটাতে কর্তার সময় লিখে দেয়। বিনিময়ে ছোট্ট টেবিলের ওপর টং করে সিকি অথবা আধুলি পড়ে। সুমুখ থেকে টুক করে কুর্তার পকেটে পুরে নেয় কর্তার।

গুমটিঘরের পাশে মাটিতে গর্ত খুঁড়ে পোড়া মাটির পেল্লায় জালা পুঁতেছে ভরত। হৃদয়পুরের বুড়ো সুধন্য মন্ডলের বেওয়া মেয়ে পিনি রোজ সকালে কলসি কাঁখে এসে জালা ভরে জল দিয়ে যায়। প্লাস্টিকের জগ থেকে কাঁচের গেলাসে ঢেলে জনে জনে জল খাওয়ায় ভরত। ড্রাইভার কন্ডাকটর হেলপাররা সকলেই ওকে ভালবাসে। কেউ কুশল জানতে চায়। কাঁধে হাত রেখে এক আধটু হালকা রসিকতার কথা বলে অনেকে। অনেকেই আবার আদর করে মাথার চুল নেড়ে দেয়। কোনও কোনও কন্ডাকটর জল খেয়ে পাঁচ দশ পয়সাও গুঁজে দেয় হাতে।

চন্দনেশ্বরের শিবু গুঁই ছিল আদতে চাষী। চাষবাসের কাজ ছেড়ে জুটমিলে ঢুকেছিল। বুকে দোষ ধরা পড়ায় ছাঁটাই হয়ে যায়। রোগটা গোপন থাকেনি। জেনেশুনে জনমজুরের কাজ দিতে চায় না কেউ। এদিকে বউটারও বারোরকম ব্যামো। ঘরে এক গণ্ডা ছেলেপিলে। অভাবের তাড়নায় বসত ভিটেটুকু ছাড়া বাকি জমি বন্ধক পড়ে গেছে।

তো সেই শিবুকে দেখা গেল, অশোক গাছের গুঁড়ির কাছে কোথা থেকে রোজ একখানা দু'খানা করে ইট জমিয়ে রাখছে।

কিছুদিন পর জমানো ইট পেতে তাতে গোবর কাদা লেপে শিবু একটা চাতাল গড়ে ফেলল।

তারপর একদিন চারদিকে চারটে বাঁশের ডগা পুঁতে দিল। রঙচটা ময়লা পলিথিন-চাদর টানালো। কেরোসিন কাঠের ফল-বাক্সের ওপর পান বিড়ি সিগারেট আর রকমারি পান-মশলার ডিবা সাজিয়ে নিয়ে বিক্রিবাট্টা শুরু করে দিল।

কর্তার ছিল বারো-নেশুড়ে। খৈনির খোঁজ নিয়ে পেল না। ব্যস, পরদিন থেকেই চুন খৈনি রাখল শিবু। এভাবেই কেউ পানবাহার চাইল তো পানবাহার, হনুমান জর্দা চাইল তো তাই এসে গেল। দিনকে দিন আইটেম বেড়ে যেতেই লাগল।

একা নিঃসঙ্গ লাগলেই বিড়ি ধরিয়ে ধোঁয়া ওড়াত কর্তার। ঝিমুনি এলে একটু চা খাওয়ার ইচ্ছে করত। বাস ভিড়িয়ে রেখে জিরোতে আসা ড্রাইভার কন্ডাকটর হেলপাররাও একটুকু চায়ের জন্য উশখুশাত। বাস থেকে হাত পা খেলাতে নামা যাত্রীদেরও চায়ের নেশা চাগাড় দিয়ে উঠত।

হেতালখালির ক্ষুদিরাম সাঁপুই ছিল ভাল অবস্থাপন্ন চাষী। কপালে বউ টিকত না। পয়লা বউ মরেছিল তিন বছরের মাথায়। একটাই ছেলে রেখে গিয়েছিল। নাম,

বলরাম। দ্বিতীয় পক্ষ বেঁচেছিল পাক্কা পনেরো বছর। ওরই মধ্যে ন'টা বাচ্চা দিয়েছিল সেই বউ। ফের একটা বউ এনেছিল ক্ষুদি। বলাইয়ের বয়স তখন সতেরো।

ক্ষুদির তৃতীয় পক্ষের কচি বউটা ছিল দারুণ দেমাকি। ভয়ানক খাণ্ডারও। প্রথম থেকেই ক্ষুদির সঙ্গে তেমন বনিবনা ছিল না। পাঁচ বছরে একটাও বিয়োন দিল না। সেই বউটা অবশ্য মরল না। জুতা কারখানার মদন অধিকারির সঙ্গে কাঞ্চনগাঁয়ে পালিয়ে গেল।

বউ পালালেও ক্ষুদি নেতিয়ে পড়েনি। মন মেজাজও খারাপ হয়নি। তাই বলে ফের ন্যাড়া মাথায় বেলতলায়ও গেল না। বাঁধা বউ রাখার চেয়ে চরেবড়ে খাওয়াই পছন্দ করেছিল।

বারোমুখো হয়ে বেশ ভালই ছিল ক্ষুদি। কিন্তু মরণকালের আগে হঠাৎ একদিন তৃতীয়পক্ষ ফিরে এল। শেষ সময় কালে সেবাযত্ন পেয়ে গলে গেল ক্ষুদি। বিষয় আশয় লেখালেখি করে দেবে বলে মনস্থ করেছে এমন সময় দ্বিতীয় পক্ষের বাপের বাড়ির লোকজন এসে হাজির। গেঁড়ে বসে কিছুতেই ভাগ্নে ভাগ্নিদের ছেড়ে গেল না। তাই নিয়ে তৃতীয়পক্ষের লোকজনের সঙ্গে অনেক কাজিয়া বিবাদ। সমস্যার জট খোলার আগেই ক্ষুদি গত হল।

সেই থেকে একা-অন্নে ছিল বলাই। সময়টা খারাপ যাচ্ছিল। দু'মুঠো জুটিয়ে নেয়ার মতো রোজকারের একটা কিছু উপায় হাতড়াচ্ছিল।

জনসন মোড়ে যে চায়ের চাহিদা আছে তা পাঁচ-গাঁয়ে চাউড় হওয়ার আগে টের পেয়েছিল বলাই। তাতেই মগজ খুলে গেল।

জনসন মোড়ের বাস স্টপে খাস জমির ওপর ছেঁড়া চট ত্রিপল পলিথিনের ঝুপড়ি ঘর তুলল বলাই। ভাল দিন দেখে চায়ের দোকান খুলে বসল।

এখন রোজ অন্ধকার ভোরে বলাইয়ের চায়ের দোকানের ঝাঁপ খুলে যায়। উনানে আঁচ ওঠে। এনামেলের ডেকচিতে চায়ের জল ফোটে। ডেকচির ওপরে তোবড়ানো সসপেনে দুধ গরম হয়।

ফার্স্ট বাস ধরে কর্তার আসে। সঙ্গে শাকরেদ ভরত। বলাইয়ের দোকানের সামনে বাঁশ-বাখারির বেঞ্চিতে বসে কর্তার। ভরত এগিয়ে গিয়ে বলাইয়ের দিকে সাহায্যের হাত বাড়ায়। টিনের ডিবা থেকে চা-চিনি নিয়ে চা বানায়। পয়লা খদ্দের দু'জনের হাতে চায়ের গেলাস দু'টো এগিয়ে দেয়। সুমুখে বয়ামে রাখা খাস্তা নেড়ো নোনতা বিস্কুট আর বনরুটি থেকে যে যার পছন্দমতো তুলে নেয়। চায়ের তৃতীয় গেলাসটা নেয় বলাই। টুকটাক গল্পচ্ছলে তিনজনে চা খায়।

শিবু আসত বেলা বাড়লে। বিক্রিবাট্টা শুরু করার আগে বলাইয়ের দোকানে

এসে বসত। চা খেত না। গেলাসের কিছুটা দুধে গরম জল ঢেলে বলাই এক গেলাস করত। চিনি মিশিয়ে নাড়ত। একখানা বনরুটি ছিঁড়েছিঁড়ে ভিজিয়ে খেত শিবু। তারপর ভরপেট জল খেয়ে কর্তারের গুমটিঘর থেকে কাঠের বাক্সটা মাথায় তুলে নিত। চাতালে গিয়ে ঝাঁপ খুলে বসত।

শিবু বাঁচল না বেশিদিন। একদিন রাত্রে কাশতে কাশতে অনেক রক্ত ঝরিয়ে দম বন্ধ হয়ে মরল। ভরত ওর ভিটেয় গিয়ে কাঠের বাক্সটা দিয়ে এল।

শিবুর চাতালটা একদিন দখল হয়ে গেল।

সানিপাড়ার পবন সানি চাকরি করত বার্মা সেলের তেলের ডিপোয়। মাস গেলে ভাল তলব। চাষবাসও ছিল মোটামুটি। তবু টাকার খাই ছিল বড্ড বেশি। পবনই শিবুর চাতাল দখল করে নিল। চাতাল উড়িয়ে চারপাইঅলা টিনের গুমটি-দোকান বসাল। পান বিড়ি সিগারেট তো রইলই, লজেন্স বিস্কুট চানাচুর সাবান তেল ব্লেড গুঁড়ো দুধ চা জাতীয় টুকিটাকি হরেক জিনিসও রাখতে শুরু করল।

খাদু নামে ভরত-বয়সী এক ভাগ্নেকে দোকানদারিতে বসিয়েছিল পবন। ছুটির পরে সন্ধ্যের দিকে নিজে আসত।

বেলা বাড়ার সঙ্গে বলাইয়ের চায়ে দোকানে ভিড় বাড়ত। জুটমিলের শ্রমিকরা অনেকেই বাঁধা খদ্দের হয়ে গিয়েছিল।

সকাল সময়টাতে ভরতের তেমন জল খাওয়ানোর কাজ থাকত না। টুকরো কাপড়ের ছাঁকনিতে ছেঁকে সারি সারি কাঁচের গেলাসে চা করত। আর সেই চায়ের গেলাস জনে জনের হাতে তুলে দিত ভরত। চাহিদা অনুযায়ী বয়াম থেকে বলাই বিস্কুট রুটি এগিয়ে দিত। খদ্দের আর বলাইয়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে টাকা পয়সা চালাচালি করত। বেশি ভিড়ের সময় চায়ের গেলাস পর্যন্ত ধুয়ে দিত।

ভরতকে প্রশ্রয় দিত কর্তার।

বলাইয়ের ব্যবসাটা ক্রমশই বেশ জাঁকিয়ে বসল। খদ্দেররা চাইছিল বলেই লাড্ডু কচুরি নিমকি ঘুগনি মুড়ি রাখার ব্যবস্থা হল। দুপুরে পেঁয়াজ লংকা রুটি তড়কার খদ্দেরও জুটে গেল ক'জন।

কিন্তু এতসব কাজ কি আর একা হাতে হয়? রোদ্দুরের তাপ বাড়লে ভরত এদিকে তাকাতে ফুরসত পেত না। জল জগ গেলাস হাতে প্রতিটি বাসের জন্য তৈরি থাকতে হতো।

অনেক ভেবেচিন্তে তক্কে তক্কে রইল বলাই। সুযোগটা এসেও গেল একদিন।

গুমটিঘর আর দোকানের জালায় জল ভরে হাঁপিয়ে পড়েছিল পিনি। কলসিটা উপুড় করে টুল বানিয়ে তাতে জিরোতে বসল। আঁচলে হাত গলা মুখের ঘাম মুছে

বলল, এখন তো আর খদ্দের নাই। ভাল করে চা বান্যে খাওয়াও দিকিন এক
বলল, এখন তো আর খদ্দের নাই। ভাল করে চা বান্যে খাওয়াও দিকিন এক গেলাস। তোমার ওই বারোজনের জন্যি তড়বড়া চা ঠোঁটে ঠেকানো যায় না।

বলাই খুশি হল। একা পিনির জন্য যত্ন করে চা করল। চামচে কেটে একটুকু রঙ ধরা দুধের সর মিশিয়ে দিল তাতে। তারপর হাতের তেলোয় গেলাসের তলা মুছে এগিয়ে দিয়ে বলল, দেখ দেখি কেমন হল?

বিস্কুট দিলা না! বলাইকে চুপচাপ ড্যাবড্যাব তাকিয়ে থাকতে দেখে অবাক হল পিনি।

ঝাঃ, ভুল হয়েছে। শরম সংকোচে পড়ল বলাই। রোজকার বরাদ্দ বিস্কুট দু'খানা হাত বাড়িয়ে দিয়ে ফের জিগ্যেস করল, কেমন হয়েছে চা?

রোজগার মতোন বিচ্ছিরি না। ফিচেল হাসি ছড়াল পিনি। সোজাসুজি ভাল বলল না। গেলাসের চায়ে বিস্কুট ভিজিয়ে খেতে খেতে বলল, চা করা কি আর পুরুষমানুষের কাম? এর চাইতি আর কত স্বাদের করবা।

ঠিক বলেছিস। মুষড়ে পরা বলাই ফের চাঙা হয়ে বলল, শুধু কী পুরুষমানুষ বলে? একা হাতে এতসব কাজ করা কি চাট্টিখানি কথা?

একা হাতে কুলুতি পার নাতো জুগানদার রাখলেই তো পার। পিনি যেন বলাইয়ের আপনজন হয়ে উঠল, ভরতের মুখ থিকিন তোমার সব কথাই তো শুন্যেছি। পেট তো মাত্তর একটা। ইখানে বিক্কির তো মন্দ হতি দেখি না। তাহলি কীসের জন্যি অ্যাত কিপন্‌পনা?

বলাই দেখল, ধারে কাছে কেউ নেই তো এই সুযোগ। গোপনে ধরে রাখা ইচ্ছেটা ঝটপট ফাঁস করে ফেলল, তুই করবি জোগানে কাজ?

কেন করবুনি? এককথায় রাজি হলেও পিনিকে বেশ বিমর্ষ গম্ভীর লাগল। আধ বোজা চোখ করে বলল, গতর খাইট্যে বাঁচন ছাড়া বেওয়ার আর গতি কী?

তা কত নিবি? মাস মাইনের কথা পাড়ল বলাই।

এই তো কারবার তোমার। বেশি কী আর দিতি পারবা যে বড় মুখ করি জানতি চাইছো?

বলাই কোনও উত্তর খুঁজে পেল না।

পিনি নিজে থেকেই পাকা কথা দিয়ে গেল, কাল থিকিন হাত লাগাব। বেচাকেনার গতিক বুঝ্যে বিচের করি কমবেশি দিবা।

দেড় বছরের মাথায় বলাইয়ের চায়ের দোকানের ছেঁড়া পলিথিন চট ত্রিপলের ছাউনি বিদেয় হয়ে গেল। বাঁশ খুঁটিতে খড়ের চালাঘর উঠল। দর্মার বেড়া ঘেরা দোকানঘরটা বেশ পাকাপোক্ত হল। এক কোণে ইটমাটির পেল্লায় কয়লা-উনান

বসল। রান্নাবান্নার আধারপত্তর এল। ছাড়ানো তেলের টিনে আলকাতরা মাখিয়ে তাতে সাদা রঙ দিয়ে কাঁচা হাতে সাইনবোর্ড লেখা হল।

বলাইয়ের অস্থায়ী চায়ের দোকানটা হয়ে গেল 'তৃপ্তি হোটেল'।

হোটেলের সামনে বাঁশের খুঁটিতে ঝোলানো খাদ্য তালিকায় লেখা, ভাত ডাল মাছ তরকারি চিকিন মটন। পাশে খড়িমাটিতে দাম লেখা। তালিকার নিচে বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ পিঁয়াজ ছাতু লংকার ব্যবস্থাও আছে।

লেখা না-থাকলেও সবার জানা হয়ে গেল যে, খেতে হবে মেঝেয় পাতা তালপাতার চাটাইয়ের ওপর বসে। থালার পরিবর্তে কলাপাতা। আর মাটির খুরি।

আগে খুব সকালে বাস গুমটির জালায় জল ভরতে আসত পিনি। তারপর অনেক বেলা অবধি বলাইয়ের চায়ের দোকানের কাজে হাত লাগাত। খদ্দেরের ভিড় পাতলা হয়ে এলে একবারটি নিজের ভিটেয় যেত। চটজলদি চান খাওয়া সেরে গনগনে রোদ মাথায় নিয়ে ফের ফিরে আসত। সেসময় খদ্দের থাকতই না বলা যায়। পিনির জিম্মায় দোকান রেখে মাথার তেলোয় এক খাবলা তেল ফেলত বলাই। কাঁধে গামছা ফেলে জনসন ব্রিজের ধারে ঝিলের জলে চান করতে যেত। বলাইয়ের জন্য দুপুরে দু'মুঠো ভাত ফুটিয়ে দিত পিনি। সঙ্গে ডাল আলুসেদ্ধ তরকারি চুনো মাছের ঝালচচ্চড়ি কিছু একটা রাঁধত।

এখন বলাইয়ের হোটেলটাই যেন পিনির ঘরসংসার। নাড়ির সম্পর্কের মতো গভীর ভালবাসায় জড়ানো।

উদয়াস্ত ভূতগত খাটুনি খাটে পিনি। বাসনকোসন মাজে। ঝাটপুছ করে। কুটনো কোটে। হেঁশেল সামলায়। দুপুরে বাড়ি যায় না। রাতের খাবার খেয়ে বলাইয়ের আগেই নিজের ভিটেয় ফিরে যায়।

এখন আর কারও ঘাড়ে বসে পরগাছার মতো অন্ন ধ্বংস করছে মনে হয় না পিনির। খাওয়া পরার সব কিছু খরচ এখন বলাইয়ের। রাতে ঘরে ফেরার সময় হররোজ কিছু হাতখরচও দেয় বলাই।

পিনির ওই হাত খরচের টাকাটা নিয়ে বাপ সুধন্য মন্ডলের সঙ্গে গোলমাল অশান্তির একশেষ। সুধন্য বুড়োর পাথুরে বিশাল শরীর। মোটা গোঁফের আড়ালে পুরু ঠোঁট। গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। কাঁচা পাকা ভুরু। মাথায় শনের মতো এক ঝাঁক পাকা চুল।

গতর অটুট থাকলে কী হবে, সুধন্য বুড়ো ছিল আলসের ডিম। ছেলেরা সেয়ানা হওয়ার পর থেকেই সংসারের খরচাপাতি সম্পর্কে উদাসীন। বয়সকালে তো বটেই বুড়ো বয়সেও পুরাদস্তুর পেটুক। ধেনো তাড়ি গেলা তো আছেই, দিনে এক বাণ্ডিল

বিড়ি চাইই চাই। গতর ঠিক রাখার জন্য রোজ সকালে মুগুর ভাজে। বাছুরের মতো গরুর বাটে মুখ দিয়ে দুধ চুষে খাওয়া অভ্যেস। এক গণ্ডা ডিম গোবরের মোড়কে ভরে উনানের আঁচে ফেলত। সেই সিদ্ধ ডিম খেত। বিকেলে মোষের পিঠে চড়ে ছেলেদের চাষবাস দেখতে ক্ষেতে যেত। জমির এটা সেটা ফসল সট্‌কাত।

ছেলেরা মনে করত, বাপ নয় তো যেন বেকার হাতি। গতর গোটান মানুষটাকে ছেলেরা পাত্তা দিত না। নেশার রেস্তর টান পড়লেই সুধন্য বুড়ো মুখ ছোটাত। বউ ছেলে, ছেলেবউ, নাতি নাতনিরা কেউ সুধন্য বুড়োর আক্রমণ থেকে বাদ পড়ত না। সেজন্য খিটখিটে বুড়োকে সকলেই কুনজরে দেখত। তাই নিয়ে হামেশা ঝামেলা ঝগড়া ঝঞ্ঝাট লেগেই থাকত।

একঘরে সুধন্য বুড়োর একমাত্র ভরসা ছিল পিনি। পিনি মাঝেমধ্যে মুঠো খুললেও খুবই হিসেবী ছিল। তাতেই সুধন্য বুড়োর যত রাগ অসন্তুষ্টি। একদিন নেশার টাকা চেয়ে পেল না তো শুরু করল খেউড় খিস্তি। টাকা পাওয়ার হকদারের কারণ ব্যাখ্যা করল, মুই কি অন্যায্য ট্যাকা চাইছি নাকি? ব্যে দিতেতো কমতি কিছু খরচাপাতি হয়নি। বছর না ঘুরতি পোড়াকপালী তুই সব্বোস্য খুইয়ে ভাতারের ভিটে থিকিনি তাড়া খেয়ে এলি। মুই মাথা গোঁজার ঠাঁই দিনুন তাই না হালে পানি পেয়েছিস। ধুমসি মেয়ে আজ না হয় দু'টো পয়সার মুখ দেখেছিস? তাই বলে দেমাক দেখায়ে বাপকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য! হারামজাদা ওই বলাই তোর বোঝা নেবে ভেবেছিস?

সুধন্য বুড়ো ক্ষেপলে বলাইয়ের নাম ধরে টানবেই। তখনি ভয় পেয়ে চুপসে যায় পিনি। বুড়ো বাপের মুখে তো কোনও রশি ধরা নেই। কি বলতে কি বলে ফেলবে।

নেশার টাকা ছুঁড়ে দিলে তখনকার মতো মুখ বন্ধ হয় বটে, সুধন্য বুড়োর লালস কমে না। কিন্তু কতটুকু আর ক্ষমতা ধরে পিনি? সব সময় চাহিদা মেটাতে পারে না। না পারলেই সুধন্য বুড়ো মেয়ের সঙ্গে বলাইয়ের ফস্টিনস্টি দেখতে পায়। পাঁচকানে তাদের দু'জনের নাম ধরে নানা আকথা কুকথা রটিয়ে বেড়ায়। যা ঘটনা তার চেয়েও বেশি রটনা। তা সে শহর গাঁ সর্বত্র মানুষের একই চরিত্র। অসহায় যুবতী বেওয়ার ওপর কোথায় না লোভ লালস থাকে?

পিনির বেশ আঁটোসাঁটো সুঠাম দেহ। শরীর এখনও রসেবশে। টানা টানা চোখ। উড়ুউড়ু কুচকুচে কালো চুল। রঙটাই যা চাপা। বগলের তলা ঘুরিয়ে কাঁধে আঁচল ফেললে দেখতে দারুণ লাগে।

ধরতে চেষ্টা করেছিল অনেকেই। পাঁকাল মাছের মতো পিছলে গেছে পিনি।

ডাকাবুকো দু'একজন বুকের পাটা দেখাতে গিয়েছিল। নাগিনীর মতো পিনির ফোঁস দেখে ফের ধারে কাছে আসেনি। পিনির কাছে এইসব হারুরা সকলেই বলাইয়ের শত্রু। হিংসায় জ্বলছিল। বলাইয়ের হোটেল ব্যবসার রমরমা দেখে চোখ টাটানোদের সংখ্যাও নিতান্ত কম না। দশ গাঁয়ের কয়েক গণ্ডা মেয়ের বাপেরা বলাইকে জামাই করতে চেয়েছিল। বলাই আমল দেয়নি। সেইসব হতাশদের বলাইয়ের ওপর রাগ ক্ষোভ ঝাল তো ছিলই।

বলাইয়ের বিরুদ্ধদের সংখ্যা বেড়েই চলছিল। ওরা সকলে জোট বেঁধে ঘোট পাকাবার মতলবে ওঁৎ পেতে ছিল।

দিন মাস বছর পার হয়ে গেল। ইতিমধ্যে সদর শহরে ঠাঁই না-পাওয়া ব্যবসায়ীরা বড় সড়কের দু'ধারে মজা ধানজমিতে হাত বাড়িয়েছে। ইতস্তত ছোটবড় কলকারখানা হয়েছে কয়েকটা। নতুন নতুন জনবসতি গড়ে উঠছিল।

সদর থেকে বাড়ানো হাতটা ক্রমশই জনসন মোড়ের দিকে এগিয়ে আসছিল। সড়কধারের জমির দর লাফিয়ে আকাশমুখি হতে জমি বিক্রির হিড়িক লেগে গেল। কলকারখানার পত্তনে শহুরে সভ্যতা এগিয়ে আসছে দেখে গাঁয়ের অভাবী লোকেরা নানা স্বপ্ন দেখতে লাগল।

পর পর তিনবার বিজয়ী স্থানীয় হোমিও ডাক্তার নগেন সাধুখাঁ ভোটে প্রার্থী হওয়ার সুযোগ পেলেন না সেবার। ওর বদলে সদর থেকে এসে দাঁড়ালেন মন্ত্রী কানাইলাল মুখার্জি। আগের বারের ভোটে সদর থেকে হারতে বসেও কোনওরকমে কৌশলে জিতেছেন তিনি। এবার তাই কোনও ঝুঁকি নিতে চায়নি পার্টি।

প্রার্থী যখন মন্ত্রী, জেতালে নিশ্চিত এতদিন পিছিয়ে থাকা অঞ্চলের অনেক উন্নয়ন হবে। কি কি হতে পারে তাই নিয়ে দশ গাঁয়ের মানুষ মশগুল। আনন্দ আর ধরে না। ডাণ্ডা ঝাণ্ডার মিটিং মিছিল চলছিল লাগাতার।

ভাগ্নের বদলে পবন সানি নিজেই একদিন সকালে দোকান খুলতে এল। বলাইয়ের দোকানে এসে চা চাইল। খাদুর কি তাহলে অসুখবিসুখ হল? চায়ের গেলাস এগিয়ে দিয়ে বলাই শুধলো, বেটাইমে তুমি?

দোকান খুলতে এলাম।

ভাগ্নের কি হল?

ভোটের কাজে গেছে। ও বেলায় নয়নতারার মাঠে আজ বড় মিটিন। মন্তিরি এসবেন। যাব বলে ছুটি নিয়েচি। যাবা না তুমি?

মরবার ফুসরত নেই তো মিটিন। চায়ের গেলাসে জল ঢেলে রগড়াতে রগড়াতে বলাই গজরালো, আপনা হাত জগন্নাথ। ভোট নিয়ে মেতে থাকলে তো পেটে ভাত

জুটবে না।

আমারও একমত। চায়ের গেলাস রেখে সিগারেট ধরালো পবন। সুখটান দিয়ে ধোঁয়া উড়িয়ে বলল, সানিপাড়ার পঞ্চু পাত্রকে তো জান। পার্টির মাতব্বর। মিটিনে যেতে বল্লো।

মাতব্বররা তো বলবেই। হক কথার মানুষ বলাই সাফ শোনাল, দশ গাঁ ঝেঁটিয়ে মাঠ ভরাতে পারলেই উনাদের মুনাফা। হোক না কেন দিনরুজিদের লোকসান। গরিবদের কাঁধে ভর করে যত্তসব ধান্দা ফিকির।

পবন সানি আর কোনও কথা জুড়ল না। ক'জন অচেনা যণ্ডামার্কা ছেলেকে বাঁশের বেঞ্চিতে বসে চা খেতে দেখে মনে মনে ভয় পেল। শোনা কথা, সদর থেকে ভোটে-জেতানো অনেক পাকা লোক আমদানি করেছেন কানাই মুখার্জি। ওই ছেলেগুলি যে সেই আমদানি দলের না তা কে বলতে পারে। চায়ের দাম চুকিয়ে পবন সানি সরে পড়ল।

পবন সানির সন্দেহটা ভুল ছিল না। বলাইয়ের বেফাঁস গা জ্বালানো কথা পঞ্চু পাত্রর কানে গেল। মনে মনে গজরালো পঞ্চু। বেয়াড়া বলাইয়ের বাড়বাড়ানির একটা বিহিত করা দরকার মনে করল। এবং সেটা যে করতে হবে পাকা মাথায় ফন্দি এঁটে, তাও বুঝল।

ভোটের তখন দিন সাতেক বাকি। নিঃশব্দ রাতের ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। বলাইয়ের জ্বর হয়েছিল। বাইরে ঝিরঝিরে বৃষ্টি হচ্ছিল বলে রাতে বাড়ি ফিরতে দেয়নি পিনি। নিজে ভিজে দুধ বার্লিই খাইয়েছে। যন্ত্রণায় বলাইয়ের কপাল ফেটে যাচ্ছিল বলে শিয়রের কাছে বসে রগ টিপছিল। বাতাসে চাঁপা ফুলের গন্ধ ভেসে আসছিল। বলাইয়ের ছটফটানি দেখে একা ফেলে যেতে মন সরল না পিনির।

মাঝরাতে খটাখট খুঁটি পোঁতার শব্দ শুনে পিনি বলাইয়ের ঘুম ভেঙে গেল। ঘরে না-ফেরার ভয়ের শিরশিরানি পিনিকে গ্রাস করল। আতঙ্কে সেঁধিয়ে রইল বলাই। জ্বর-যন্ত্রণা যেন উবে গেল।

ধুপপুক বুকে দরমা বেড়ার ফোঁকর দিয়ে রাতের নৈঃশব্দ্য চূর্ণকারী শব্দের উৎসের দিকে নজর ছোটাল পিনি। রাতের পাতলা আলোয় অনেকগুলি টিমটিমে লম্ফ দেখতে পেল। একটা ভারী ট্রাক আসা যাওয়ার সময়কার উজ্জ্বল আলোতে কোদাল কুড়ুল কাটারি দড়ি হাতে অনেক লোকজন দেখতে পেল। সড়কের ধারের খাস জমি জুড়ে যে নতুন দোকান পত্তনের দখলদারী চলছে পিনি তা বুঝতে পারলেও বলাইকে কিছু বলল না।

ভোরের আলো ফুটে ওঠার আগেই দখলদারদের খটাখট শব্দ বন্ধ হতে পিনি

কিছুটা নিশ্চিন্ত হল। ভোরের প্রতীক্ষায় সময় কাটাতে বলাইয়ের শিয়রের কাছে বসল। কপালে হাত রেখে বুঝল, ঘাম ছুটিয়ে জ্বর ছাড়ছে। আঁচল দিয়ে বলাইয়ের সারা শরীরের ঘাম মুছে দিল। তারপর ফিকে আলোর ভোরে মাথায় ঘোমটা টেনে, গাঁয়ের দিকে রওনা হল।

গা গতরে ব্যথা তবু যথারীতি ঝাঁপ খুলতেই যেন সিঁদুরে মেঘ দেখল বলাই। রাতের অন্ধকারে কারা যেন সড়কের ধারের খাসজমিতে সারি দিয়ে অগুনতি দশ বিশ হাতের দোকান-সীমানা নিশানা গড়ে দিয়ে গেছে। দখল নিরাপত্তার প্রতীক পত পত রঙিন পতাকা উড়ছে অজস্র।

বলাইয়ের চোখমুখে বিষণ্ণতার ছায়া ফুটে উঠল। ক্লান্ত অবসন্ন লাগল। উনানে আগুন জ্বালল না। হাঁটুর ভাঁজে থুতনি ডুবিয়ে দূরের পতাকাগুলির দিকে উদাস তাকিয়ে রইল।

দিনের পয়লা বাস ধরে কর্তার ভরত এল। উনান সাজিয়ে রেখে গেছে পিনি। সাজানো উনান অথচ আগুন জ্বালেনি বলাই! বলাইকে চুপচাপ বসে থাকতে দেখে অবাক হলেও কারণটা কর্তারের মালুম হল।

বলাইয়ের কাঁধে কর্তার হাত রাখল। অল্প চাপ দিয়ে ভরসার ভাষণ শোনাল, হিম্মত রাখো ঘবড়াও মত। লেকিন মৎ বোল, লোড়াই কোরে বাঁচতে হোবে। ইয়াদ রাখো, মেহনত কোরে জিন্দেগী গুজারতেওয়ালে আদমিই মরদ পালোয়ান। কাম বোনধ্ কোরলে চোলবে না। চালু রাখতে হোবে। কামকে ওয়াস্তে পাগলা ভী হোতে হোবে।

কর্তারের ভাষণে কাজ হল। ম্লান বিমর্ষ বলাই গা ঝাড়া দিয়ে চনমন টগবগিয়ে উঠল। কে বলবে কাল রাতে জ্বর হয়েছিল।

ভরত যেন পূতাগ্নি হাতে তৈরি হয়েই ছিল। কর্তারের ইশারায় উনানে সেই পূতাগ্নি ছুঁইয়ে দিল।

আঁচ উঠে জল ফুটছিল, এবার চা তৈরি হবে। এমন সময় একটা রিক্শা ভ্যান এসে দাঁড়াল। ভ্যানের ওপর কাপড়ের পুঁটুলি ছেঁড়া কাঁথা মাদুর হাড়ি-কড়া কলসি। তোবড়ানো টিনের স্যুটকেসও একটা। পা ঝুলিয়ে বসে আছে পিনি।

ভ্যান থেকে নেমে পিনি এগিয়ে এল। চোখ মুখ ফোলা ফোলা। উত্তেজনায় শরীর হাত পা কাঁপছিল। ভরতকে লটবহরগুলি নামিয়ে এনে ভেতরে রাখতে বলল পিনি। বলাইকে কোনও কথা বলল না। সোজা ভেতরে আড়ালে গা ঢাকা দিল।

পিনির এই ভিটে ছেড়ে আসা যে কাল বাইরে রাত কাটানোর শাস্তি বলাই তা বুঝতে পারল। এক ঝাঁক মশা মাছির মতো নানান ভয় ভাবনা ছেঁকে ধরতে

চাইলেও বলাই দমল না। সেগুলিকে তাড়িয়ে রোজকার মতো কাজে মন বসাতে উদ্‌যোগী হল। পিনিও কলসি কাঁখে জল আনতে বেরিয়ে পড়ল।

পিনিকে নিয়ে বলাইয়ের বাড়াবাড়ি ব্যাপারটা সবারই নজর কাড়ল। তাতে বলাইয়ের শত্রু আরও বাড়ল। এমনিতেই হেতালখালি আর হৃদয়পুর গাঁয়ের ওপর পঞ্চু পাত্রর বিষদৃষ্টি ছিল। ওই দু'গাঁ থেকে বরাবরই পঞ্চুর পার্টির বিরুদ্ধে বেশি ভোট পড়ে। তার ওপর আবার এই কেচ্ছা!

ভোটের দু'দিন আগে 'তৃপ্তি হোটেলে'র সামনে দলবল নিয়ে পঞ্চু পাত্র হাজির। মাথা গরম করল না পঞ্চু। চাল চেলে বলাই পিনিকে বোঝাল, তোমাদের দু'জনকে নিয়ে দশজনে দশরকম মন্দ কথা বললেও আমি আমল দিচ্ছি না। বরং তোমরা সুখে থাক তাই চাই। তোমাদের ফুল প্রোটেকশন দেব। কিন্তু শর্ত আছে।

পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করে বলাই বলল, শর্তটা কী?

যে যার গাঁয়ে গিয়ে লোকজনকে বোঝাও, এবারও বিপক্ষে ভোট দিলে ফল ভাল হবে না। কানাই মুখুজ্যি হেঁদিপেঁচি লোক না। মন্ত্রীর বিরুদ্ধে ভোট দেয়া মানেই গাঁয়ের সব্বোনাশ ডেকে আনা।

পঞ্চু পাত্রর দেয়া শর্ত বলাইয়ের ভাল ঠেকল না। পঞ্চুর এত ভালমানুষি ঠাণ্ডা মেজাজের ব্যবহার দেখে পিনিরও ধন্দ লাগল। তবু দু'জনেই বলল, চেষ্টা করে দেখব।

চেষ্টা করবে কি? গাঁয়ের লোক ওদের দু'জনের ওপর্ যে দারুণ ক্ষেপে আছে তা জানে বলেই কেউ গাঁ মুখি হল না। ভোট পর্যন্ত দিতে গেল না।

কানাইলাল রেকর্ড ভোটে জিতলেন বটে কিন্তু হেতালখালি আর হৃদয়পুর থেকে সেবারও বিপক্ষে ভোট পড়েছিল বেশি। আর যায় কোথায়? ভোটের ফল বের হওয়ার পরেই দলবল নিয়ে বোমা ফাটিয়ে হেতালখালি গাঁয়ে ঢুকল পঞ্চু। ঘরের পর ঘর পুড়িয়ে দিল। তারপর গেল হৃদয়পুর গাঁয়ে। সেখানে ঘর পোড়ালো না। গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য ভূপেন ঘড়ুইয়ের খড়ের গাদায় আগুন ধরিয়ে দিল। খিড়কি পথে পুকুর পাড় ধরে ভূপেন ছুটে পালাতে গেলেন। বোমার ঘায়ে হাঁটুর কাছ থেকে পা উড়ে গেল একটা। ভূপেন লুটিয়ে পড়লেন। কুড়ুলের কোপে মাথা দু'ভাগ হয়ে গেল। ক্ষতবিক্ষত দেহটাকে পুকুরে গড়িয়ে ফেলা হল।

ভূপেনের বড় ছেলে ষষ্ঠী পালিয়ে গিয়ে সুধন্য বুড়োর খাটের তলায় লুকিয়েছিল। সেখানেও সশস্ত্র আক্রমণ হল। বাধা দিতে গিয়ে গলায় কোপ নিয়ে মরল সুধন্য বুড়ো। খাটের তলা থেকে বল্লমের খোঁচায় ষষ্ঠীকে বের করে আনা হল। তারপর ডান বাম দু'হাতই কেটে নেয়া হল।

সবশেষে জনসন মোড়ের 'তৃপ্তি হোটেল' ভেঙে তছনছ করা হলেও, বলাই পিনিকে প্রাণে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছিল।

পরে সেই একই ইতিহাস। খবরের কাগজে খবর। পুলিশের ব্যস্ততা। ধরপাকড় ছাড়ন। দুই পার্টির বিবৃতির লড়াই সমবেদনা। ক্ষতিগ্রস্তদের সরকারি সাহায্য ক্ষতিপূরণ দান। কিছুদিন ভয় উত্তেজনা রাগ ক্ষোভ ঘৃণা। তারপর সব স্বাভাবিক। বছর পার হল। তারপর আরও একটি বছর কেটে গেল।

জনসন মোড়ে এখন আর একা বলাইয়ের হোটেলটাই একমাত্র ভরসা না। সাকুল্যে পাঁচটা হোটেল হয়েছে। তার একটির মালিক পঞ্চু পাত্র। একটি পবন সানির। পবন সানি 'জনসন মোড় ব্যবসায়ী সমিতি'র সম্পাদক। পঞ্চু পাত্র সভাপতি।

সাতটা চায়ের দোকান এখন। স্টেশনারী দোকান দু'টি। একটি করে টেলারিং মনোহারী দোকান। সেলুনও হয়েছে একটি। এমপ্লিফায়ার ভাড়া পাওয়া যায়। বাসন কোসন কাপড় চোপড়—কীসের না পশরা এখন! হোমিও ডাক্তার নগেন সাধুখাঁ দু'বেলা আসেন। বাসন দোকানের এক কোণে পাতা টেবিল চেয়ারে কিছু সময় রোগী দেখেন। এক বছর আগেও সব দোকানেই কেরোসিন-বাতি জ্বলত। মাঝে কিছুদিন সমবায় ভিত্তিতে পেট্রোল জেনারেটর থেকে দোকানে দোকানে বিজলি সাপ্লাই হত। আর এখন সড়কের ধারের ওভার হেড থেকে অ্যাঙ্কার করে ঢালাও আলোর ব্যবস্থা। পঞ্চু আর পবনের হোটেলে ফ্যান ফ্রিজ পর্যন্ত চলে।

সব কিছু মিলে এককালের শুনশান জায়গাটা বেশ জমজমাট।

একা বলাইয়ের হোটেলেই কেরোসিন-বাতি। ব্যবসায়ী সমিতির সদস্য ছিল না বলাই। সভাপতি পঞ্চু দলবাজি করে হতে দেয়নি। খাস জমির ওপরকার একমাত্র 'তৃপ্তি হোটেল'টাই পঞ্চায়েত বিডিও-র বিলি করা সরকারি নম্বর পায়নি।

একঘরে হয়েও বলাইয়ের মনে কোনও দুঃখ ছিল না। কোলে এক বছরের ছেলে নিয়ে সুখেই ছিল পিনি। বলাইও পিনিকে নিয়ে ব্যবসা ঘরসংসার ভালই করছিল। হঠাৎই একদিন পিনি বেপাত্তা হয়ে গেল। জনসন ব্রিজের ধারে ঝিলে চান করতে গিয়ে আর ফিরল না। আত্মঘাতিনী হলে তো লাশ পাওয়া যেত। তাহলে?

পবন সানির হোটেলের পেছন-খুপরিতে চোলাই মদ ড্রাগ বিক্রি হত। পঞ্চুর হোটেল হয়ে দাঁড়িয়েছিল সাট্টা জুয়ার ঠেক। চোরচোট্টা ঠগ আর চোরাচালানদারদের মজলিশ বসত এই দুই হোটেলে। তাদেরই একজন হীরু ছুঁক ছুঁক করত পিনির দিকে। ঠেকের হীরুর কোনও খবর নেই দু'দিন হল। তাই বলাইয়ের সন্দেহটা গিয়ে পড়ল হীরুর ওপর।

থানায় এজাহার দিতে গেল বলাই। আগেই জানা ছিল বড়বাবু লোকটা

হাড়বজ্জাত। রাতদিন মদ গিলে বুঁদ হয়ে থাকেন। আকাম কুকামের জায়গাগুলি গন্ধ শুঁকে শুঁকে ধরে ফেললে কি হবে কারও গায়ে আঁচড় কাটেন না। মাসকাবারী রফায় এসে মধুর সম্পর্ক গড়ে ফেলেন। তখন বাঘ গরুর একঘাটে জল খাওয়া ব্যাপারস্যাপার।

তো সেই বড়বাবু এজাহার নেয়া তো দূরের কথা উল্টে বলাইকে ধমকালেন, বেচরিত্তির বেওয়ার হদিশ নেই তো নালিশ কীসের? সে তো তোমার বিয়ে করা বউ ছিল না। তালাশ নিয়ে দেখগে ফের কাকে পাকড়ে ঘর বাঁধতে ভেগেছে।

মনে মনে বড়বাবুকে গাল পেড়ে বলাইয়ের মনের ঝাল মিটল না। পঞ্চায়েত প্রধান পরিতোষ ধাড়াকে গিয়ে ধরল। তিনি আর এক কাঠি সরেস। দেশলাই কাঠি দিয়ে সুমুখের উঁচু দাঁত খোঁচাচ্ছিলেন। সেটা ফেলে আরেকটা কাঠি দিয়ে কান খোঁচাতে শুরু করলেন। আধবোজা চোখ করে বললেন, আপদ গেছে। বজ্জাত মাগীটার জন্যি গাঁয়ের মুখ পুড়ছিল। আর বলিহারী তুমি বাপু! তোমার বাপ তিন তিনটে ব্যে করেছিল। তুমি তার ব্যাটা হয়ে বাপ খেদানো বেওয়া মেয়েমানুষের জন্যি চোকের জল ঝরাচ্চো? মানইজ্জত কিচ্ছু নেই? পাইলেছে না মরেছে তা নিয়ে মাথা না-ঘাম্যে পারলে দেখেশুনে একটা ডবকা ধরে ব্যে করগে।

এতেও দমল না বলাই। বাসন দোকানে গিয়ে হোমিও ডাক্তার নগেন সাধুখাঁকে পাকড়াও করল। একাই বসেছিলেন নগেন ডাক্তার। মাছি তাড়াচ্ছিলেন। পয়লা খদ্দের ভেবে খুশি মনে রোগ জানতে চাইলেন। বলাই খোলা মনে সংক্ষেপে বেত্তান্ত শোনাল। রোগীর বদলে এ যে সমস্যা! মনক্ষুণ্ণ হলেন নগেন ডাক্তার। বলাইয়ের খেদকথা শুনে নিজের চাপা ক্ষোভ শোনাতে শুরু করলেন, আমার সময় তো এমনটি ছিল না। আর এখন খোদ মন্ত্রীর এলাকায় কি না চলছে! এ তো সবে শুরু। পুলিশ পার্টি আর সমাজবিরোধীদের গলাগলি হলে আইনশৃঙ্খলা থাকে কখনও। তাছাড়া, শহুরে সভ্যতা এসে যেভাবে শিকড় গাড়ছে তাতে মানুষ আর মানুষ থাকবে না। ইদিক সিদিক ক্ষেতজমিতে কিভাবে চোখধাঁধানো বসত বাড়ি কারখানা গুদামঘর, হচ্ছে দেখতে পাচ্ছ? দেখে নিও, সবুজ ক্ষেত জমি গাঁ—সব জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাবে।

নগেন ডাক্তার যেন আর থামতে জানেন না। বলাই ধৈর্য হারিয়ে ফেলছিল। পিনি হারানোর জ্বলাপোড়া নিয়ে নগেন ডাক্তারের ভাষণ শুনতে ভাল লাগছিল না। তাই হাই তুলে কথার মোড় ঘোরাতে চাইল, আপনি গণ্যমান্য পণ্ডিত ব্যক্তি। আপনি চুপ থাকলে তো এমনটি হবার কথাই।

চুপ না থেকে উপায় কী? নগেন ডাক্তার বেঁচে থাকার সহজ ওযুধ বাতলালেন,

বাচ্চাটাকে নিয়ে যদি সুখশান্তিতে থাকতে চাও তো তুমিও মুখে কুলুপ এঁটে ব্যবসায় মন লাগাও। পার্টিপার্টি করে কম ক্ষতি হয়নি আমার। এখন সার বুঝেছি বলেই সব কিছু ছেড়েছুঁড়ে দিয়ে ডাক্তারিতে মন বসিয়েছি।

বলাই আর কাউকে ধরাধরিতে গেল না। বুঝে গেল, ধরতেই যদি হয় তো ধরে থাকা উচিত তাঁকে, যিনি লাগাম হাতে চালক হয়ে অদৃশ্যে বসে আছেন সবার ওপরে। পিনিকে খরচার খাতায় না-ফেলে তাঁর ভরসাতেই রইল বলাই। ভাবল, তিনিই যখন দণ্ডমুণ্ডের কর্তা তো পঞ্চু পাত্রকেই বা এত ভয়ডর কীসের?

দিনকে দিন বেয়াড়া বিদ্রোহী হয়ে উঠল বলাই। পার্টির মিটিং মিছিলে কোনও কালেই যেত না। নিরাপত্তার খাতিরে ফি মাসে পার্টি ফান্ডে চাঁদাও দিত না। কিন্তু অন্যসব চাঁদার ব্যাপারে হাত গুটিয়ে থাকত না। খরা বন্যা দুর্ঘটনাজনিত সাহায্যের ভাণ্ডারে চাঁদা দিত। সংগ্রাম তহবিলে সহযোগিতার হাত বাড়াত। নিত্যনতুন আবদার দাবিও মেনে নিত। কাল অকাল বন্ধেও সামিল হত। এবার এগুলি থেকেও নিজেকে একক আলাদা করে নিল। কিন্তু ব্যবসায়ী সমিতির পরিচালনায় অনুষ্ঠিত জাঁকালো দুর্গা কালী পূজার জন্য বরাদ্দ মোটা অঙ্কের দেয় চাঁদাটা বহাল রাখল।

বছর পার হয়ে গেল কিন্তু বলাইয়ের হাত গুটিয়ে নেয়া বুকের পাটায় পঞ্চুমহলে কোনও বিরূপ প্রতিক্রিয়া হল না। ফলে জনসন মোড়ের অন্য ব্যবসায়ীরা একটু অবাকই হল। চাঁদার জুলুমে নাভিশ্বাস ওঠা দোকানদাররা অনেকেই গোপনে বলাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করল। বলাই জনে জনে বোঝাতে চেষ্টা করল, আমরা খাস জমিতে বসে ব্যবসা করছি। ট্যাকসো যদি দিতেই হয় তো সরকারকে দেব। ওরা কোন বেনামদার নয়া জমিদার? একা আমি বিরুদ্ধে দাঁড়ালে হবে না। সবাইকে জোট বাঁধতে হবে।

বলাইয়ের জোট বাঁধার শলাপরামর্শটা আর গোপন রইল না। এবার নড়েচড়ে বসল পঞ্চু। আশঙ্কা করল, বলাই জোট বাঁধতে পারলে হয়তো পঞ্চায়েতের ভোটেও দাঁড়াতে চাইবে। পার্টির কাছে মুখ থাকবে তখন?

শুধু কী তাই? এখন তো পার্টিতে নীতিনিষ্ঠার বালাই নেই কোনও। বলাইয়ের হাতে লোকজন বেশি তো খেদাও পঞ্চু, বদলে বলাইকে পার্টিতে ভেড়াও। বেইজ্জতির বিরুদ্ধে ট্যাঁ ফোঁ করতে গেলেই বিপদ। এতকাল যেসব অপকম্ম করে পার পাওয়া গেছে সেগুলিই কাল হয়ে দাঁড়াবে। দুর্নীতিগ্রস্ত বদনাম দিয়ে পার্টি থেকে তাড়াবে তো বটেই পারলে কয়েদখানার ঘানি পর্যন্ত টানিয়ে ছাড়বে। ভাবতে গিয়ে পঞ্চু আঁত্‌কে উঠল। ঘেমেনেয়ে একশা। এতদিন ধরে বলাইকে যে ছলে বলে দাবিয়ে রাখার পরিকল্পনাগুলি কাঁচা বুদ্ধির কাজ ছিল তা বুঝতে পারল। এবার আর কোন

ভুল করতে চাইল না। বরাবরের জন্য পথের কাঁটাটাকে সরিয়ে দেওয়ার মতলব ভাঁজতে লাগল।

দিন পাঁচেক পর একদিন দুপুরে 'তৃপ্তি হোটেলে'র সামনে একখানা কালো অ্যামবাসেডার গাড়ি এসে দাঁড়াতে দেখা গেল। ভেতরে ক'জন বদখত ষণ্ডাগুণ্ডা চেহারার লোক বসা। কেউই গাড়ি থেকে নামল না। বলাইকে তাক করে ওরা যথেচ্ছে গোলাগুলি ছুঁড়তে শুরু করল। তাই দেখে ঝটাপট অন্যসব দোকানের ঝাপ পড়তে থাকল। আতঙ্কে লোকজনরা সব এ দোকান সে দোকানের মধ্যে সেঁধিয়ে গেল। অল্প দূরত্বে দু'তরফের যানবাহনই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। গাছের পাখিগুলি পাখনা ঝাপটিয়ে আর্ত ডাক চিৎকার করতে লাগল।

কয়েক মুহূর্তের ঘটনামাত্র। তারপর কালো গাড়িটা সদরের দিকে উধাও হয়ে গেল। আবার জনসন মোড় স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলেও উত্তেজনা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রইল।

হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময় বলাই অতিকষ্টে রক্তাক্ত ঠোঁট কাঁপিয়ে শুধু একটি কথাই বলতে পেরেছিল, রাখে কেষ্ট মারে কে! তারপরই বেহুঁশ হয়ে গিয়েছিল।

বলাই মারাত্মক জখম হলেও মরল না। কিন্তু, হোটেলে পাত পেতে বসে দু'জন কনস্টেবল ভাত খাচ্ছিল। ওদের একজন মারা গেল। অপরজনের অবস্থাও আশঙ্কাজনক।

দুঃসংবাদ শুনে চোখ কান বোজা বড়বাবু দেখলেন, এ যে শিরে সর্পাঘাত! শিয়রে সমূহ বিপদ। কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়তে পারে। আশু দায়দায়িত্ব এড়িয়ে গেলে পুলিশ কর্মচারি ইউনিয়নের ঠ্যালায় পড়ে চাকরি নিয়ে টানাহ্যাচঁড়া পড়ে যাবে।

একরকম বিপাকে পড়েই বড়বাবু পুলিশ-ঘায়েল হওয়া ব্যাপারটা ইজ্জত কী বাত হিসেবে নিলেন। সাঁজোয়া দলবল সঙ্গে নিয়ে জনসন মোড়ের দিকে গাড়ি ছোটালেন। পঞ্চু পবনের হোটেলের ঠেকে আচমকা হানা দিলেন। নিরীহ যাকে খুশি তাকেই উন্মত্ত বেধড়ক পেটাই করলেন। শেষমেশ ক'জন নির্দোষীকে ধরে এনে থানার লকআপে ভরলেন।

ব্যস নিরীহ নির্দোষীদের ওপর অন্যায় অত্যাচার দেখে নগেন ডাক্তার আর নিস্পৃহ চুপচাপ থাকতে পারলেন না। ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা দেশলাই কাঠিগুলিকে সমবেত করলেন। তারপর শুরু হল থানার সামনে বিক্ষোভ।

খবর পেয়ে এস পি ছুটে এলেন। থানায় ঢুকতে গিয়ে বাধা পেলেন তিনি।

বিক্ষুব্ধ জনতার দাবি, আগে নির্দোষীর মুক্তি চাই।

এস পি-কে ঘেরাও মুক্ত করতে পুলিশ বেপরোয়া লাঠি চালানো শুরু করল। তাতে যেন আগুনে ঘি পড়ল। ছত্রখান জনতা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। কিন্তু উচ্ছৃঙ্খল হল না। কানাইলালের বিরুদ্ধ পার্টির লোকজনের সঙ্গে একত্রে জনসন মোড়ে পথ অবরোধ করে বসল।

সবার অগোচরে পঞ্চু থানায় ঘাঁটি গেঁড়ে বসেছিল। বেগতিক বুঝে দলবলসহ সটকে পড়ে গা ঢাকা দিল। থানার বড়বাবুকে একপ্রস্থ গালমন্দ করলেন এস পি। গারদ খুলে সবাইকে মুক্ত করে দিলেন। তারপর সদরে ওয়ারলেসে সাহায্য চাইলেন, জনতার ক্ষোভের সঙ্গত কারণ আছে। ওরা এখন পর্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল হয়ে ওঠেনি। তবে বিক্ষোভকারীদের সংখ্যা যেভাবে দ্রুত বাড়ছে তাতে আইনশৃঙ্খলা আয়ত্তে না থাকতেও পারে। শান্তি বিঘ্নিত হওয়ার খুবই আশঙ্কা রয়েছে। যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। সড়কের ওপর তেলের ট্যাঙ্কারগুলি যেভাবে দাঁড়িয়ে আছে তা কখনই নিরাপদ নয়। এখুনি কয়েকখানা প্রিজনভ্যান বেশ কিছু আর্মড পুলিশ আর ক্রেনভ্যান পাঠানো দরকার।

ছ'গাড়ি আর্মড পুলিশ ক্রেনভ্যান নিয়ে এস ডি ও আর ডি এম রওনা দিলেন বটে কিন্তু জনসন মোড়ে এসে পৌঁছতে পারলেন না। জলকলের কাছে জ্যামজট আর জনতার বিক্ষোভে আটকে পড়লেন। ওদের দাবি, স্বয়ং মন্ত্রীকে আসতে হবে। নয়তো বুকের ওপর দিয়ে চালাও গাড়ি। আজ এস্‌পার ওস্‌পার বিহিত কিছু একটা চাই-ই-চাই।

থানার দিক থেকে একই ভাবে এস পি বাধা পেলেন। জনসন মোড়ের অবরোধের ওপর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে এস ডি ও আর ডি এম-কে উদ্ধার করা সম্ভব হল না। ঘন ঘন ওয়ারলেসে শলাপরামর্শ চলছিল এমন সময় স্বয়ং মন্ত্রী কানাইলালের তরফ থেকে বার্তা এল, তিনি আসছেন।

তিনি এলেন। চৌকস বুদ্ধি অমায়িক আচরণ আর বাক্যজালে জনতাকে শান্ত করলেন। হামলায় ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ দেবেন এবং আসল অপরাধীদের গ্রেফতার করে সাজা দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিতে পথ অবরোধ উঠে গেল।

পরদিন জনসন মোড়ের আন্দোলন খবরের কাগজের বড় খবর হয়ে গেল।

দিনের পর দিন গড়িয়ে গেল। না ক্ষতিপূরণ না অপরাধী গ্রেফতার। থানার বড়বাবুও বহাল রইলেন। সদলে পঞ্চুরও দেখা মিলল। বলাই ফিরে এসে হোটেলের হাল ধরল। আবার সব কিছু আগের মতো হয়ে গেল। শুধু নগেন ডাক্তারের আর কোনও হদিশ পাওয়া গেল না।

জনসন মোড় স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এল বটে কিন্তু খেটে খাওয়া সাধারণ দোকানীদের মন থেকে ভয় ভীতি আতঙ্ক গেল না। তখন শান্তির জন্য ওরা অন্য পথ খুঁজে নিল।

কয়েক মাস পরে জনসন মোড়ের হাওয়ায় টাকা উড়তে থাকল। দোকানগুলির স্বত্ব দখল মোটা টাকার বিনিময়ে বেচাকেনা শুরু হয়ে গেল। মস্তান দালালদের হাত ধরে ভিনদেশী ব্যবসায়ীরা আসতে লাগল। সঙ্গে লোভনীয় টাকার থলি।

এক এক করে জনসন মোড়ের শাল বাঁশ দরমা খড় টালির দোকানগুলির মালিকানা বদলে যেতে থাকল। গরিবিআনার পরিবর্তে নয়নজুলির ওপর পর্যন্ত ইট সিমেন্ট গ্রিল সাটারের পাকাপোক্ত এক দোতলা উঠতে শুরু করল। সানমাইকা-ডেকরেশন ঝলমলে আলো বিদ্যুৎ-পাখা আর নিওন-সাইন দিয়ে একাধিক দোকান গড়ে উঠল। তারপর গাদা ফুলের মালা ঝুলিয়ে পারফিউম ছিটিয়ে মিঠাই বিলিয়ে সেগুলি একের পর এক উদ্বোধন হল। প্রায় গোটা জনসন মোড়টাই ভিনদেশী ভাষাভাষীদের কব্জায় চলে গেল। অকাল প্রয়াত কানাইলাল মুখার্জি স্মরণে জনসন মোড়ের নতুন চমকদার বাজারের নাম হল, 'কানাইলাল মার্কেট'। একা বলাইয়ের 'তৃপ্তি হোটেল'টাই যা পুরনো চেহারায় কেরোসিন বাতির টিমটিমা আলো নিয়ে বেঁচে রইল।

মাত্র এক দশকে বদলে গিয়েছিল অনেক কিছুই। শিবতলা থেকে কাঞ্চন গাঁ ইস্তক পাকা সড়কের দু'ধারের ইতস্তত বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে এখন চোখধাঁধানো বাড়ি বসত। নাম শ্রীপল্লী, কল্যাণগড়, ব্যাঙ্ক কলোনি, লেনিন ল্যান্ড, গান্ধীনগর। কয়েকটা ছোটবড় কারখানা ওয়ারহাউস হিমঘর। পোলট্রি পেট্রোল-পাম্প গাড়ি সারাইয়ের গ্যারেজঘর। গ্রামীণ ব্যাঙ্ক শাখা ডাকঘর।

'কানাইলাল মার্কেটে' কীসের না দোকান এখন। স্টিল-ফার্নিচার টিভি ফ্রিজ সাইকেল মোটরবাইক আর ইলেকট্রনিকস গুডস পার্টস কিনতে হলে সদরে ছুটতে হয়না। রকমারি খানার জৌলুসদার রেস্তোরাঁ হয়েছে। সরকার-স্বীকৃত মদের দোকানও আছে। ক্ষেতজমি ভরাট করে দর্জি-বাজার ভিডিও সিনেমা হল আর মাছ মাংস ফল সবজির ছোটখাটো বাজার চলছে। তেমাথার মোড়ে আকছার অটো রিক্শা ট্যাক্সি মেলে। ভায়া জনসন মোড় মিনিবাস আর দূর পাল্লার এক্সপ্রেস বাস চলে।

এদিকে সড়কের দু'ধারের গাঁগুলি ক্রমশ আরও খাটো হয়ে যাচ্ছিল। নয়নজুলি ভরাটে তল্লাটের জল সরে না ঠিকঠাক। নাবাল ক্ষেতজমির ওপর বসত গড়ে ওঠায় বর্ষার জল ধরে রাখার জায়গায় টান পড়ছে। বর্ষাকালে রাজ্যের জল ছুটে এসে নিচু ভূমির গাঁগুলিকে ঘিরে ধরে। পুকুর ডোবা ক্ষেতজমি বানভাসি একশা একাকার।

বছরের সিংহভাগ সময় জলে ঘেরা গাঁগুলিকে নিঃসঙ্গ ছোট ছোট দ্বীপ মনে হয়।

এখন আর জনসন মোড়ে আগেকার মতো খোলা মাঠের উদাসী বাতাস ছুটে আসে না। পাখির ডানা ঝাপটা কিচির মিচির ডাক শোনা যায় না। নেই, আরও অনেক কিছুই। পরিবর্তে, বাজারি ভিড়ভাট্টা হৈ হট্টগোল। যাত্রী যানবাহনের হাঁকডাক হর্ন দাপাদাপি। পেট্রোল-পোড়া ধোঁয়া গন্ধ। রগরগে ফিল্মের আধ-ন্যাংটা মেয়েমানুষের রঙিন ছবিঅলা পোস্টার সাঁটা যত্রতত্র। পান বিড়ি ঠাণ্ডা জলের দোকানে টেপ রেকর্ডার গমগম করে অহরহ। অসহ্য, আরও অনেক কিছুই।

বদলে যায় অনেক কিছুই। কিন্তু 'জনসন মোড়' নামটা বদলায় না। বেঁচে থাকেন জনসন সাহেব। কেরোসিন-বাতির মতোই অল্প আলো নিয়ে বেঁচে থাকে বলাই আর ওর 'তৃপ্তি হোটেল'। যথারীতি প্রতিদিন সকালের ফার্স্ট বাসের আগে বলাইয়ের হোটেলের উনানে আঁচ ওঠে। চায়ের জল ফুটতে শুরু করে।

শেষ বয়সে কর্তার এখন ওর স্বজনদের কাছে নিজের ভিটেয় ফিরে গেছে। ভরত এখন টাইম কিপার। ছোট ভাই মাধুকে সঙ্গে নিয়ে ভরত ফার্স্ট বাস ধরে আসে। ওরা দু'জন বলাইয়ের পয়লা খদ্দের। তিনজনে একসঙ্গে বসে চা খায়। বলাইয়ের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকা ছেলেটির পরনে স্কুল-ইউনিফর্ম। পিঠে স্কুলব্যাগ। কাঁধে ঝুলন্ত ওয়াটার বটল। ছেলেটি বলাই-পিনির একমাত্র সন্তান। কর্তারের দেয়া নাম সংগ্রাম। সংগ্রাম ফি রোজ স্কুলে যাওয়ার আগে পরিচিত চা খাওয়ার দৃশ্যটা দেখে। চোখের পলক পড়তে চায় না। ওর ওই তাকিয়ে থাকার মধ্যেই বলাই কেমন যেন একটা ভাবান্তর লক্ষ্য করে। কিন্তু কিছুতেই দুর্বোধ্য অর্থটা ধরতে পারে না।

*ছবি ঃ কৃষ্ণেন্দু চাকী*

# তিন ধাপ সিঁড়ি ও স্বজন

আচমকা বাস ধর্মঘটে স্বজন বেশ বিপাকে পড়ে গেছে। আজকাল আকছার এরকম হঠাৎ হঠাৎই বন্ধ হতে দেখা যায়: সাধারণত প্রশাসন তড়িঘড়ি মাথা ঘামায় না। ফলে, সাধারণ মানুষের হয়রানির একশেষ।

একজন বাস ড্রাইভার কর্মরত অবস্থায় খুন হয়েছে। ব্রেক বিকল হয়ে পড়েছিল। ড্রাইভারের অপরাধ, বাসভর্তি যাত্রীর নিরাপত্তার জন্য সে রাস্তার ল্যাম্পপোস্টে বাসটাকে রুখে দেয়। তাতে একজন হকার মারাত্মক রকম আহত হয়। সেজন্য জনরোষের মধ্যে কে একজন অতিমাত্রায় উত্তেজিত হয়ে পড়ে। তর্কাতর্কির জটলা থেকে ছুরি চালিয়ে দেয়। অভিযোগ, অবস্থা সামাল দিতে পুলিশের তরফে কোনও তৎপরতাই ছিল না।

তা এরকম পরিস্থিতিতে খুনিকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার আর বাসকর্মীদের নিরাপত্তার দাবিতে ধর্মঘট তো হতেই পারে। কিন্তু, দুর্ঘটনার পর পাঁচ ঘন্টা পেরিয়ে যেতেও প্রশাসন সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসবে না কেন?

স্বজনের সমস্যা সেজন্য। দশদিনের ট্যুরটা মোটামুটি ভালই হয়েছে। নেতারহাট বেতলা হুড্রু জোনা দশম ফলস দেখা সারা। সর্বশেষ প্রোগ্রাম ছিল কাল সকালে। রাজারাপ্পা ঘুরে এসে সন্ধ্যায় ট্রেন ধরার কথা। সেই হিসেবমতো রিজার্ভেশন করা আছে।

তা বেড়াতে বেরিয়ে পথে কত রকম অনিবার্য বাধা তো আসতেই পারে। আজকাল কোন জিনিসটা আর ঠিকঠাক হিসেব মতো হয়? রাজারাপ্পার প্রোগ্রামটা বাতিলের জন্য স্বজন অনেকভাবে বোঝানোর চেষ্টা করেছে। সমাপ্তি তবু অবুঝ, নাছোড়বান্দা। রাঁচি বেড়াতে এসে রাজারাপ্পা যাওয়া যেন খুবই জরুরি এমন একটা ভাব করছে। এমন সব আচরণ করছে যেন ছিন্নমস্তা মায়ের মন্দিরে পুজো না-দিয়ে ঘরে ফিরলে মহা সর্বনাশ হয়ে যেতে পারে।

মন খারাপ করে দুপুরে স্বাভাবিক খাবার খায়নি সমাপ্তি। কিছু একটা উপায় বের করতে বলে মুখ ভার করে আছে।

রাঁচিতে মিটার-ট্যাক্সি নেই। অটো রিক্‌শা আর কিছু প্রাইভেট ট্যাক্সি আছে। টুকু

টুলু ভাইবোন অল্পবয়সী। বিধবা শাশুড়ি ঠাকুরণ বয়সের ভারে ক্লান্ত, দুর্বল। সমাপ্তিকে নিয়ে মোট পাঁচজনে অটো রিক্‌শায় চড়ে এতটা দূরের রাস্তার যাত্রী হওয়া নিশ্চয়ই বুদ্ধি বিবেচনার কাজ হবে না। এ ব্যাপারে সমাপ্তির সঙ্গে স্বজন একমত।

যা হোক একটা কিছু ব্যবস্থা তো করতেই হবে।

পড়ন্ত রোদ্দুরের বিকেলে স্বজন সকলকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। বাস ডিপো সিণ্ডিকেটে খোঁজ নিয়ে জানতে পারে, খুনিকে গ্রেপ্তার না-করা পর্যন্ত বাসের চাকা ঘোরার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নেই। তাছাড়া, কাল মরদেহ নিয়ে শ্মশান-শোকযাত্রার কথাও ভাবা হচ্ছে। দীর্ঘ পায়ে হাঁটা পথে নানা জনের খোঁজখবর নিয়ে স্বজন মার্কেটে এসে পৌঁছায়। এতক্ষণে প্রাইভেট ট্যাক্সির হদিশ মেলে। সারিবদ্ধ কয়েকটা প্রাইভেট কার দাঁড়িয়ে আছে। কাছেই কয়েকজন লোক গল্পগুজব করছে। জিজ্ঞাসায় জানা যায়, গাড়িগুলি ওদেরই। খদ্দেরের আশায় ওরা এভাবে জটলা করে দাঁড়িয়ে থাকে।

রাজারাপ্পা যাতায়াতের ভাড়া শুনে স্বজনের চক্ষু চড়কগাছ। বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে উঠে উত্তেজিত হয়ে পড়ে, সাড়ে সা-আ-ত-শো টাকা? তোমরা ডাকাত নাকি?

ডাকু কি বলছেন বাবুসাব! সরকার তেলকা ভাও কিত্‌না বাড়ায়া শোচ্‌না চাহিয়ে। ঘিরে ধরা জোটবদ্ধ ড্রাইভারদের কে একজন জবাব ছুঁড়ে দেয়।

তাই বলে এত টাকা! কত কিলোমিটার পথ হবে? স্বজন যুক্তি দিয়ে হিসেব বুঝতে চায়।

ওয়েটিং চার্জ ভি ধরতে হবে। অপর একজন বাড়তি হিসেবটা ধরিয়ে দেয়।

বেশ তো ঘন্টায় কত টাকা? কিলোমিটারেই বা রেট কত? স্বজন ন্যায্য ভাড়াটা কত হওয়া উচিত তা বুঝিয়ে দিতে চায়।

ওসব রেট ফেট ছোড়িয়ে। বাস ইস্‌ট্রাইক আছে। থোড়া জাস্তি তো হোবেই। অন্য একজন মস্তানি ঢঙে অবজ্ঞাসূচক ভঙ্গিতে বলে।

বাস স্ট্রাইক হলে তো আর ডিজেল পেট্রোল মবিলের দাম বেড়ে যায় না। তাহলে জাস্তি হবে কেন? স্বজন ক্রমশই উত্তেজিত হয়ে পড়ে। সমাপ্তি ভয় পেয়ে গোপনে হাত টেনে সংযত হতে বলে। তাতে কিছুটা কাজ হয়। স্বজন সুর নরম করে।

আমরা ভাই পরদেশী ট্যুরিস্ট। বালবাচ্চা বিবি নিয়ে তোমাদের এখানে বেড়াতে এসেছি। এভাবে জোর জুলুম করলে চলে?

জুলুম নেহি বাবুসাব। স্বজনের মতোই সুর নরম করে প্রথম জন সত্যি কথাটা কবুল করে, সালমে অ্যায়সা মওকা মিলতা এক দো দফে। ট্যুরিস্ট লোগোঁসে যো

কুছ জাস্তি মিলে। নেহি তো বাজার বহত ঠাণ্ডা।

লোকটির কথায় যে আবেগ আর্দ্রতা তা স্বজনকে শীতল শান্ত করে দেয়। সে সহানুভূতিতে দুর্বল হয়ে পড়ে। কিন্তু, পকেটের দিকটাও তো চিন্তা করতে হবে। ঘরে ফেরার মুখে তলানি যেটুকু আছে তার সঙ্গে সমাপ্তির নিজস্ব টাকাটা যোগ দিলেও কিছুতেই হিসেবে আসে না। তাই সুরটা আরও বেশি নরম করে মন কেড়ে নিতে সচেষ্ট হয়।

আমরা তো ভাই কালোটাকার শেঠ না। খেটেখাওয়া ছাপোষা সাধারণ মানুষ। লোক বুঝে তবেই তো মওকা লুটবে। একটা রিজনেবল রেট বলো যাতে আমরা যেতে পারি। আবার তোমাদেরও লোকসান না-হয়।

ঠিক হ্যায় পঁচাশ কম, পুরা সাতশো তো লাগেগা জরুর। ইস্‌সে কমতি সে, কোই লে যায়েগা তো আচ্ছা। হামসে নেহি হোগা।

আপনি সাতশো টাকায় যাবেন? পরিষ্কার বাংলায় একজন তরুণ জিগ্যেস করে। তরুণটির চেহারা দেখে বাঙালিই মনে হয়। হয়তো প্রবাসী বাঙালি হলেও হতে পারে।

না ভাই সাতশো টাকা কোনওমতেই সম্ভব না। স্বজন প্রথম জনের সঙ্গে দরকষাকষি আলাচনায় ইতি টেনে ঘুরে দাঁড়ায়। তরুণটি আলতো করে হাত ছোঁয়। অন্যদের অসন্তুটিকে আমল না দিয়ে একটা মারুতি স্টেশন ওয়াগনের কাছে স্বজনকে নিয়ে যায়। দরজা খুলে দিয়ে বলে, দেখুন। একদম নতুন। টেপ রেকর্ডারও আছে। ছ'শো টাকা দেবেন?

নম্বর দেখেই বোঝা যাচ্ছে, গাড়িটা প্রাইভেট। সব শহরের ধনীরাই এভাবে তাদের ব্যবহারের জন্য কেনা গাড়ি দু'এক খেপ ভাড়া খাটিয়ে রোজগার করে থাকে স্বজন তা জানে।

গাড়িটা বেশ টিপটপ ঝকঝকে। যেন শো রুম থেকে সবে সেজেগুজে বেরিয়েছে। সুন্দরী রমণীর মতো দেখতে মারুতি গাড়িগুলি রাস্তায় বেরিয়েছে সেই কবে থেকে। হাওয়ায় ভেসে বেড়ানো পাখির মতো শব্দহীন এইসব সুন্দরীদের দিকে তাকিয়ে স্বজন কতদিন যে দীর্ঘশ্বাস উড়িয়েছে।

গাড়িটা দেখে সমাপ্তিও খুব খুশি। পারলে যেন এখনই চড়ে বসে। রাতেই রাজারাপ্পা রওনা হয়ে যেতে রাজি।

দরজা খোলা পেয়ে টুকু টুলু ভেতরে ঢুকে পড়েছে। নরম গদির সিটে ঘোড়ায় চড়ার মতো দোল খাচ্ছে। টুকু তাড়া দেয়, বাপি মামণি দিদা শিগ্‌গির উঠে এসো। টুলু ভয় দেখায়, তোমাদের ফেলে গাড়ি ছেড়ে দেবে যে।

বেয়াদপি করো না। এক্ষুণি নেমে এসো বলছি।

স্বজন ভয়ঙ্কর চিৎকার করে ওঠে। আচমকা ধমক খেয়ে ওরা দু'জনে ভয় পেয়ে নিস্তেজ হয়ে পড়ে। চোখ মুখ বিষণ্ণ করুণ করে নেমে এসে কাছে দাঁড়ায়। স্বজন দু'হাতে দু'জনকে ধরে দ্রুত পা চালিয়ে হাঁটতে থাকে। পিছু পিছু মায়ের হাত ধরে সমাপ্তি অনুসরণ করে। স্বজনের ওপর রাগ অভিমানের পাহাড় জমে ওঠে। এরকম সুযোগ কেউ হাতছাড়া করে!

হতাশ স্বজনের হঠাৎই দীনু জ্যাঠার কথা মনে পড়ে যায়। ঠিকানাটা ভুলে গেলেও মনে হয়, বাড়িটা ধারে কাছে এখানেই কোথায় যেন হবে।

তা প্রায় বছর পঁচিশ আগেকার কথা। চাকরির একটা ইন্টারভিউ পেয়ে রাঁচি আসতে হয়েছিল। যারা ইন্টারভিউতে ডেকেছিল তাদের তরফে হোটেলে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা ঠিকঠাক করা ছিল। তবু, আসার সময় বাবা তাঁর বন্ধুর নামে একখানা হাত চিঠি দিয়েছিলেন।

চিঠিটা পড়ে দীনু জ্যাঠার চোখ মুখে সে যে কী খুশি আনন্দের হাসি। পরিচয় দিয়ে প্রণাম করতে দু'হাত বাড়িয়ে এমনভাবে বুকে জড়িয়ে ধরলেন যেন বাল্যবন্ধুকেই পেয়ে গেছেন। অন্দরে নিয়ে গিয়ে হাঁকডাকে জ্যাঠাইমাকে কাছে ডেকে এনে বললেন, কে বলতো? ছোট সুজন। আমার বন্ধু সুজনের ছোটছেলে গো।

তারপর দু'জনে মিলে সে যে কী ব্যস্ততা আদর আপ্যায়ন। যেন অনেক দিন পর নিজের ঘরের বিশেষ প্রিয় কোনও ছেলে ফিরে এসেছে। সব কিছু জেনেশুনেও দীনু জ্যাঠা নিজে গাড়ি হাঁকিয়ে গিয়ে হোটেল থেকে অ্যাটাচি কেসটা তুলে নিয়ে এসেছিলেন।

তারপর গভীর রাত পর্যন্ত কত যে গল্প। জানিস, এক গাঁয়ের ভিটে সম্পর্কে আমি ফরিদপুর টাউনে তোদের বাড়িতে থেকে স্কুলে পড়াশুনো করেছি। স্কুলে অনেকেই ভাবত, তোর বাবা আর আমি দুই ভাই। তোর ঠাকুর্দা ঠাকুরমা তো হাঁক ছেড়েই বলতেন, আমাদের দুই ছেলে। তোর বাবা বরাবর ক্লাসে ফার্স্ট হত। আর আমি সেকেন্ড। কত চেষ্টা করেছি, তবু একবারের জন্যও ফার্স্ট হতে পারিনি। তারপর দু'জনে কলকাতায় কলেজে পড়তে এলাম। কলেজ আলাদা কিন্তু শুধু একসঙ্গে থাকার জন্য হস্টেলের বদলে মেসে থাকতাম। দু'জনে কত যে জামাকাপড় পাল্টাপাল্টি করে পরেছি। আমি সায়েন্স নিয়ে পড়ে ডাক্তার হলাম। তোর বাবা এম এ ল' পড়ে অ্যাডভোকেট। দেশ ভাগ হতে দু'জনেই বিছিন্ন হয়ে পড়লাম। বহু বছর নানা জায়গায় ঘুরে এখানে সেটল্ড হয়ে আমি যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করেছিলাম। সুজনের হয়তো রাঁচি আসা দরকার হতো না। কিন্তু, প্রয়োজনে কলকাতায় গেলে আমি হাজার ব্যস্ততার মধ্যেও হাইকোর্টে ওর সঙ্গে দেখা করতাম। ওকে এখানে

বেড়াতে আসতে বলতাম। কেন জানি না, সুজন কিন্তু আমাকে তোদের বজবজের বাসায় যেতে বলতো না। তাই একরকম অভিমান করেই আমিও আর দেখা সাক্ষাৎ করি না। এখানে যদি তোর চাকরিটা হয়ে যায় তো আমার কাছেই তোকে রেখে দেব। তখন দেখব, ব্যাটা কেমন করে না-এসে থাকতে পারে।

দীনু জ্যাঠার বয়স তখন কত ছিল? বাবার সহপাঠী যখন তাতে এখন আশির নিচেই হবে। বাবা বেঁচে নেই। দীনু জ্যাঠা কি বেঁচে আছেন? স্বজন ভাবে, তবু খোঁজ নিতে দোষ কি! বেঁচে থাকলে কালকের ব্যাপারে নিশ্চিত কোনও একটা সমাধান—পথ খুঁজে বের করবেন।

উকিল মাস্টার ডাক্তারদের নামে সাধারণত কাছে দূরের লোকজন সহজেই তাঁদের বাসা বাড়ি চেনে জানে। সেই অঙ্কে জিজ্ঞাসাবাদে গলির মুখে এসে দাঁড়াতে স্বজনের স্মৃতির আব্রু উধাও হয়ে যায়।

পাড়াটা আর আগেকার মতো নিরিবিলি খোলামেলা ফাঁকা ফাঁকা নেই। আধুনিক চটকদার বাড়ি ঘরদোর দোকানপাটে ঠাসা জমজমাট হয়েছে। রাস্তায় বিদ্যুৎ বাতি জ্বলছে। অভিজাত পাড়ার মতো সব কিছু উজ্জ্বল ঝলমলে। কিন্তু, মোড়ের মাথায় মিষ্টির দোকানটা আগের মতোই আছে। সেই সূত্রে স্বজন সব কিছু ঠিকঠাক চিনতে পারে। দীনু জ্যাঠার বাড়িটা আগের মতো একতলাই আছে। তুলনায় এখন অনেক বিবর্ণ। চারদিকে তাকিয়ে দেখলে এই ব্যতিক্রম বাড়িটাকে পাড়ায় বড় বেমানান লাগছে। পাঁজর বের করা পাঁচিল। গেটে মাধবীলতা গাছটা দেখা যাচ্ছে না। সামনে সাজানো বাগান সবুজ লন উধাও। পরিবর্তে আগাছা জঞ্জাল বুনো লতাপাতা জমে আছে। মরচে ধরা গ্রিল ঘেরা বারান্দায় রোগীদের বসার জন্য চেয়ারগুলি তেল চিটচিটে। সুমুখে ডিসপেনসারি ঘরটা বন্ধ। রাস্তার বাতিস্তম্ভ থেকে ঠিকরে আসা দীন আলো এসে দেয়ালে পড়েছে। ইংরেজি হরফে লেখা—ডাঃ দীননাথ মিত্র। নামটা পড়া গেলেও পাশে ক্ষুদে অক্ষরে লেখা ডিগ্রিগুলি বোঝার উপায় নেই।

আগন্তুকের সাড়া পেয়ে সিঁড়িতে শুয়ে থাকা নেড়ি কুত্তাটা উঠে দাঁড়ায়। দূরে সরে গিয়ে জুলজুল চোখে তাকিয়ে থাকে।

গ্রিলের ফাঁক দিয়ে হাত গলিয়ে তিন তিনবার নব টেপে স্বজন। কলিং বেল বাজার কোনও শব্দ না শুনে বুঝতে পারে, বেলটা অকেজো হয়ে আছে। তাহলে? গ্রিল দরজার ভেতর দিক থেকে যখন তালা ঝুলছে তাহলে মানুষজন নিশ্চিত আছে। উঁচু শব্দ তুলে তালাটা নাড়তে বারান্দায় আলো জ্বলে ওঠে।

কাকে চাইছেন?

দরজা খুলে সামনে দাঁড়িয়ে যে মহিলাটি প্রশ্ন করল অনুমান সে হয়ত পরিচারিকা হবে।

ডাক্তার দীননাথ মিত্র—

দীনু জ্যাঠা যদি বেঁচে না-থাকেন? তাই বুদ্ধি খরচ করে স্বজন অসম্পূর্ণ উত্তর দেয়।

উনি অসুস্থ। পেশেন্ট দেখতে ছেলের বারণ আছে।

আমি পেশেন্ট না। কলকাতা থেকে এসেছি। একবারটি দেখা করতে চাই।

আপনার নাম?

স্বজন বসু। বজবজের সুজন বসুর ছেলে বললে ভাল চিনবেন।

মহিলাটি ভেতরে যেতে স্বজনের মুখে একচিলতে খুশি উছলে পড়ে। যাক্, তাহলে বেঁচে আছেন। পাঁচিলের গায়ে গ্যারেজ ঘরের গ্রিল—ফাঁকে গাড়িটা দেখতে পেয়ে পুলকিত হয়ে আশার আলো দেখে। দীনু জ্যাঠা কিছু একটা ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করে দেবেন।

মহিলাটি ফিরে এসে গ্রিল গেটের তালা খুলে বলে, আসুন। বাঁয়ে বৈঠকখানা ঘরে নিয়ে গিয়ে মলিন সোফায় বসায়। তারপর মাথার ওপর ঝুলকালি মাখা পাখাটা চালিয়ে দিয়ে বলে যায়, একটু অপেক্ষা করতে হবে। সবেমাত্র বাথরুমে ঢুকেছেন।

সময় কাটাতে স্বজন ঘরের চারিদিকে ঘুরে ফিরে দেখে। বৈঠকখানাতো নয় যেন লাইব্রেরি ঘর। নানা বইয়ে ঠাসা একাধিক আলমারি। একটা টেবিলের ওপর পুরনো আমলের চোঙঅলা কলের গান। একখানা ইজিচেয়ার। একটা শো-কেসে ছাত্রজীবনে পাওয়া কিছু পুরস্কার আর ফটো। দেয়ালে টাঙানো দেবদেবী আর রবীন্দ্রনাথ নেতাজির ছবি। পুরনো আমলের স্তব্ধ ঘড়ি। সব কিছুই অযত্নে নোংরা মলিন। ঘরময় ধুলো ঝুল মাকড়সার জাল। ইতস্তত আরশোলা ইঁদুর টিকটিকি। বাতাসে স্যাঁতসেতে গন্ধ। মাথার ওপর পাখাটা ডানা ঝাপটাচ্ছে খট খটাং খট খটাং।

সামনে দাঁড়ানো দীর্ঘদেহী স্বাস্থ্যবান পুরুষটির মাথায় দুধসাদা একরাশ চুল। চোখে পুরু লেন্সের বাই ফোকাল চশমা। পরনে ফতুয়া আর সাদা লুঙ্গি। দেখে কে বলবে উঁনি অসুস্থ।

চিনতে পারছেন? আমি বজবজের সুজন বসুর ছেলে স্বজন। প্রায় পঁচিশ বছর আগে একবার ইন্টারভিউ দিতে এসে এখানে রাত কাটিয়ে গিয়েছিলাম।

পরিচয় দিয়ে পা স্পর্শ করে প্রণাম করে স্বজন।

থাক থাক আজকাল আবার কেউ পা ছুঁয়ে প্রণাম করে নাকি!

দীনু জ্যাঠা বললেন বটে কিন্তু মনে মনে খুশিই হলেন। বসতে বলে নিজে ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে বললেন, তা এত বছর পর এই সন্ধ্যা রাতে কোথা থেকে কি মনে করে?

রাঁচি বেড়াতে এসেছি তাই একবার—

বুঝেছি। তোমার বাবা মা গত হয়েছে সে খবর জানি। তুমি যে এখনও আমাকে ভুলে যাওনি সেজন্য খুশি হয়েছি। তা একাই বেড়াতে এসেছ?

আজ্ঞে না। ছেলেমেয়েকে নিয়ে আপনার বউমা এসেছে। আর আমার শাশুড়ির মেয়ে ছাড়া তিনকুলে কেউ নেই, তাই তাঁকেও নিয়ে এসেছি।

ওদেরকে কোথায় রেখে এসেছ?

পঁচিশ বছরে জায়গাটা অনেক বদলে গেছে তো তাই বাড়িটা খুঁজে পাব কি না সন্দেহ ছিল। ওদেরকে মোড়ের মিষ্টির দোকানে বসিয়ে রেখে এসেছি।

ননসেন্স। দীনু জ্যাঠা চিৎকার করে লাফিয়ে উঠলেন। ভেতর দরজার কাছে গিয়ে হাঁক দিলেন, বকুলের মা একবারটি এসো তো। তারপর অশান্ত পায়চারি করতে করতে ভর্ৎসনা করলেন, সুজনের ছেলে হয়ে তুমি এমন একটি অপদার্থ হয়েছ? ছিঃ।

সেই মহিলাটিই বকুলের মা। সে কাছে এসে দাঁড়াতে দীনু জ্যাঠা নির্দেশ দিলেন, এক্ষুণি মোড়ের শ্রীদুর্গা মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে একবার যাও তো। এই বেয়াদপকে তুমি চিনবে না। তোমার মা বেঁচে থাকলে চিনতো। আমার বন্ধুর ছেলে। ছেলে মেয়ে বউ শাশুড়িকে ইডিয়েটটা কতক্ষণ যে ওখানে বসিয়ে রেখে এসেছে তা কে জানে। নিজে দিব্যি ফ্যানের তলায় বসে হাওয়া খাচ্ছে, আশ্চর্য। তুমি গিয়ে ওদেরকে নিয়ে এসো।

আমিই গিয়ে নিয়ে আসছি।

স্বজন উঠতে যাচ্ছিল ধমক খেয়ে বসে রইল। দীনু জ্যাঠা বসে ফতুয়ার পকেট থেকে একখানা পঞ্চাশ টাকার নোট বের করলেন। বকুলের মা-র হাতে দিয়ে বললেন, ভাল ভাল মিষ্টি নিয়ে আসবে। কিছু নোনতাও আনবে। পুরো টাকাটাই খরচ করবে।

বকুলের মা কে? ওর মা হলে আমাকে চিনতো বললেন যে। চাপা কৌতূহল গোপন রাখতে পারে না বলে স্বজন জিগ্যেস করে।

তুমি চিনবে না। সুজন চিনতে পারতো। ওরা আমাদের দেশ গাঁয়ের লোক। তিন পুরুষ ধরে আত্মীয়ের মতো আমাদের সঙ্গে আছে। ওকে আমিই বিয়ে দিয়েছিলাম। বিধবা হয়ে বাচ্চা বকুলকে নিয়ে ফিরে আসে। বকুলকেও বিয়ে দিয়েছি। ভয়ে

সর্বক্ষণ ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, সে যেন আবার বিধবা হয়ে বা স্বামীর কাছে অত্যাচার লাঞ্ছনা পেয়ে অভাগীর মতো ফিরে না আসে। উত্তরপুরুষরা তো আর কাউকে আত্মীয়ের মতো ভালবাসতে শেখেনি। আমার অবর্তমানে যদি বা গ্রহণ করে তো ঝিয়ের মতোই ট্রিটমেন্ট করবে। সে বড় নিষ্ঠুর ব্যাপার হবে।

বকুলের মা ছাড়া এখন এখানে আর কে কে আছেন?

প্রশ্ন শুনে দীনু জ্যাঠার বুকের গভীর থেকে উদাসী বিষণ্ণ দীর্ঘশ্বাস ছড়িয়ে পড়ে। কিছুক্ষণ নির্বাক নিশ্চুপ থেকে উত্তর দিলেন, কয়েক বছর আগেও ছেলে বউমা নাতি নাতনিরা সকলেই ছিল। তারপর শুধু বকুল আর ওর মা রইল। বকুলের বিয়ে হয়ে যেতে এখন তবু দু'জনে আছি। মাঝে মাঝে ভীষণ ভাবনা হয়, একজনকে তো আগে যেতেই হবে। তখন বাকিজনের অবস্থা কী দাঁড়াবে? কালের হাওয়া দেখে নানা আশঙ্কা ভয় হয়।

স্বজন অপ্রস্তুত বিব্রত বোধ করে। যে উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে আসা তা বোধহয় নিজের বোকামি প্রশ্নে ব্যর্থ হতে বসেছে। এরকম মানসিক অবস্থাতে কোনও সাহায্য চাওয়া মানে নির্মম অমানুষিকতা। চক্ষু লজ্জার মাথা খেয়ে সাহায্য চাইলেই কি আর পাওয়া সম্ভব হবে?

সামনের জানলার দিকে তর্জনী তুলে দীনু জ্যাঠা বললেন, রাস্তার ওপারে চটকদার দোতলা বাড়িটা দেখছ? ওটা আমার ছেলের। পায়রার খুপরির মতো এক গুচ্ছের ঘর আছে। ওরকম ঘরে বাস করলে হৃদয় বড় হবে কেমন করে? বড় নাতি ক'মাস আগে ভালবাসার বিয়ে করেছে। ব্যস তারপরেই বড় পাকা সড়কের পাশে শ্বশুরবাড়ির কাছাকাছি ফ্ল্যাট কিনে উঠে গেছে।

এতক্ষণ যেটুকু বা অতিবিশ্বাসের আশা সঞ্চিত ছিল স্বজন সেটুকুও হারিয়ে হতাশ হয়ে বসে থাকে। দীনু জ্যাঠাকে চাঙ্গা করে তোলার মতো তেমন কোনও যুতসই চিন্তা মাথায় আনতে পারে না। তবু, সৌজন্য বোধের তাগিদে সমবেদনা জানানো সঙ্গত মনে করে বলে, খুবই মনোকষ্টে আছেন তাহলে?

কে বললে। দীনু জ্যাঠা বুক টান করে বসেন, ওরা তো আদরযত্নে কাছে রাখতেই চায়। কিন্তু, হৃদয় রুচি মানসিকতায় আমার সঙ্গে বিস্তর ফারাক যে। মানিয়ে চলব কেমন করে? তাছাড়া, এখানেই আমার নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ভাল চলে। বেশ সুস্থ শরীরে শান্তিতে আছি।

তবে যে শুনলাম আপনি অসুস্থ?

কে বলল?

দীনু জ্যাঠা এমনভাবে গর্জে উঠলেন যেন আগুনে ঘিয়ের ছিটে পড়েছে। জ্বলজ্বলে

চোখ দু'টো যেন হিংস্র হয়ে উঠেছে। স্বজন প্রমাদ গুনে আত্মপক্ষ সমর্থন করে, বকুলের মা বলছিল। আমাকে রোগি ভেবে বলেছিল, আপনার অসুস্থতার জন্য ছেলে নাকি পেশেন্ট দেখতে মানা করেছে।

তাই বলো।

আচমকা জ্বলে ওঠা আগুনটা ধপ করে নিভে যায়। শান্তির জলে শান্ত দীনু জ্যাঠা স্বাভাবিক হয়ে ওঠেন।

তা এই বয়সে প্রস্রাব, পায়খানায় একটু আধটু ট্রাবল থাকবে না? তেমন খাবার পাচ্ছি কোথায় যে শরীর দুর্বল হবে না। কিন্তু তাতে হয়েছেটা কী? এখনও জগিং যোগ ব্যায়াম করি। ওরা তো পঞ্চান্ন আর আঠাশ বছর আগেকার মডেল। দৌড়ে পারবে আমার সঙ্গে? মানা করলেই মানছে কে। ডাক পড়লে চুপচাপ থাকতে পারব না বাপু। আমরা তো আর টাকার লোভে ডাক্তারি লাইনে আসিনি। সমাজসেবামূলক বৃত্তি হিসেবেই পছন্দ করেছিলাম। সুজনও বোধকরি বৃত্তিটাকে সেভাবেই বেছে নিয়েছিল। নইলে তোমাদের জন্য একটা ছোটখাটো বাড়ি পর্যন্ত করে যেতে পারল না কেন?

ঠিকই বলেছেন।

স্বজন বাবার কথায় ফিরে আসে, দেখেছি তো কত লোককেই না বাবা বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করে দিতেন। বড় মুখ করে সবাইকে প্রচার করতেন, দেখবেন উকিলের ফি-র অভাবে কোনও গরিব দুঃখী যেন প্রাপ্য আদায় আর ন্যায্য বিচার থেকে বঞ্চিত না-হয়। আরে আমি তো বেঁচে আছি। ছোট্ট কাগজে বাবা হিসেব লিখতেন, কোর্ট ফি স্ট্যাম্প কাগজ টাইপ খরচ মুহুরি উকিলের ফি ইত্যাদি ইত্যাদি। তারপর যোগ দিয়ে টাকা আনা পয়সায় ঠিক প্রাপ্যটুকুই নিতেন। আমাদের জানাশোনা কত লোক যে গরিবের ভান করে বাবাকে ঠকিয়ে যেত। আমরা ধরিয়ে দিলে বাবা অসন্তুষ্ট হয়ে বোঝাতেন, অবিশ্বাসের চেয়ে বিশ্বাস করে ঠকা অনেক পুণ্যের কাজ রে।

পুরনো আমলের আলোচনাকালে বেশি বয়সীরা এক ধরনের 'ম' 'ম' গন্ধে নেশায় বিভোর হয়ে থাকেন। নস্টালজিয়ায় আত্মসুখ অনুভব করেন। দীনু জ্যাঠা ক্রমশ স্বাভাবিক হয়ে উঠছিলেন।

তবে আর বলছি কী? আমাদের সময়কার ডাক্তাররা বিনা পারিশ্রমিকে কত যে রোগি দেখত। গরিব দুঃখীদের ফ্রি ওষুধ দিত। ব্যক্তিগত সুখ ভোগ স্বাচ্ছন্দ্য ভুলে গিয়ে রোদ রাত বিরেত এমন কী জল ঝড় শীতের গভীর রাতেও দূর দূরান্তে রোগি দেখতে ছুটত। ডাক্তারির তিনটি মূল কথা—চিকিৎসা সেবা শুশ্রূষা।

সেদিক থেকে বিচার করলে হালের ডাক্তাররা তো এক একটি ক্রিমিনাল বিশেষ। নইলে ভাবতে পার, মাত্র আঠাশ বছর বয়সের ডাক্তার নাতি আমার কখনও ফ্ল্যাট কিনতে পারে? তা তোমরাও কী বাবা মা বেঁচে থাকতে আলাদা বাড়ি করে পালিয়েছ নাকি?

আজ্ঞে না। অত টাকা কোথায় যে বাড়ি করব। এখন পর্যন্ত দাদা আমি একসঙ্গেই আছি। তবে দিদির বিয়ের পর আরও ভাল পরিবেশে বেশি ঘরঅলা বাসা দেখে উঠে গেছি।

ভাল, খুউব ভাল। পারলেও বাড়ি কোর না। বাড়ি করেছ কি শরীর মন জয়েন্ট ফ্যামিলি সব ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। আজকাল আলাদা থাকার দরুন মানুষ সঙ্কীর্ণমনা স্বার্থপর আর বড় বেশি হিসেবি হয়ে যাচ্ছে।

আলোচনাটা যখন বেশ দানা বেঁধে উঠেছে সকলকে নিয়ে বকুলের মা এসে ঘরে ঢোকে। স্বজন পরিচয় করিয়ে দিতে ওরা একে একে প্রণাম করে। দীনু জ্যাঠার বুক ভরে যায়। উজ্জ্বল আনন্দে চোখের কোণ চিকচিক করে।

স্বজনের শাশুড়িকে উদ্দেশ করে দীনু জ্যাঠা বললেন, আপনার জামাইটি একটি ক্রিমিনাল। আপনাদেরকে পথে বসিয়ে রেখে ফ্যানের তলায় দিব্যি গল্প জমিয়ে বসেছে। আপনি বরং সকলকে নিয়ে ভেতরে যান। একটু বিশ্রাম করুন। আর বউমা তুমি বকুলের মা-কে একটু সাহায্য করো। চা-টা তুমিই বানিও।

কথাগুলি এমন ঢঙে সাবলীল ভঙ্গিতে বললেন যেন সকলেই দীর্ঘদিনের পরিচিত আত্মীয়র মতো।

ওরা ভেতরে চলে যেতে স্বজনকে আবার আক্রমণ করলেন, বলিহারি তোমার আক্কেল। আগে থেকে একটা চিঠি দিতে পারনি? নেতারহাট বেতলা ফরেস্টে থাকার ভাল ব্যবস্থা করে রাখতে পারতাম। গিয়ে দেখগে ভোগান্তি কাকে বলে তা হাড়ে হাড়ে টের পাবে। তখন বুঝবে, কী যে ভুল করেছ।

আজ্ঞে ওগুলি আমাদের দেখা হয়ে গেছে।

কোনও হোটেলে উঠেছ? এতগুলি ফাঁকা ঘর তাহলে কি করতে পড়ে আছে শুনি। এবারও কী সেবারকার মতো হোটেল থেকে মালপত্তর তুলে নিয়ে আসতে হবে?

আজ্ঞে না। আমাকে ক্ষমা করবেন। যদি জানতাম, আপনি এখন একা থাকেন তাহলে নিশ্চয়ই এখানে এসে উঠতাম।

বেশ তো ক্ষমা করলাম। কিন্তু, এখনও তো হুড্রু জোনা দশম ফলস দেখতে বাকি আছে। এ ক'দিন আমার এখানেই থাকবে। সুজন আমি সেই সময়ের মানুষ

যারা খেতে আর খাওয়াতে ভালবাসে, বুঝলে? বউমার হাতের রান্না কেমন তা যাচাই করব না বুঝি!

কি জবাব দেবে স্বজন? অপরাধীর মতো মাথা নুইয়ে নিরুত্তর বসে থাকতে দেখে দীনু জ্যাঠা বললেন, বুঝেছি ওগুলো-ও তাহলে দেখা হয়ে গেছে। তোমরা আমাদেরকে বুঝতে পার না হে। বড় নিষ্ঠুর তোমরা।

শেষের কথাগুলি বেশ জড়িয়ে আসা ভেজা ভেজা ভাঙা কণ্ঠস্বরের। স্বজন কি প্রসঙ্গে কোন কথা দিয়ে শুরু করলে পরিবেশ পরিস্থিতি সামাল দিতে পারবে তা ভেবে পায় না।

সমাপ্তি এসে বাঁচিয়ে দেয়। ট্রে-তে আনা খাবার ডিস জলের গ্লাস সাজিয়ে রেখে বলে, খেতে থাকুন। চা নিয়ে আসছি। আপনার চা-য়ে কতটা চিনি দেব?

যা খুশি দাও। যতই চিনি দাও মা খেতে তেতোই লাগবে।

জবাব শুনে সমাপ্তি তির্যক তাকায়। দীনু জ্যাঠার ভার করা মুখ দেখে সহজেই সমাপ্তি অনুমান করতে পারে, কোনও কারণে তিনি অভিমান মিশ্রিত রাগ করে আছেন।

বুদ্ধিমতী সপ্রতিভ সমাপ্তি মন জয় করা হাসি ছড়িয়ে বলে, বেশ তো দু'জনে বসে গল্প করছিলেন। হঠাৎ এমন কি হল যে চিনিও তেতো লাগবে? কোনও অন্যায় করে থাকলে শাসন তো করবেন। নইলে রাগ কমবে কেমন করে। আমরাই বা ভুল শুধরাব কেমন করে। মেয়ের ওপর রাগ করে কতক্ষণ আর থাকতে পারবেন?

রাগ তোমার ওপর নয় মা।

তবে?

স্বজন সমস্ত খুলে বলতে সমাপ্তি দীনু জ্যাঠার পক্ষ নিয়ে বলে, অন্যায়তো তোমার হয়েছেই। আগে জানলে এরকম ভুল আমি কিছুতেই করতে দিতাম না। তোমার ভুলের জন্য মা ছেলেমেয়েকে কত কষ্ট পেতে হয়েছে বলো। জ্যেঠুও কত দুঃখ পেয়েছেন। ছিঃ।

বরফ গলে জল হয়ে দীনু জ্যাঠা বললেন, যাও মা চা নিয়ে এসো। তোমার কথাতেই যথেষ্ট মিষ্টি আছে। চায়ে চিনি না দিলেও চলবে।

চা নিয়ে এসে সমাপ্তিও রেহাই পেল না। স্বজনের ডিস শূন্য। কিন্তু দীনুজ্যাঠার খাবারগুলি তেমনি পড়ে আছে।

এ কী দেখছি। আপনি খাননি কেন?

অবাক হয়ে সমাপ্তি জিগ্যেস করে।

দু'টো মিষ্টি কম দিয়েছ। সিঙ্গাড়া কচুরি দাওনি কেন?

সমাপ্তি আবারও হৃদয়জয়ী মধুর হেসে ওঠে।

আমি কেমন করে জানব যে, আপনার ভাজাভুজি খাওয়া নিষেধ। মিষ্টি কম খাওয়া দরকার। বকুলের মা যেমনটি বলেছে, দিয়েছি।

বকুলের মা আবার ডাক্তার হলো কবে থেকে?

বকুলের মা কখন যে দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে তা টের পাওয়া যায়নি। সে মেজাজ দেখায়, ডাক্তার হতে যাব কেন? দাদাবাবু বলে গেছেন তাই—

সে ব্যাটাতো এমন ডাক্তারি বুঝেছে যে প্র্যাকটিস ছেড়ে-ছুঁড়ে দিয়ে ওষুধের ব্যবসা করে। সে আমার গার্জেন নয়। তবে কেন তার কথা শুনতে হবে?

বেশ তাহলে আমিই গার্জেন হয়ে বলছি, যা দিয়েছি তাই খানতো দেখি। চা-টা যে ঠাণ্ডা সরবত হতে বসেছে।

বকুলের মার শাসন দেখে বোঝা যায়, এ বাড়িতে ওর শিকড় অনেক গভীরে প্রোথিত। দীনুজ্যাঠা শান্ত সুবোধ বালকের মতো হয়ে গেলেন। ডিস শূন্য করে চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে সতৃপ্ত মন্তব্য করলেন, বাঃ বাঃ এই না হলে চা। বউমার কাছ থেকে ভাল চা করার কায়দাটা শিখে নিও।

দীনুজ্যাঠার মেজাজটা এখন বেশ ঝরঝরে পরিষ্কার আকাশের মতো। এই স্বর্ণ মুহূর্তের সুযোগ নিয়ে সমাপ্তি বলে, আপনাকে এত ভাল লাগছে যে দু'চারদিন থেকে যেতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু উপায় তো নেই। ট্রেনের রিজার্ভেশন করা আছে যে। রান্না করে খাওয়াতে না পারার দুঃখ নিয়ে ফিরে যেতে হবে। ওর ভুলের জন্য আমাকে আরও একটা দুঃখ নিয়ে ফিরতে হচ্ছে তা জানেন?

তুমি তো আচ্ছা মেয়ে দেখছি। না বললে জানব কেমন করে?

প্রশ্নটা প্রায় লুফে নিয়ে স্বজন জবাব দেয়, আপনার বউমার খুউব ইচ্ছে ছিল কাল রাজারাপ্পা গিয়ে ছিন্নমস্তা মায়ের মন্দিরে পুজো দেবে। কিন্তু এমন একটা প্রবলেমে পড়েছি যে সেটা সম্ভব হচ্ছে না।

সমস্যাটা সমাপ্তি সবিস্তারে বর্ণনা করে। প্রাইভেট ট্যাক্সির চাওয়া ভাড়ার অঙ্কটা জানিয়ে অনুরোধ জানায়, আপনি লোকাল লোক। ডাক্তার হিসেবেও নিশ্চয়ই যথেষ্ট চেনা পরিচিতি আছে। যদি ন্যায্য ভাড়ায় একটা গাড়ির ব্যবস্থা করে দিতে পারেন তো পুজো দেয়ার বাসনাটা পূর্ণ হয়। পরিপূর্ণ শান্তি নিয়ে ঘরে ফিরতে পারি।

দীনুজ্যাঠাকে চুপচাপ বসে থাকতে দেখে স্বজন বুঝতে পারে সমাপ্তি বেশ চিন্তায় ফেলে দিয়েছে। তাই বলে, অন্যায় আব্দার করে আপনাকে বেশ অস্বস্তিকর অবস্থায় ফেলেছে মনে হচ্ছে।

আসলে ব্যাপার কি জান? দীনুজ্যাঠা সমস্যার কারণটা ব্যাখ্যা করলেন, এখন ট্যুরিস্ট সিজন। তারপর বাস ধর্মঘট বলছো। কাজেই রেট একটু বেশি নেবেই। তাই বলে এতটা ঠিক না। ফোনের রিসিভার তুলে ডায়াল ঘোরাতে ঘোরাতে কথা জুড়লেন, দেখি কতটা কি করা যায়। যত নষ্টের গোড়া তুমি। অপদার্থ হলে যা হয় আর কী। একটা চিঠি যদি অন্তত ড্রপ করে আসতে, আমার গাড়িটাই পেয়ে যেতে। কতদিন হলো গ্যারেজে পড়ে আছে। ছোটখাটো ডিফেক্টগুলো অনায়াসেই সারিয়ে ঠিকঠাক করে রাখতে পারতাম।

পরপর বেশ কয়েকবার ডায়াল করে লাইন না পেয়ে দীনুজ্যাঠা উত্তপ্ত হয়ে উঠছেন। রাগত শব্দ করে রিসিভারটা রাখেন তো পরক্ষণেই নতুন করে চেষ্টা করেন। স্বজন কিছু বলতে যাচ্ছিল হাত ইশারায় চুপ করতে বললেন। কোনও এক শর্মার লাইন পেয়েও তাকে পেলেন না। পরক্ষণেই বেনারসি আগরওয়াল নামে কাকে যেন লাইনে পেয়ে 'শেঠজি' সম্বোধন করলেন। ওদিককার কথা শোনা যাচ্ছে না। এপার থেকে বলা হল, রাতমে ড্রাইভারকা খোঁজ কাঁহা করু। নেহি নেহি মেহেমান লোগ হ্যায় না? কাল কলকাতা ওয়াপস যায়গি। রিজার্ভেশন হো চুকা।

এরকম আরও দু'চারজনের সঙ্গে ফোনালাপ শুনে বোঝা যাচ্ছিল, ওপারের ব্যক্তিরা সকলেই যথেষ্ট প্রভাবশালী হলেও এক্ষুণি ওদের পক্ষে কাল সকালের জন্য কোনও প্রতিশ্রুতি দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। হাতে একটু সময় দরকার।

স্বজন ষোলো আনা আশা ভরসা হারিয়ে বিমর্ষ মুখে ভাবছিল এতটা সময় অপচয় না করে বরং নিজে থেকে অন্যত্র চেষ্টা চালালে ভাল ছিল। তাই উঠি উঠি আচরণ করে বলে, অনেক তো চেষ্টা করে দেখলেন এবার ছেড়ে দিন। আমরা বরং এবার উঠি।

সমাপ্তি এখানে আসার পর থেকে যে আন্তরিক ব্যবহার পেয়েছে তাতে সবিশেষ তৃপ্ত। গোমড়া মুখটা এখন বেশ খুশি খুশি উজ্জ্বল। শান্ত বিনম্র হয়ে স্বজনের কথায় সায় দিয়ে বলে, যে প্রাণখোলা স্নেহ-ভালবাসা পেলাম তাতে রাজারাপ্পা যেতে না পারার জন্য আর কোনও দুঃখই হচ্ছে না। আপনি বরং এবার আমাদেরকে আসতে অনুমতি দিন।

অত ধৈর্য হারালে চলে? এতো রাজারাপ্পা বেড়াতে যাওয়ার ব্যাপার না। পুজো দেয়া মনস্থ করেছ; আমি থাকতে সে ইচ্ছা পূর্ণ হবে না তা কখনও হয়?

চেষ্টাতো করে দেখলেন—কি আর করা যাবে। এবার আগে থেকে জানিয়ে এখানে এসেই উঠব তখন আরামে পুজো দেয়া যাবে।

সে তো পঁচিশ বছর পরে, যখন তুমি বুড়ি হয়ে যাবে। এই বুড়ো তখন কোথায় থাকবে?

এবার ডায়াল করে ওপারের কণ্ঠস্বর শুনে বললেন, দেবু বলছিস? একবারটি আয়তো। জরুরি কথা আছে। রিসিভার রেখে মুখ ফেরালেন, আমার ছেলে দেবনাথকে ডাকলাম। প্রথমেই ওর গাড়িটা নিতে চাইছিলাম না। ব্যাটা একেতো বড় হিসেবি কঞ্জুস। তারপর বউ আর গাড়ি দুটো নিয়েই বড় বেশি আতুপুতু করে। তারপর ছেলের বাড়ির দোতলার ব্যালকনিতে এসে দাঁড়ানো মহিলাটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, ছেলের রিমোটকন্ট্রোল বউমাকে দেখ। তার মানে দেবু এসে গেছে।

গাড়িটা দিলেও আমি কিন্তু তেল ভরে নেব। আপনি আবার আপত্তি করবেন না যেন।

ভূমিকা শুনে স্বজন আগেভাগে প্রস্তাবটা পেশ করতে দীনুজ্যাঠার নীরবতায় বোঝা যায় তাঁর সায় আছে।

দেবনাথ দীর্ঘদেহী হলেও শীর্ণ চেহারার মানুষ। চোখে হাইলেন্সের চশমা। মাথায় সুস্পষ্ট টাক। চুলে বেশ পাক ধরেছে। টান ধরা ত্বকের জন্য বয়সের ছাপ এত বেশি প্রকট যে দীনুজ্যাঠার সমবয়সী মনে হয়।

সংক্ষিপ্ত পরিচয় পর্ব সেরে দীনুজ্যাঠা জরুরি কথাটা পাড়লেন। দেবনাথ যথেষ্ট ইতস্তত করে একবার বাড়ির ব্যালকনির দিকে তাকালেন। তারপর সঙ্কোচ করে বললেন, কাল শ্বশুরমশায়ের আসার কথা আছে—

সে তো বিকেলে। স্টেশনে গাড়ি পাঠাতে হবে তাই তো?

দেবনাথ বোবা হয়ে যায়। কপালে দুশ্চিন্তার রেখা ফুটে ওঠে। জালে জড়িয়ে পড়ার মতো অসহায় ভাবান্তর লক্ষ্য করা যায়।

আপত্তি অজুহাতের বিন্দুমাত্র সুযোগ না দিয়ে দীনুজ্যাঠা ঝটিতি তার সিদ্ধান্তের কথা জানালেন, তাহলে তো কোনও অসুবিধাই নেই। সকালে রওনা হয়ে রাজারাপ্পায় পুজো দিয়ে আসতে যেটুকু সময় লাগবে। বিকেলে ওদেরকে হোটেল থেকে স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে ট্রেনটা অ্যাটেন্ড করে এলেই হবে।

কোন হোটেলে উঠেছেন?

মুন ভিউ হোটেল।

ওরা তো গাড়ি ভাড়া খাটায় ; খোঁজ নিয়েছিলেন?

দীনুজ্যাঠা আগ বাড়িয়ে জবাব দিলেন, চেষ্টাতো কম করেনি। আমিও অনেক চেষ্টা করেছি। রাত হচ্ছে, এখন আর নতুন করে কোনও পথ দেখাতে যাস না। ওরাই তেল ভরে নেবে। তুই বরং সকাল সকাল হোটেলে গাড়িটা পাঠিয়ে দিস।

পরম নিশ্চিন্ত মনে খুশিতে প্রণাম কৃতজ্ঞতা জানিয়ে স্বজনেরা চলে গেল।

ওপারের আলোময় ব্যালকনির দিকে উদাসী বিষণ্ণ চোখ চেয়ে দেবনাথ বসে আছেন। যে কথাগুলি স্ত্রীর উত্তপ্ত কণ্ঠ থেকে শুনতে হতে পারে বলে আশঙ্কা হচ্ছে সেগুলি বিনম্র সুরে বাবাকে বললেন।

ওরা-তো শুধু রিজনেবল রেটে একটা গাড়ির ব্যবস্থা করে দিতে বলেছিলেন। তোমার গাড়িতো চায়নি। চেষ্টা করে দেখেছ, পাওনি ব্যস। তা নয়, বাড়তি উৎসাহ দেখাতে গেলে! দিনকাল কত পাল্টে গেছে। অথচ, তুমি আগের মতোই ভাণ্ডারখোলা বেহিসেবি মন নিয়ে বসে আছ। ফল হল কী? উটকো ঝামেলাটা খামোকা আমার ওপর এসে পড়ল।

ঝামেলা কেন বলছিস? ওরা তো তেলের টাকা দেবে। তাহলে হিসেবি বেহিসেবির কথা আসছে কেন?

ঝামেলা নয়তো কী? এখন গিয়ে ড্রাইভারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। অত সকালে যেতে না চাইলে বলে কয়ে লোভ দেখিয়ে রাজি করাতে হবে। আর তোমার দিক থেকে যা রিলেশান তাতে ওদের কাছ থেকে তেলের টাকা নিলে তোমার পজিশানটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? আজকাল তেল-মবিলের যা চড়া দর তাতে কতগুলি টাকার ব্যাপার তা একবার ভেবে দেখতো। তাছাড়া গাড়ি চললেই তার ক্ষয় হয়। দূরের রাস্তা। হঠাৎ বিগড়ে বসলে তার খরচের কথাটাও মাথায় রাখতে হবে।

ব্যাপারটা অত তলিয়ে দেখিনিরে। দীননাথ ওঁর আবেগপ্রবণ মনের দুর্বল দিকটা স্বীকার করে নিলেন। তারপর সম্ভাব্য অপ্রিয় পরিণামের আশঙ্কা থেকে রেহাই পেতে প্রস্তাব রাখলেন, তেলের টাকাটা না হয় তোকে আমিই দেব। গাড়ি বিগড়ে গেলে সে খরচও আমার। বউ বুড়ি শাশুড়ি ছেলেপুলে নিয়ে বিপদে পড়েছে তাই বলছি, শেষ সময়ে ওদেরকে বিপদে ফেলিস না।

ঝামেলা কথাটা বলেছি এজন্যই। তোমার কাছ থেকে আমিই কী টাকা নিতে পারব?

আর বেশি বাক্যব্যয় অনর্থক মনে করে দেবনাথ যাবার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। শেষ কথা বললেন, ওদের সামনে এমনভাবে বললে যে আমার কিছু বলার সুযোগ ছিল না। আগে থেকে ডাকলে দর্পকে দিয়ে অনায়াসেই একটা গাড়ির ব্যবস্থা করে দিতে পারতাম।

দেবনাথ চলে যাবার মুখে দীননাথ বললেন, যা হবার হয়ে গেছে। ওরা আমার কথায় বিশ্বাস করে রেডি হয়ে থাকবে। বউমাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ব্যবস্থা করিস।

সকাল থেকে টুকু টুলু বারবার নিচে নেমে যাচ্ছে। হোটেলের সামনে স্বপ্নের গাড়িটা এলো কিনা তা দেখে আসছে। শব্দ শুনবে বলে সমাপ্তির কান উৎকর্ণ হয়ে আছে। আর স্বজন দারুণ উৎকণ্ঠা উদ্বেগে ঘন ঘন ঘড়ির কাঁটা দেখে যাচ্ছে।

বেশ বেলা পর্যন্ত গাড়িটা না আসায় সমাপ্তি ক্রমশ ধৈর্য হারিয়ে ফেলছিল। একে তো উপোসী। তারপর দীর্ঘপথ যাতায়াতের ধকল আছে। ফিরে এসে কতটুকু আর সময় পাওয়া যাবে। তখন কি আর শরীর টানবে? আগেভাগে জিনিসপত্র মোটামুটি গুছিয়ে রাখতে কাল বেশ রাত হয়ে গিয়েছিল। আজ সাত সকালে ঘুম থেকে উঠে স্নান সারতে হয়েছে। টুকু টুলুকে তৈরি করতে হয়েছে। এত ঝক্কি ঝামেলার পর এভাবে প্রতীক্ষায় বসে থাকা রীতিমতো অসহ্য লাগছে।

তোমার কী এখনও বিশ্বাস, গাড়িটা আসবে? সমাপ্তি নিরাশ হয়ে স্বজনের মনে সন্দেহের বীজ পুঁতে দিয়ে বলে, তোমার দীনুজ্যাঠা সেকেলে ভালমানুষ হতে পারেন। কিন্তু ওই ছেলে দেবনাথ? দেখ-গে পরে বুঝিয়েছে কী-ইবা রিলেশান ওদের সঙ্গে যে গাড়ি দিয়ে সাহায্য করতে হবে।

স্বজন কোনও জবাব খুঁজে পায় না। সমাপ্তির কথার সূত্র ধরে রীতিমতো ভাবনায় পড়ে যায়। টেনশান বাড়ে। এতক্ষণ সযত্নে ধরে রাখা নিশ্চিত গভীর বিশ্বাসের রঙটা ফিকে ফ্যাকাসে হয়ে আসে।

তোমারই বুদ্ধির ভুল। সমাপ্তি স্বভাবসিদ্ধ ভাবে স্বজনকে অভিযুক্ত করে, ফোন নম্বরটা যদি নিয়ে আসতে তো এভাবে অযথা দাঁড়িয়ে থাকতে হত না। ওদের মতলবটা পরিষ্কার জেনে নেওয়া যেত।

যাব নাকি একবার ওখানে? স্বজন অস্থিরতা দেখায়, অটো রিক্‌শা নিয়ে যেতে আসতে কতটুকু আর সময় লাগবে।

এত দেরিতে জিগ্যেস করছ? সমাপ্তি আর একবার নিজেকে জাহির করে, সেই তো আমি না খোঁচালে তোমার বুদ্ধি নড়ে চড়ে না। এরকম পুরুষ মানুষের ওপর ভরসা করে কখনও বাইরে বেরুনো চলে? আশ্চর্য! এই শেষবার।

স্বজন বের হতে যাবে এমন সময় রুমের ফোনটা বেজে ওঠে। রিসিভার তুলে ওপার থেকে শুনতে পায়, আমি দেবনাথ মিত্রর ছেলে দর্পণ বলছি। বাবার গাড়িটায় হঠাৎ কিছু গোলমাল দেখা দিয়েছে। ভেরি স্যাড নিউজ ফর অল অব ইউ। আপনারা নিশ্চয়ই রেডি হয়ে আছেন?

তাতো বটেই।

স্বজন আর কোনও কথা বলতে পারে না। বজ্রাহতের মতো রিসিভার ধরে দাঁড়িয়ে থাকে।

এখন তাহলে কি করবেন? বাবার কথামতো রিজনেবল রেটে একটা গাড়ির ব্যবস্থা করেছি। যদি বলেন তো পাঠাব।

রেটটা কত?

তা চেয়েছিল অনেক। কিন্তু, এটা বাবা আর দাদুর প্রেস্টিজ ম্যাটার। অনেক ইনফ্লুয়েন্স করে সাড়ে পাঁচশোতে রাজি করিয়েছি।

মেঘের আড়াল থেকে উঁকি দেয়া সূর্য দেখা স্বজন ভাবনার অবকাশ পেল না যে কালকে তো ওরা ছ'শো টাকা চেয়েছিল। দরদাম করলে হয়তো আরো কমতো। তাহলে ইনফ্লুয়েন্সটা আর কোথায় হল?

বেশ পাঠিয়ে দিন। গাড়িটা কখন আসবে?

দশ মিনিটেই পৌঁছে যাচ্ছে। গাড়ি ছাড়ার আগেই ড্রাইভারের হাতে পুরো টাকাটা দিয়ে দেবেন। আর শুনুন। দুপুরে ওকে কিছু খাইয়ে টাইয়ে দেবেন। ও-কে? উইশ ইউ হ্যাপি জার্নি।

স্বজন কিন্তু খুশি হতে পারে না। তড়িঘড়ি সকলকে নিয়ে হোটেলের গেটে এসে দাঁড়ায় বটে কিন্তু, নির্বাক নিরানন্দ উদাসী হয়ে যায়। মনের ভেতর সন্দেহের একটা কাঁটা বিঁধে গেছে। সেটা নিরন্তর খুঁচিয়ে মারছে। দেবনাথের গাড়িটা তো আর চোখে দেখা হয়নি। মনে হতে পারে যে, ওঁর গাড়িটাই আসছে। গোপন কাঁটার কথাটা সমাপ্তিকে শোনালে সেই তো গালমন্দ মেজাজ শুনতে হবে, ফোন নম্বরটা সঙ্গে থাকলে দীনুজ্যাঠার কাছ থেকে আসল ব্যাপারটা যাচাই করে নিতে পারতে। এ জন্যেই বলি, তুমি একটি হাঁদারাম।

বোধহয় দশ মিনিটও সময় লাগল না। ঠিক যেন কালকে দেখা লাল মারুতি গাড়িটা এসে সামনে দাঁড়ায়। ড্রাইভার মুখ বাড়িয়ে জিগ্যেস করে, আপনি স্বজন বসু?

হ্যাঁ।

চটপট উঠে পড়ুন। মন্দিরে দারুণ ভিড় হয়। বড্ড দেরি হয়ে গেছে।

ড্রাইভারের পাশে বসে একটার পর একটা সিগারেট খায় স্বজন। বিদ্ধ কাঁটার জ্বালাটা ক্রমশই দুঃসহ হয়ে ওঠে। ড্রাইভারকে একটা সিগারেট অফার করে। তারপর সেই কাঁটাটা তুলে ফেলতে চেষ্টা করে।

আপনি বাঙালি?

হ্যাঁ। তবে জন্ম থেকে এখানেই আছি।

আপনিই গাড়ির মালিক?

ন্নাহ্।

গাড়িটা কার?

দর্পবাবুর শালার। এ গাড়ির ড্রাইভারও আমি না। সে টাউন থেকে দূরে দেহাতে থাকে। কাল সে চলে যাওয়ার পর দর্পবাবু আমাকে ধরলেন। বাস ধর্মঘটে বসে আছি। তাই চলে এলাম। কিন্তু কেন?

কাল বিকেলে মার্কেটের কাছে স্ট্যান্ডে ঠিক এরকম একটা গাড়ি দেখেছিলাম। ভাড়া নেব বলে দরও করেছিলাম। ভাবছি, সেই গাড়িটাই কি না।

মনে হচ্ছে, আপনি ঠিকই ধরতে পেরেছেন। কত চেয়েছিল?

ছ'শো টাকা।

আপনি কত বলেছিলেন?

রেট শুনে কিছু না বলেই চলে এসেছি।

ভুল করেছেন। দরদাম করলে পাঁচশোতেই রাজি হয়ে যেত। আপনার পঞ্চাশ বাঁচত, মালিকের আরও পঞ্চাশ বেশি লাভ হত।

সেটা কীরকম?

বুঝলেন না? এখনকার ছেলেরা স্বার্থ ছাড়া কারও কোনও উপকারে নামে না। দর্পবাবু আমাকে সব খুলে বলেছেন। উনি ফাঁকতালে একশো টাকা নাফা লুটবেন। শালাবাবু টেরও পাবেন না।

বাকি পথে আর কোনও আলোচনায় যায়নি স্বজন। অস্বাভাবিক গম্ভীর হয়ে শুধু একের পর এক সিগারেটের ধোঁয়া উড়িয়ে গেছে। তারপর মন্দিরে পৌঁছে স্ত্রী-পুরুষ ভেদে ভিন্নতর লাইনে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। বেজায় ভিড় ঠেলাঠেলি হৈ হট্টগোলে অতিষ্ঠ উদ্‌ভ্রান্ত দিশাহারা হয়ে যায়। কোনওমতে অনেক কষ্টে পুজো সেরে মন্দিরের চাতালে এসে দাঁড়ায়। নিচে সবশেষের সিঁড়ির কাছ থেকে টুকু টুলু চিৎকার করে ডাকে, বাবা আমরা এখানে। ওদের দু'পাশে সমাপ্তি আর ওর মা দাঁড়িয়ে। সকলের চোখমুখ কম বেশি খুশি ঝলমল আনন্দময় উজ্জ্বল। একা স্বজন বিষণ্ণ বিক্ষিপ্ত মনে সিঁড়ির দিকে ক্লান্ত পা বাড়ায়। মাত্র তিন ধাপ নেমেই হাঁপিয়ে ওঠে। সামনে আবছা অন্ধকার দেখতে পায়। টুকু টুলু পর্যন্ত পৌঁছাতে আরও কত ধাপ বাকি তা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না।

*ছবি ঃ পুতুল ঘোষাল*

# জাতপাত

কমলাকান্ত প্রতি প্রত্যুষে গঙ্গাস্নানে যান। বারো মাস। দাঁতন-কাঠি দাঁতে নিয়ে বেরিয়ে গেছেন বেশ কিছুক্ষণ আগে।

চপলাকান্ত শয্যা ছাড়লেন একটু পরে। ভোরের আলো দেখা দিতে। বউদি সরমা যথারীতি রাত্রে বারান্দায় তোলা উনানটা সাজিয়ে রেখেছেন। চপলাকান্ত উঠানে নিয়ে গেলেন। তারপর আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে প্রাতঃভ্রমণে বের হলেন।

মোড়ের মাথায় ট্যাক্সির লাইন বাড়ছে। দিনের প্রথম বাসটা বেরিয়ে গেল ঝিমোতে ঝিমোতে। গত দু'দিন অল্পবিস্তর বৃষ্টি হয়েছে। পাকা সড়কের দু'ধারে জলাজমিতে বিক্ষিপ্ত জল জমে আছে। হাল্কা ধোঁয়াশা ছড়িয়ে আছে। শীত শীত ভাব। সবজির টুকরি মাথায় গ্রামীণ মেয়েরা স্টেশনমুখী। ফার্স্ট ট্রেন ধরবে। বারো মাস ওরা সবজি বেচতে কলকাতায় যায়। বেশি লাভের আশায়।

রামকৃষ্ণ আশ্রমের মন্দিরে প্রভাতী প্রার্থনা হচ্ছে। চপলাকান্ত করজোড়ে প্রণাম করলেন। রেল ব্রিজের ওপর থেকে। মন্দির দ্বারের সোজাসুজি দাঁড়িয়ে। তারপর দ্রুত হাঁটতে থাকলেন। জোর কদমে। দু'হাত দুলিয়ে। বুক টান করে। সৈনিকদের কুচকাওয়াজের ভঙ্গিতে।

রাস্তায় ইতস্তত খুচরো পয়সা এবং খই ছড়িয়ে আছে। পাখিরা খই খাচ্ছে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। চপলাকান্তর স্মরণে এল, বীভৎস স্লোগান তুলে কারা যেন মৃতদেহ নিয়ে গেছে শেষ রাতে।

পাড়ার কবিরাজ যোগেশ্বর ভট্টাচার্য বেরিয়েছেন প্রাতঃভ্রমণে। চাপলাকান্ত 'গুড মর্নিং' জানালেন রোজকার মতো। জিগ্যেস করলেন, কাল রাত্রে কে গেলেন—জানেন কিছু?

হারু মণ্ডল। না-খেয়েই মরল লোকটা।

চপলাকান্ত হারু মণ্ডলকে চেনেন। বিশ পঁচিশ বছর আগে শহর কলকাতায় ঠাঁই না-পেয়ে শিল্পপতিরা নতুন কারখানা গড়তে কলকাতার উপকণ্ঠে হাত বাড়ায়। সে সময় বজবজ সড়কের দু'ধারে বন্ধ্যা ধানজমি বেচাকেনার দালালিতে হারু মণ্ডল প্রচুর টাকা কামায়। তামাক পাতার ব্যবসাটাও অজ্ঞাত কী কারণে কে এক ভিনদেশী

পালিয়ে যাবার আগে নিষ্ঠাবান ভৃত্য হারু মণ্ডলকে দিয়ে যায়। হারু তাই নীলমণি নস্করের ভাষায় 'হঠাৎ নবাব'।

হারু মণ্ডল কৃপণের একশেষ। স্বপ্ন শুধু ঘরবাড়ি সম্পত্তি বাড়াবার। তিনখানা বাড়ি করেছে তিন ছেলের জন্য। একটি ছেলেও মানুষ হয়নি। কোনও নেশাটেশা ছিল না হারু মণ্ডলের। ভাল খেত না। পোশাক পরত দারুণ দরিদ্রদের মতো। আটআনা চাঁদা যে-কোনও পূজা উৎসবে বাঁধা ছিল। পাড়ার ছেলেরা তাই ডাকত 'আট আনা' নামে।

একবার খুব অসুখ করেছিল হারু মণ্ডলের। ডাক্তার পরীক্ষা করে বললেন, এমনিতে কোনও রোগ দেখছি না। একটু ভাল খাওয়া-দাওয়া করুন—সব ঠিক হয়ে যাবে।

ভাল খাওয়া বলতে কী বলতে চাইছেন? হারু মন্ডল জিজ্ঞাসা করল।

ভরপেট মাছ তরকারি দিয়ে ভাত। একটু দুধ। ভাল টিফিন—ফল-টল।

কুচো আখ খেত হারু মণ্ডল ফলটলের পরিবর্তে। অর্থ সাশ্রয়ের জন্য। রাস্তায় ছড়ানো খুচরো পয়সাগুলো দেখে চপলাকান্ত ভাবলেন, ভাগ্যিস হারু জানতে পারছে না। বেচারা।

ছেলেরা সবে ঘামতে শুরু করেছে। এমন সময় মোটর বাইকের ভটভটি আওয়াজ শোনা গেল। ফুটবলপ্রেমী কয়েকজন তরুণ দৌড়-ঝাঁপ করে বলের ওপর পায়ের দখলের কায়দা-কানুন শিখছিল। মোটরবাইকের আওয়াজ শুনে অনুশীলন থামাল।

ট্রেনার শম্ভু মিত্তির বুঝলেন, আজকের মতো ট্রেনিং খতম।

বড় সড়কের দিক থেকে সুকু বাইক চালিয়ে এল। পিছনে পেল্লায় বড় ভাল জাতের অ্যালশেসিয়ান কুকুর। পাল্লা দিয়ে দৌড়চ্ছে। সুকু কারকিত্ করে ডাইনে বাঁয়ে বাইকে দোলাচ্ছে। কুকুরটা সমতালে লড়ে যাচ্ছে।

দু'পায়ে ভর করে বাইক থামাল সুকু। সামনে রাস্তার ওপর ক্যাম্বিসের একটা বল ছুঁড়ে দিল। বাঘের মতো ড্রাইভ দিয়ে কুকুরটা দৌড়ে গেল। দাঁতে চেপে ধরল বলটা। ফিরে এসে প্রভুর হাতে জমা দিল। বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলে লেজ নাড়ায় কুকুরটা। ঝুলন্ত লম্বা জিভ থেকে লালা গড়াতে থাকে।

সুকু কুকুরটার মাথায় হাত বুলিয়ে পিঠ চাপড়াল। যেন বোঝাতে চাইল, জিন্দা রহো মেরা ইয়ার।

রীতিমতো খেলা। এমনি ওস্তাদি খেলা দেখাতে দেখাতে দো-দোস্ত মেয়েদের স্কুল পর্যন্ত যায় আবার ফিরে আসে। মর্নিং স্কুলের মেয়েরা সার্কাস দেখার মজা কুড়োয়। মনে মনে তারিফ করে।

সুকু এসব বুঝতে পারে। তাই আহ্লাদে আটখানা। নিজেকে হিরো হিরো ভাবে। গেঞ্জিবিহীন শার্টের বোতাম খোলা জঙ্গলা বুকে দোলা লাগে।

মোড়র মাথায় যৌবনবতী বকুল গাছটায় অজস্র ফুল ফুটেছে। নরম বাতাসে মিষ্টি গন্ধ ভাসছে। চপলাকান্তর ভাল লাগল। হঠাৎই মনে পড়ল, ছেলেবেলায় পরিতোষকাকুর মেয়ে চন্দনা ওদের বাগান থেকে বকুল কদম স্বর্ণচাপা ফুল দিত। বলত, কেষ্ট দেবু নাড়ু—অরা ছোটলোকের ছাওয়াল। অগো লগে মিশবি না। তাইলে জন্মের মতো আড়ি। ফুল দিমু না আর।

কী হইব অ্যাত ফুল দিইঅ্যা?

ঘরে রাইখ্যা দিবি। সুবাস পাইবি।

চন্দনার দেওয়া ফুলগুলি সযত্নে শিয়রের কাছে তাকে রেখে দিত কিশোর চপলাকান্ত। চোখ বুজে ফুলের মিষ্টি গন্ধে চন্দনাকে দেখতে পেত।

চন্দনা এখন কোথায়? জানতে ইচ্ছে হলো চপলাকান্তর।

খুব ছোটবেলায় চপলাকান্ত ভাবতেন, একটু বড় হলেই বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যাব। টাকা কড়ি সোনা গয়না নিয়ে নয়। খালি হাতেই। সারা দেশময় ঘুরে বেড়াব। জাত-পাত মানব না। ধর্মের ভেদাভেদও নয়। যেকোনও জাতধর্মের মানুষের দেওয়া খাবার খাব। তাদের দেওয়া আশ্রয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ব।

ছোটবেলায় এসব কল্পনা-টল্পনা অনেকেরই থাকে। নানা কারণে তা বাস্তবায়িত হয় না। পরবর্তীকালে কল্পনাটাকে আজগুবি মনে হয়। অথচ, এই পরিণত বয়সেও চপলাকান্তর কাছে ছোটবেলাকার ভাবনাটা অবাস্তব আজগুবি মনে হয় না।

যে কারণে কিছু কিছু সংসারে এক-একজন অকৃতদার থাকে, আটান্ন বছর পেরিয়ে চপলাকান্তও অকৃতদার সে-কারণে।

এক বন্ধু কাব্য করে বলেছিল, কিছু কিছু লোক থাকে অকৃতদার—তাদেরও থাকে সন্তান সংসার পরিবার। তুমি তাদেরই দলে।

সংসারের প্রয়োজনে অকৃতদারদের দারুণ দাপট। ডিকটেটরের মতো। চপলাকান্তর বেলায়ও তার ব্যতিক্রম নয়। প্রাতঃভ্রমণ থেকে চপলাকান্ত ফিরে আসার সময় কেউ বিছানায় থাকে না। রান্নাঘরে এখন দারুণ ব্যস্ততা। চারদিকে চাপা গুঞ্জন। চামচ কেটলি বালতির শব্দে একটা ভয় ভয় ভাব।

নিজেকে অধীশ্বর ভাবতে ভাল লাগল চপলাকান্তর। হাতমুখ ধুয়ে গুনগুন মন্ত্র উচ্চারণে তক্তপোশের ওপর আসন করে বসলেন।

সামনে জানলায় চোখ রাখলে এক চিলতে উঠান দেখা যায়। কুয়োতলার পাশে ছোট্ট বাগান। লাউ পুঁই কুমড়োর মাচা। মানকচু কলা পেঁপে গাছের ঝোপঝাড়।

বাঁশের বেড়া-ঘেরা স্নানঘর। স্নানঘর থেকে কমলাকান্ত বের হলেন হাতমুখ ধুয়ে। চপলাকান্তর দিকে তাকিয়ে চোখ ফেরালেন। ভয়ে।

আসনে বসে ঈশ্বর অধ্যাত্মচিন্তার পরিবর্তে সংসারের কথা ভাবছিলেন চপলাকান্ত। ঠাকুর্দা প্রয়াত ব্রজনারায়ণ ভট্টাচার্য 'ঠাকুর বাড়ির' কুলপুরোহিত ছিলেন। 'ভট্টাচার্যি বামুন' নামেই তাঁর খ্যাতি এবং ব্যাপক পরিচিতি ছিল। সংস্কৃতে অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল ব্রজনারায়ণের। সুকণ্ঠে পাঁচালি গীতা রামায়ণ ভাবগত পাঠ এবং পালাগান করতেন। জ্যোতিষ বিদ্যায়ও যথেষ্ট পারদর্শী ছিলেন। ঠাকুর্দা এবং প্রয়াত পিতার সূত্র ধরে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কমলাকান্ত বর্তমানে 'ঠাকুর বাড়ি'র পুরোহিত।

কমলাকান্তের পুরোহিত বৃত্তিই 'ভট্টাচার্যি বামুন' বংশে শেষ পুরোহিতগিরি। বৃত্তিটিতে আজকাল আর সংসার চলে না। বিশ্বকর্মা দুর্গা লক্ষ্মী এবং কালীপুজো প্রায় একই সময়। আজকাল সর্বজনীন পুজোই বেশি। জগদ্ধাত্রী অন্নপূর্ণা কার্তিক পুজো নেই বললেই চলে। শ্রাদ্ধ বিয়ে অন্নপ্রাশন কবে আসবে—হা পিত্যেশে পেট চলে না। দক্ষিণা নৈবেদ্য নিমিত্তমাত্র। ক্রিয়াচার অনেক কাটছাঁট হয়েছে। যেটুকু না করলে নয়। দানসামগ্রীর পরিবর্তে মূল্য ধরে দেয় অনেকে। ঘটের ওপর কাপড়ের বদলে গামছা দিয়েই ক্ষান্ত। আড়ম্বরটাই বেশি। পুজো নমঃ নমঃ। 'ভট্টাচার্যি বামুন' বাড়ির ছেলেদের এখন ব্রাহ্মণ বলতে পৈতেতেই পরিচয়—তার বেশি কিছু নয়।

ব্রজনারায়ণের পুরোহিত বৃত্তিতে পাওয়া অস্থায়ী এই প্রাচীন বাড়ি। বাড়ি বলতে টালির ছাউনি দেওয়া তিন কামরা ঘর। লম্বা একফালি বারান্দা। কমলাকান্তের পুরোহিত বৃত্তির ইতির সঙ্গে সঙ্গে এ বাড়ির অধিকারও শেষ।

বাড়ির পিছন দিক থেকে নর্দমার দুর্গন্ধ ভেসে আসছে। ঘরময় দিনভোর মশা মাছি ইঁদুর আরশোলার উৎপাত। স্যাঁতসেতে মেঝে। চুনবালি ঝরা দেওয়াল। পাঁজর বের-করা দেওয়ালে একখানা আয়না।

আয়নায় মুখ দেখা যাচ্ছে চপলাকান্তর। সত্তর ঊর্ধ্ব বৃদ্ধের মতো লাগছে নিজেকে। সেই চল্লিশ বছর বয়স থেকেই নিজেকে দেখতে এরকম লাগে।

বাবার ভরসায় বিয়ে করেছিলেন কমলাকান্ত। ছোট ভাই চপলাকান্তের ভরসায় তিনটি সন্তান। বড় ছেলে সমীরণ বেকার থাকা অবস্থায় প্রেম করে রেজিস্ট্রি বিয়ে করেছে। নামী জুতো কারখানার বড় অফিসার পিটার বিশ্বাসের মেয়েকে। পিটার বিশ্বাস সহজভাবে নেননি। থানা পুলিশ অর্থবল দেখিয়ে ক্ষান্ত দিয়েছেন। বেইজ্জতি হুজ্জতিতে অতিষ্ঠ হয়ে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন চপলাকান্ত। 'ঠাকুর বাড়ি'র রঞ্জন ওর বন্ধু। আশ্রয় দিয়েছিল। সেইসঙ্গে ওদের ইটখোলায় চাকরিও। নাতি হলে ফিরিয়ে না-এনে পারেননি চপলাকান্ত।

মাঝে মাঝে চপলাকান্তর মনে হয়, সাকুল্যে আটটি পেটের ভাবনাতেই শরীরটা বোধ হয় ক্রমশ আরও বেশি শীর্ণ হয়ে যাচ্ছে।

যথা সময়ে সকালের চা জলখাবার এল। কমলাকান্ত এক ফাঁকে জানিয়ে গেলেন, ছোটঠাকুর আসবেন। তোর কাছে বিশেষ প্রয়োজন। হয় তো এলেন বলে।

শুনে বিস্মিত হলেন চপলাকান্ত।

এক সময় 'ঠাকুর বাড়ি ' বললে দশ বিশ গ্রামের দূরত্বের লোকও চিনত। দশ বিঘা জমির ওপর বাড়ি। বাড়ি নয়—বিরাট প্রাসাদ। নাটমন্দির। সিংহদুয়ার। জগন্নাথের বিরাট রথ। প্রাইভেট কারের গ্যারেজ। অনেক ভৃত্য দাসদাসী তহশিলদার এবং তাদের থাকার আস্তানা। গাই-গরু পুকুর দিঘি। প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দির। বারো মাসে তেরো পার্বণ। যাত্রা কবিগান দরিদ্রনারায়ণ সেবা হতো। পুজো ছাড়াও হরেক ক্রিয়াচার তো ছিলই। ঠাকুরদের বিত্তের উৎসস্থল ব্যবসা। চালকল তেলকল এবং ইটখোলা। প্রচুর ধানজমি এবং ভাগচাষী ছিল।

ঠাকুরদের অহং অন্যত্র। পাঁচ পুরুষ পূর্বে নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের কন্যার সঙ্গে বিবাহসম্পর্ক ঘটায় তাঁদের বংশ জাতি ধর্ম ও সমাজচ্যুত হয়। ছোটঠাকুরের পূর্বপুরুষেরা আজীবন অশিক্ষিত গরিব হরিজনদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে কাটিয়ে গেছেন। তাঁদের মন্তর ছিল, বংশ পরম্পরায় নানা জাতি ধর্মের পুত্রকন্যার সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করো। নরনারায়ণে ভক্তি ও বিশ্বাস রাখবে। সর্বহারাদের বাঁচাবার জন্য এর চেয়ে বড় মন্ত্র আর কিছু হতে পারে না। জপতপে সীমাবদ্ধ না থেকে কর্মে বিশ্বাসী হতে হবে। পতিত মানুষজনের মতো পতিত জমিকেও উদ্ধারের চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। তবেই মুক্তি।

পুরুষানুক্রমে দেশকাল অনেক পাল্টে গেছে। সমাজব্যবস্থাও। একালের উত্তরপুরুষেরা পূর্বপুরুষদের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে আধুনিক ব্যবসায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে কলকাতায় বনেদী পাড়ায় চলে গেছে। দীননাথ ঠাকুরের তিন পুত্রের মধ্যে একমাত্র কনিষ্ঠপুত্র প্রেমানন্দ পিতৃপুরুষের সম্পত্তি আগলে আছেন এখনও। ক্ষয়িষ্ণু সম্পত্তি এবং ব্যবসা দেখাশোনা করেন।

চপলাকান্ত আশ্চর্য হয়ে ভাবলেন, যদিচ ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কটা ঠাকুর্দার আমল থেকে। অনেকটা আত্মীয়ের মতো। তবু, ছোটঠাকুর প্রেমানন্দ স্বয়ং আসছেন—এই গরিবের ঘরে! একটু আশঙ্কিত হলেন।

প্রেমানন্দ এলেন একটু পরে। হালে কেনা নতুন গাড়িতে চড়ে। কমলাকান্ত প্রস্তুত ছিলেন। বিনয়ের সঙ্গে বন তুলসীর বেড়ার মাঝে গেট দিয়ে পথ দেখালেন। বাড়ির সমস্ত লোকজনের মধ্যে দারুণ তৎপরতা এবং কৌতূহল।

প্রেমানন্দ ঘরে ঢুকতে চপলাকান্ত সসম্মানে উঠে দাঁড়ালেন। বর্ণহীন নড়বড়ে চেয়ারটা এগিয়ে দিয়ে বসতে বললেন। বসার আগে চপলাকান্তর পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে গিয়ে বাধা পেলেন প্রেমানন্দ।

আপনি বয়ঃজ্যেষ্ঠ—এ কী করছেন?

তবু, প্রেমানন্দ প্রণাম করলেন। চেয়ারে বসে বললেন, আপনি ব্রাহ্মণ। সকালে ব্রাহ্মণের আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত করতে চাইলে মানব কেন?

চপলাকান্ত জানেন— বিন্দুমাত্র ভণিতা নয়। ঠাকুর পরিবারের সকলেই জাতপাত বিচারে একটু হীনম্মন্যতায় ভোগেন। বয়ঃজ্যেষ্ঠরা কদাপি ভট্টাচার্যি বামুন বাড়ির কারও প্রণাম নেন না। ব্রাহ্মন সন্তান বলে। ভাবতে ভাল লাগল, রহিমচাচা কত অনায়াসে এখনও তাঁর প্রণাম নেন। পিটার বিশ্বাসকে দাদার ছেলেমেয়েরা প্রণাম করলে তিনি খুশিই হন। দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করেন।

প্রেমানন্দর জন্য চা জলখাবার এল। খেতে খেতে প্রেমানন্দ বললেন, অনেক আশা নিয়ে আপনার কাছে এসেছি। একটা অনুরোধ আছে। ভিক্ষে চাওয়াও বলতে পারেন। আশা করি বিমুখ করবেন না।

চপলাকান্ত চারদিকে দৃষ্টি বুলিয়ে দেখলেন—ঘরে দরজা জানলায় তৃতীয় কোনও ব্যক্তির উপস্থিতি নেই। একটু আশ্চর্যবোধ করলেন। বললেন, ঠাকুরর্দার আমল থেকে আপনাদের দ্বারা উপকৃত। অকৃতজ্ঞ হব না নিশ্চয়ই। কিন্তু, কী এমন ব্যাপার যে বলতে এত কিন্তু কিন্তু করছেন?

আমার ছোটছেলে রঞ্জনকে চেনেন নিশ্চয়ই?

সমীরণের সঙ্গে খুব মেলামেশা ছিল। আগে আসত। বহুকাল দেখি না।

পার্টিতে নাম লিখিয়েছিল। খুন খারাপি পার্টিতে। তাই সরিয়ে দিয়েছিলাম চা বাগানে এক আত্মীয়ের কাছে।

এখন?

ভুল বুঝতে পেরেছে। এখানেই আছে।

প্রেমানন্দ ব্যস্ত মানুষ। বেশি গৌরচন্দ্রিকায় না গিয়ে সোজাসুজি বলে ফেললেন, আপনার ভাইঝি রত্নাকে আমার পুত্রবধূ করতে চাই।

চপলাকান্তর চোখমুখে বিন্দুমাত্র ভাবান্তর হল না। প্রস্তাবটা ভাবতে অবাক লাগল। মনের ভিতর কতকগুলো দ্বিধা ঘুরপাক খেল। দু'টি পরিবারের মধ্যে বিস্তর ফারাক। ঠাকুর পরিবারের অর্থের অভাব নেই ঠিকই। কিন্তু, রঞ্জন ছেলেটি কেমন? নিজের পায়ে প্রতিষ্ঠিত কী?

এসব প্রশ্ন সরাসরি অন্তত ছোটঠাকুরকে করা যায় না। গোপনে খোঁজখবর

নেওয়া যেতে পারে। বললেন, রত্না তো দাদার মেয়ে। প্রস্তাবটা আমাকে কেন?

জানি। আমি সব জানি। জন্মসূত্রে কমল ঠাকুর ওঁর সন্তানদের বাবা বটে। দায় দায়িত্ব কর্তব্যে আপনি বাবার চেয়েও বেশি।

চপলাকান্ত অনুমান করলেন, এসব তাহলে দাদার নির্দেশেই। তাহলে কী রত্নার সঙ্গে রঞ্জনের প্রেম-ভালবাসার সম্পর্ক জন্মেছে! বললেন, বুঝেছি। কিন্তু আমাকে ডাকলেই তো পারতেন।

তা কখনও হয়! চাওয়াটা যে আমার। তা আবার ব্রাহ্মণ কন্যাকে চাওয়া। কত বড় ধৃষ্টতা। জাতে ছোট হলেও এটুকু ভদ্রতা তো আপনাদের সঙ্গে থেকে শিখেছি।

চপলাকান্ত বুঝতে পারেন, কথাগুলি বিন্দুমাত্র কৃত্রিম নয়। সবটাই মনের নির্যাস। ভাবতে ভাল লাগল, ভট্টাচার্যি ব্রাহ্মণ বংশে জন্মেছেন তবেই না দীনদরিদ্রের এই সম্মানটুকু পাওনা। পরক্ষণেই ভাবলেন, পেটের ক্ষুধা বড় নির্মম। সম্মানে পেট ভরে না। বললেন, আমাকে একটু ভাববার সময় দিতে হবে।

শুভ কাজে দেরি করতে নেই। কাজটা তাড়াতাড়িই সেরে ফেলতে চাই।

বুঝলাম। কিছুদিন আগে চাকরি থেকে রিটায়ার করেছি। সরকারি চাকরি। পেনসন গ্র্যাচুইটি প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকা বিশ বাঁও জলে। সমীরণ তো আপনাদের দয়ার ওপর দাঁড়িয়ে আছে। ছোট ছেলেটা বি সি এস দিয়েছে—এখনও বেকার। পুরোহিত বৃত্তিতে তো আর পেট ভরে না। সময় দিতে হবে বইকি।

প্রেমানন্দ গভীরে যেতে চাইলেন না। অতি উৎসাহে বললেন, খরচের কথা ভাববেন না। উঁচু জাতের মেয়ে নিচ্ছি—কী সৌভাগ্য। আমরা বরং কনে পণ দেব।

চপলাকান্ত বিরক্তবোধ করলেন। অনেকের কাছে দারিদ্র্য কোনও লজ্জা নয়। বরং, অহংকার। চপলাকান্ত সেই দলে। বললেন, আমাদেরকে ছোট করবেন না। দু'টি বাপের একটি মেয়ে। অনেক কিছু ভাববার আছে।

বেশ তো ভাবুন। তবে সঙ্গে আমাকেও নেবেন। রত্নাকে আমরা তো পুত্রবধূ হিসেবে মেনেই নিয়েছি। ক্রিয়াচারটাই যা বাকি। রত্না এখন তিন বাপের মেয়ে।

চপলাকান্ত পরাস্ত হলেন। বুঝলেন, তাঁর অনুমানটা তাহলে মিথ্যে নয়। মনে মনে ক্ষুব্ধ হলেন। কথা না-বাড়িয়ে নিরাসক্ত ছোট্ট জবাব দিলেন, ঠিক আছে।

খুশিমনে প্রেমানন্দ চলে যেতে বউদি সরমা কাছে এসে দাঁড়ালেন। হাতে বাজারের থলে। এগিয়ে দিয়ে বললেন, পান লঙ্কা লেবু আনতে হবে। একটা বেগুন আর তিনটে আলু আছে।

বউদির মুখের দিকে তাকিয়ে চপলাকান্ত বুঝতে পারলেন, প্ল্যান-মাফিক কাজ সফল হওয়ায় তিনিও খুশি। প্রচণ্ড রাগ হল। আজকাল দাদার ওপর ভীষণ রাগ

হয়। সমীরণের ওপরও। ওর বউটা তো যাচ্ছেতাই মুখরা। সব সময় বাপের বাড়ির বড় বড় গল্প। সাহেবিয়ানা। একরত্তি ছেলে ছোট্টুর নরম মনে হাজার রকম স্বার্থবুদ্ধির বীজ পুঁতে যাচ্ছে। এ বাড়িতে সবাই কেমন যেন স্বার্থপর। অকৃতদারটির কাছে ওদের প্রত্যাশার অন্ত নেই। যা কিছু যত্ন ভালবাসা, তার পিছনে প্রচ্ছন্ন একটা উদ্দেশ্য আশা থেকেই যায়। সে যেন একটি দুধেল গাই। রত্না একমাত্র ব্যতিক্রম। নিঃস্বার্থ মেয়ে। তাঁর নিঃসঙ্গ বিষণ্ণতার একমাত্র সঙ্গী। মেয়ের মতো। সেই রত্না চলে যাবে। তখন তাঁর কী হবে ভাবতে গিয়ে জ্বরো রোগীর মতো অবসাদবোধ করলেন। দু'দিন কারও সঙ্গে কথা বললেন না।

ইংরেজি বাংলা উর্দুতে পণ্ডিত আবদুর রহিম 'ভট্টাচার্যি বামুন' বাড়ির একজন। পরম শুভাকাঙ্ক্ষী। ব্রজনারায়ণের সন্তানসন্ততি সকলেরই রহিমচাচা। চপলাকান্ত ভাবলেন, রহিমচাচার খোঁজ নেওয়া দরকার একবার। রত্নার বিয়ের ব্যাপারে ওঁর সহযোগিতা পরামর্শের গুরুত্ব অনেক।

এককালে প্রায়ই আসতেন রহিমচাচা। সন্ধ্যার পর। দাওয়ায় বসে হাজারও গল্প করতেন অনেক রাত পর্যন্ত। পিতা তারকনারায়ণ মারা যেতে বেশ কিছুকাল রোজই আসতেন। অভিভাবকের মতো। সকলের খোঁজখবর নিতেন। সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতেন।

প্রচুর বিষয় আশয় রহিমের। দু'পার বাংলাতেই। দেশ ভাগের পর থেকে এপারের নাগরিক। একবার এম এল এ হয়েছিলেন। ছ'মাস অন্তে হজে গিয়ে হাজী হাওয়ার পর সব কিছু ছেড়ে দিয়েছেন। সেই থেকে দেশে দেশে মন্দির মসজিদ গির্জায় ঘুরে বেড়ান। সামান্য ক'দিনের জন্য সংসারে ফেরেন। আবার চলে যান। পাখিদের আকাশে ওড়ার মতো। অনেকের কাছে রহিম ভাই 'সুখ পাখি'।

সেদিন সারা দুপুর ঘুমিয়ে কাটালেন চপলাকান্ত। বিকেলে রহিমচাচার উদ্দেশে রওনা হলেন। পথে নীলমণি নস্করের গদি। বিরাট পাকা বাড়ি। নিচের তলায় এম আর শপ, ট্রান্সপোর্ট এবং ইমারতী দ্রব্যের ব্যবসা। নিন্দুকেরা চোরাই পেট্রোল ওয়াগন ভাঙা চিনি আরও কীসব দু'নম্বরী কারবারের কথাও বলে থাকে। অনেকে ডাকে, 'ধনপতি নস্কর' নামে। অথচ, লোকটিকে দেখলে আদপেই ধনী বলে মালুম হয় না।

নীলমণি গদিতেই বসে ছিল। বোতাম ছেঁড়া ফতুয়ার ফাঁকে ভারী ভুঁড়ি উঁকি দিচ্ছে। চপলাকান্তকে দেখতে পেয়ে ডাকল। গদিতে এগিয়ে যেতে প্রণাম ঠুকে বলল, অধমের গদিতে বামুনের পায়ের ধুলো না দিয়েই চলে যাচ্ছিলেন স্যার। কোথায় আছেন এখন?

চাকরি উপলক্ষ্যে এই অঞ্চলটাতে চপলাকান্ত কিছুকাল পোস্টিং ছিলেন। এখন কোথায় পোস্টিং জানতে চাইল নীলমণি।

চপলাকান্ত বললেন, চাকরি তো শেষ হয়ে গেছে।

কাঠের বাক্সবন্দী ফোনের তালা খুলতে খুলতে নীলমণি বলল, ভাল খবর। যদি অনুমতি করেন তো একটু মিষ্টি খাইয়ে ব্রাহ্মণ সেবা করি।

এই তো বিকেলের চা জলখাবার খেয়ে বেরিয়েছি। আজ থাক।

ফোনের ডায়াল ঘোরাতে ঘোরাতে নীলমণি জিগ্যেস করল, যাচ্ছিলেন কোথায়?

আক্রাফটক। রহিমচাচার কাছে।

সুখপাখি? নীলমণিও রহিমকে ও নামেই ডাকে। বলল, দু'দিন আগে দেখেছি। পাবেন।

পকেট থেকে বিড়ি বের করলেন চপলাকান্ত। আগুন ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়লেন। ভটভটির আওয়াজ তুলে সুকু এল। সঙ্গে কুকুরটাও। লক লক জিভ দিয়ে চপলাকান্তর পা চাটতে গেল। চপলাকান্ত বিব্রত বোধ করলেন। ঘেন্না হল।

নীলমণি অভয় দিয়ে বলল, ভয় নেই। আপনাকে আদর করতে চাইছে স্যার। ভাল খাবার খায়। রোজ চান করে। হপ্তায় একদিন ডাক্তার পরীক্ষা করে ওষুধ দিয়ে যায়।

তা হোক। বিরক্তি দেখালেন চপলাকান্ত, আমার এসব আদর ভাল লাগে না। নীলমণি বুঝতে পেরে কুকুরটাকে কাছে ডেকে নিল। কোলে নিয়ে আদর করল। শব্দ করে চুমু খেল।

সুকু বলল, বিশটা টাকা চাই বাবু।

সামনে কাঠের বাক্সে ওয়েস্ট পেপারের মতো অযত্ন আগোছালো একরাশ টাকা থেকে একখানা বিশ টাকার নোট এগিয়ে দিয়ে নীলমণি বলল, আজেবাজে খাসনি বাপ। আর দেখ, একটু আস্তে বাইক চালাস।

চপলাকান্ত জিগ্যেস করলেন, এই আপনার বড় ছেলে বুঝি?

প্রথম পক্ষের। নীলমণি গর্বের সঙ্গে জবাব দিল, দ্বিতীয় পক্ষের আরও তিনটি ছেলেমেয়ে। স্কুলে পড়ছে।

আমি একেই চিনি। কলকাতায় প্রায়ই দেখতাম। ওর বাইক চালানো দেখে রীতিমতো ভয় হয়—এই বুঝি অ্যাক্সিডেন্ট করল।

তিনবার করেছে। নীলমণি গর্বিত পিতার মতো হাসল।

করে কি—ব্যবসা দেখে?

কী যে বলেন স্যার। কতটুকু বয়েস ওর যে ব্যবসা দেখবে—আমি বেঁচে থাকতে।

চপলাকান্ত যেন প্রশ্নটা করে অন্যায় করে ফেলেছেন। শুধরে নিয়ে সায় দিলেন, তা অবশ্য ঠিক। দরকারই বা কী—আপনার তো অভাব নেই কোনও। জীবনে যথেষ্ট করেছেন।

এবার একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল নীলমণি। বুকের অনেক গভীর থেকে। একটু বিষাদের সুরে বলল, হ্যাঁ আমি করে গেলাম—ব্যাটারা বেচে খাবে।

সে কি!

সেটাই তো নিয়ম স্যার। নীলমণি বেশ গুছিয়ে বলল, তা নাহলে গোটা অঞ্চলটাই তো এককালে আমাদের বংশের জমিদারীতে এসে যাবে। তা কখনও হয় দেখেছেন?

চপলাকান্ত কোনও জবাব খুঁজে পেলেন না। ভাবলেন, মূখ্যু লোকটা একটা দামি কথা বলেছে বটে। চপলাকান্ত বললেন, আমার একটা উপকার করতে পারবেন?

বলেন। সম্ভব হলে নিশ্চয় করব।

আমার একটি বেকার ছেলে আছে। আপনার গদিতে কিছুদিনের জন্য কোনও কাজ দিতে পারবেন একটা?

পারবনি স্যার। বিনাসঙ্কোচে ঝটিতি সাফ জবাব দিল নীলমণি। কারণটা ব্যাখ্যা করে বোঝাল, ভদ্দরলোকের শিক্ষিত ছেলে। উপযুক্ত মাইনে দিতে পারবনি। আজেবাজে কাজই কী করানো চলে। আপনি বরং চলে আসুন। ব্যবসা দেখবেন। সরকারি বাবুদের সামলে নেবেন। পুষিয়ে দেব।

চপলাকান্ত কথা বাড়ালেন না। পথে পা বাড়ালেন।

ঝিলের ধার ঘেঁষে বহুকালের পুরনো অযত্ন পথ। দু'ধারে সারিবদ্ধ দেবদারু গাছ। ঘরে-ফেরা পাখিদের কিচিরমিচির ডাক। সূর্যের রক্তঢালা ঝিলের জল। জলে জমা জমি পুকুর। সবুজ গাছ-গাছালি। চপলাকান্তর হাঁটতে ভাল লাগছিল। বটগাছের নিচে বাঁশের বাখারিতে তৈরি মাচায় বাসের ড্রাইভার কন্ডাক্টররা বিশ্রাম নিচ্ছে। দূরে গ্রাম্য হোটেল। বৃদ্ধ পাঞ্জাবী মালিক মাচায় বসে মাঝে মাঝে জোরে হাঁক দিচ্ছে—এ ভজুয়া, দো চাপাটি ঔর তড়কা। জলদি লে আনা।

ডান দিকে ঘুরে বাজার। বাজার ছাড়িয়ে সত্যপীরের সমাধি। তারপরেই রহিমচাচার আশ্রম। আশ্রম পর্যন্ত যেতে হলো না। বাজারেই দেখা হয়ে গেল। নব্বুই ছুঁই-ছুঁই বয়েস হয়েছে কে বলবে। সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছিলেন। ডাক শুনে দাঁড়ালেন। সাইকেল থেকে না-নেমে। মাটিতে পা ছুঁয়ে দেহের ভারসাম্য রেখে। কুশল সংবাদ জানতে চাইলেন চপলাকান্তর কাছে।

চপলাকান্ত অনুযোগ করলেন, কতকাল যান না আমাদের খোঁজখবর নিতে। তাই তো এলাম।

বেশ করেচো। দু'দিনের তরে এইচি। সময় দিতি পারিনে। আজমীর থেকে সবে এইচি। এ যাত্রায় বেশিদিন থাকব। তারপর অমরনাথ যাব।

এ বয়সে অমরনাথ! সাহস তো বড়।

হ্যাঁ বাপ। সাহস আর বিশ্বেস থাকলি সব পারা যায়।

আমার তো দু'টোই আছে। নেবেন সঙ্গী করে?

মুই নেবার কে—এলাহি ভরসা। আল্লার দোয়া থাকলে যাবে।

চপলাকান্ত তাঁর সমস্যাগুলি একে একে বলে গেলেন। গুরুজন হিসেবে সার্বিক পরামর্শ চাইলেন। সবশেষে বললেন, জানেন তো নুন আনতে পান্তা ফুরোয়।

রহিমচাচা ভরসা দিলেন, শুভ কাজে টাকার অভাব হয় না বাপ। এলাহি ভরসা। রত্না তো আমারি নাতিন। মেটিয়াবুরুজের বাড়িটা বিক্‌কির করছি। য্যাত দরকার নিবে। সময় মতো শুধবে। ভাবনা কিসে।

এত সহজে এতবড় একটা সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে স্বপ্নেও ভাবেননি চপলাকান্ত। ভীষণ হালকা লাগল নিজেকে। পরম খুশিতে ফিরতি পথে কাচ্চি সড়কের বিখ্যাত পান খেলেন দু'টো। সঙ্গে কস্তুরী বিড়ি।

চপলাকান্ত এককালে পোস্টিং ছিলেন এখানে। অনেক পরিচিত জন। আসা হয় না কোনওকালে। কিছুটা ঘুরলেন এদিক ওদিকে। ফিরলেন ট্রেনে। স্টেশনে নেমে লাইনে দাঁড়ানো রিক্‌শায় হর্ন বাজালেন। রিক্‌শাঅলারা কাছেই গাছের নিচে গোল পাকিয়ে বসে। গাঁজায় দম দিচ্ছে। চুল্লু খাচ্ছে অনেকে। নেশার আড্ডা থেকে বলল একজন, কেউ যাবে না এখন।

কেন?

ইচ্ছে।

তবে লাইনে দাঁড়ানো কেন?

কোন উত্তর এল না এবার। আড্ডা থেকে বিরক্ত একজন উঠে এসে লাইনের সব রিক্‌শাগুলি উল্টোমুখো করে আবার ফিরে গেল। বাচ্চা কোলে স্ত্রীকে নিয়ে অপেক্ষারত যাত্রীটি বলল, আজকাল এরকমই হচ্ছে। বিশ্রী ব্যবহার। ওদের নাকি জমানা এসেছে। এদেরও ইউনিয়ন আছে যে। ডবল ভাড়া দিলে এক্ষুণি যাবে। বৃষ্টি হলে তো কথাই নেই। বলবে, আমরা কী মানুষ না? অসুখ করলে দেখবে কে।

বর্ষা ঋতুতে জ্যোৎস্না রাত। জ্যোৎস্নায় শুয়ে থাকা জলাজমি জল। ফুটন্ত শাপলা কচুরি ফুল। চারদিকে সবুজ যৌবন। ঝিঁ ঝিঁ ব্যাঙের ডাক। চপলাকান্তর

হাঁটতে খারাপ লাগছিল না। বরং, সব কিছুই যেন নতুন করে ভাল লাগছে। খুশিতে গুন গুন করে গান গাইলেন দু'কলি। লজ্জায় গাইতে পারলেন না প্রাণখুলে। অথচ, ইচ্ছে ছিল ষোলো আনা।

দুঃখ পেলেন ঘরে ফিরে। চঞ্চল টেবিলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে আছে। ঘরময় শ্মশান নীরবতা। লোড-শেডিং অন্ধকারে হ্যারিকেনের ম্লান আলো। রোজকার মতো ছোট্টু ছুটে এল না কাছে।

চঞ্চল পাস করতে পারেনি। পাড়ার প্রভাবশালী সোনাদা উচ্চপদে কাজ করেন কলকাতায় শিক্ষা বিভাগে। ভিতরের খবর জানিয়ে গেছেন, চারশো আটান্নো পেয়েও প্যানেলে নাম আসেনি চঞ্চলের। এবার টাফ কম্পিটিশান হয়েছে। অথচ, খালপারের সতীশ প্রধানের ছেলে বিজয় দু'শো পঁচাশি পেয়ে পাস করেছে সংরক্ষিত বিভাগে।

রেজাল্ট জানার পর থেকে চঞ্চল সেই যে টেবিলে মাথা রেখেছে কারও ডাকে সাড়া দিচ্ছে না। কাঁধে স্নেহের হাত রাখলেন চপলাকান্ত। চঞ্চল মাথা তুলল না। ওর শরীরটা কেঁপে কেঁপে উঠছে। চঞ্চল কাঁদছে। চপলাকান্তর মনে হল, যেন দারিদ্র্যপীড়িত 'ভট্টাচার্যি বামুন' পরিবারটাই মাথা নুয়ে কাঁদছে। পুরুষানুক্রমে।

চপলাকান্ত অসুস্থবোধ করলেন। নিঃশ্বাসে কষ্টবোধ করছেন। মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াবার শেষ ভরসা চঞ্চল—স্বপ্নটা ক্রমশ ধূসর হয়ে যাচ্ছে। চপলাকান্ত অস্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন, খাল পার। সতীশ প্রধানের তিনতলা বাড়ি। গোলাভরা ধান। গাই-গরু। মাছের ভেড়ি। তাঁর ছেলে বিজয় প্রধানের অধীনে একজন করণিক ওর কাকার মৃত্যুর জন্য ছুটির আবেদনের শেষে লিখছে, ইওর মোস্ট অবিডিয়েন্ট চঞ্চল ভট্টাচার্য।

*ছবি ঃ সুধীর মৈত্র*

# হৃদয়গত

শ্রুতির কাছে খবরটা এসেছে ভোররাত্রে। সিন্ধ্রি থেকে কে এক শর্মাজি বহুত কোশিশ করে শেষমেশ নাকি এই নম্বরের লাইনটা পেয়েছে। সংক্ষেপে জানিয়েছে, আপকে রিস্তেদার প্রীতম গুপ্তাসাবকা ম্যাসিভ স্ট্রোক হুয়া। জান খতরেমে হ্যায়। উনকা লেড়কা জয়কো তুরন্ত ভেজনা চাহিয়ে। সুবহকা পহেলা ট্রেন ব্ল্যাক ডায়মন্ডসে ভেজ দিজিয়ে। ধানবাদ স্টেশনমে উনকে লিয়ে কার রেডি রহেগা।

শ্রুতি কোনও প্রশ্ন করার সুযোগ পায়নি। তার আগেই ওপার থেকে রিসিভার রাখার শব্দ ভেসে এসেছে।

বেশি রাত্রে ঘুমিয়েছিল শ্রুতি। এবার আবার বিশ বছরের সেরা শীত পড়েছে। ক'দিন যাবত তাপমাত্রা সাত আট পর্যন্ত নেমে এসেছে। অথচ, এমন যে নিষ্ঠুর শীত তা যেন নিমেষে উধাও হয়ে গেছে। আচমকা খবরটা শুনে তন্দ্রালু ভাবটা কেটে গিয়ে এখন দারুণ উত্তাপ উত্তেজনা বোধ হচ্ছে।

তেরো দিনের অফিস ট্যুর সেরে বিকেলে দারুণ রোমান্টিক মুডে ফিরেছে অরিত্র। অসময়ে নৈঃশব্দ্য চূর্ণ করা ফোনের ঝলঝনানি শুনে বিন্দুমাত্র ভয় পায়নি। কিন্তু ফোন অ্যাটেন্ড করে শ্রুতি ফিরে আসতে লেপের ভেতর থেকে বিরক্তি প্রকাশ করে, হু ইজ দ্য রাস্কেল নাইট গেস্ট?

শ্রুতির মুখ থেকে দুঃসংবাদটা শুনে কোনো প্রতিক্রিয়া বা ভাবান্তর হলো না অরিত্রর। বরং ঘুমিয়ে পড়ার আগেকার মুডে বলে, ঘুমটা যখন ভেঙেই গেছে, লেট আস এনজয়। শোবে এসো।

এমনতর আন্তরিক আহ্বানে সাড়া দিতে পারে না শ্রুতি। বেশ কিছুক্ষণ অশান্ত পায়চারি করে। ধানবাদে এখন শীতের প্রকোপ কেমন হবে? এসব নিয়ে ভাবার সময় নয় এখন। ঝটিতি একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছে যায়। এয়ার ব্যাগে টুকটাক জিনিসপত্র গোছাতে থাকে।

তুমি যাবে নাকি? অরিত্র বিস্ময় প্রকাশ করে।

হ্যাঁ। তোমার কী মত? শ্রুতি সৌজন্যসূচক প্রশ্ন রাখে।

দৃঢ় কণ্ঠের ছোট্ট উত্তর শুনেই অরিত্র বুঝতে পারে, একবার যখন মনস্থ করেছে

তখন যাবেই। শ্রুতি এরকমই জেদি একনিষ্ঠ একগুঁয়ে। সুতরাং, ভালোমানুষি জবাব দেয়, তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছি কখনও? নিশ্চয়ই যাবে। সবে ফিরেছি। আগে অফিসে জয়েন করা দরকার। তা না'হলে আমিও যেতাম।

তাই বুঝি! শুনে খুশি হলাম। শ্রুতির কণ্ঠ থেকে অবিশ্বাসী স্বর ঝরে।

তোমার ট্রেন তো সেই ছ'টা দশ। অরিত্র বলে, খুশিই যদি হয়ে থাকো এখন শোবে এসো।

অনেকদিন পর ফিরে আসা অরিত্রর এরকম আচরণ অস্বাভাবিক মনে হয় না শ্রুতির। তাই, অসন্তোষ প্রকাশ না করে বোঝায়, প্লিজ ডোন্ট মাইন্ড। জয়কে ওর কাকার বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যেতে হবে যে। হাতে সময় নিয়ে না বেরুলে ট্রেনটা ধরবো কেমন করে?

ইচ্ছে ক'রে চতুর প্রশ্ন রাখে অরিত্র, এখনও ভোরের আলো ফোটেনি। ট্যাক্সি যদি বা পাও তো একা তোমাকে নিয়ে কেউ কি সাউথে যেতে চাইবে?

চাতুর্যে শ্রুতিও কম যায় না, উপায় কী বলো? ফর হিউম্যান সেক এই পথটুকু তোমার কম্পানি না পেলেও চেষ্টা তো আমাকে করতেই হবে।

অরিত্র ভালো করেই জানে, শ্রুতি যা একরোখা নাছোড়বান্দা ফরোয়ার্ড তাতে কোনও প্রচেষ্টায় পারতপক্ষে অসফল হয় না। স্বভাবতই নিজের ইমেজ রাখতে সেও তৎপর হয়ে বিছানা ছেড়ে ওঠে।

ফোনে খবরটা পাওয়ার পর থেকে একটা অশুভ আশঙ্কা শ্রুতিকে খুঁচিয়ে বিব্রত করছে। জয় তো ওইটুকু ছেলে। এই সেইদিন পর্যন্ত বাপ-মার আদর যত্নের ছায়ায় নিশ্চিন্তে স্কুলে পড়াশুনো করেছে। সেকেন্ডারি পাশ করে এখন কলকাতায় কাকার বাড়িতে থেকে কলেজে পড়ছে। সামনের জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষায় বসবে। ওর পড়াশুনোয় কোনরকম অসুবিধা হোক প্রীতমরা তা কোনওদিনই চায় না। অনেক ক্ষেত্রে তো ওকে বাড়াবাড়ি পর্যায়ে ছাড় দিয়ে নির্ভাবনায় রাখার চেষ্টা করে। তবে কেন এতটা গুরুত্ব দিয়ে ফার্স্ট এক্সপ্রেস ট্রেনেই পাঠাতে বলা হয়েছে। স্টেশনে রিসিভ করার জন্য গাড়িও থাকবে বলেছে। তাহলে কি তেমন কিছু মর্মান্তিক অঘটন ঘটে গেছে? অনেকসময় দূর থেকে মৃত্যুর খবর তো এভাবেই দেওয়া হয়ে থাকে।

কাক ডাকা ভোরে খবরটা শুনে জয়ের কাকা কৌশিকের ঘুম চোখে আশঙ্কা উদ্বেগের আঁচড় পড়ে। শ্রুতিকে একান্তে ডেকে নিয়ে সন্দিগ্ধ প্রশ্ন রাখে, সত্যি করে বলুন তো আসল খবরটা কী? প্লিজ লুকোবেন না। ভীষণ টেনশন হচ্ছে।

ঈশ্বরের নামে শপথ করে শ্রুতি আশ্বস্ত করতে চায়, বিশ্বাস করো এর বেশি কিছু জানি না আমি।

কৌশিকের কপালে চিন্তার রেখা ফুটে ওঠে, জয়কে এখনই এভাবে যেতে বলেছে কেন সেটা ভাববার বিষয়। আপনার কী মনে হয়?

বুঝতে পারছি না। শ্রুতি সহজ হতে সাহায্য করে, এখন ভাববার সময় কম। জয় নিশ্চয়ই ঘুমোচ্ছে? ওকে ডেকে তুলে তাড়াতাড়ি তৈরি হতে বলো।

কৌশিকের ইচ্ছে ছিল, আগে অফিস যাবে। তারপর ছুটি নিয়ে বেলায় কোনও ট্রেন ধরবে। কিন্তু শ্রুতি যাচ্ছে  শুনে সিদ্ধান্ত পাল্টে এখনই যাওয়া সমীচিন মনে করল।

ছাত্র হলেও জয় সাধারণত বেলা করে বিছানা ছাড়ায় অভ্যস্ত। কৌশিক অনেক করে বলেও ভোরে উঠে পড়ার অভ্যাস করাতে পারেনি।

অসময়ে ঘুম ভাঙানোয় জয় মনঃক্ষুণ্ণ হলেও পরে ভুল বুঝতে পারে। কিন্তু, সংবাদটা শুনেও কেমন যেন নিরুদ্বেগ ভাবলেশহীন। ঘন ঘন তাগাদায় উত্যক্ত হয়ে ঘড়িতে সময় দেখায়, এত ব্যস্ততার কী আছে? মাসি তো ট্যাক্সিটা ছাড়েনি। ছটা দশের ট্রেন আরামসে পাওয়া যাবে।

এরপর জয়ের আচরণ রীতিমতো নজরে পড়ার মতো।  সে নিত্যকার গতিতে বাথরুম টয়লেট সারে। ততক্ষণে চা, ব্রেকফাস্ট রেডি। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে শ্রুতির বিস্বাদ লাগে। খাবার স্পর্শ করে না। তড়িঘড়ি তৈরি খাবার জয়ের কাছে জুতসই হয়নি। চাপা অসন্তোষ নিয়ে বলে, খেয়ে নিলে ভালো করতে মাসি। এতটা সময়ের জার্নি। কখন কী খাওয়া পাবে তার কি কোনও ঠিক আছে?

শ্রুতি বিস্ময়ে নিরুত্তরে ভাবে, নিজের ছেলেটিও কি বড় হয়ে এরকমই হবে! হৃদয়ানুভূতিহীন আবেগ-প্রবণতাবিহীন? একালের সন্তানেরা বোধহয় এরকমই। দেখছে তো চারদিকে, আত্মীয় আপন প্রিয় পরিচিতদের ঘরে ঘরে। বাবা-মার অসুখ বিসুখে বিন্দুমাত্র উদ্বেগ আশঙ্কা হয় না ওদের! হঠাৎ অসুস্থ হয়ে অসময়ে শুয়ে থাকতে দেখলেও জিগ্যেস করে না, কী হয়েছে? সেবাযত্নের কথা তো অনেক দূরে।

ট্রেনে বসে শ্রুতি লক্ষ্য করে, জয় কেমন নিশ্চিন্ত মনে টুকটাক চা কফি খাবার কিনে খাচ্ছে। সঙ্গে আনা ইংরেজি ডিটেকটিভ নভেলের পাতা ওল্টাচ্ছে। আবার কখনও বা জানলায় কৌতূহলী দৃষ্টি মেলে প্রকৃতির দৃশ্য দেখছে। ভাবটা এমন, যেন দেশভ্রমণে চলেছে।

মাঝে মাঝে অবাক উদাসী হয়ে পড়ছে শ্রুতি। বুকের গভীর থেকে উঠে আসা দীর্ঘশ্বাস ছড়িয়ে আত্মমগ্ন হয়ে পড়ে। একালের ওরা ভয়ঙ্কর স্বার্থপর। চরম বস্তুবাদী আর চূড়ান্ত আত্মকেন্দ্রিক। ওরা যেন এক অদ্ভুত বিস্ময়কর নতুন ধারা। নির্মম নিষ্ঠুর

রুক্ষতায় ভরা চোখ মুখ। দৃষ্টিতে জিঘাংসা। বাচনভঙ্গিতে অতি স্মার্টনেস। যে কোনও সাবজেক্টে এমন তর্ক জুড়ে দেয় যেন সবজান্তা। শ্রদ্ধা বিনয় সৌজন্য শালীনতার বড় অভাব ওদের। গুরুজনদের সম্পর্কে কত অনায়াসে বিরূপ মন্তব্য করে বসে। হুটহাট নাক গলিয়ে দেয় বড়দের যে কোনও আলোচনার মাঝে। আরও কত কী যে!

বার কয়েক চা কফি অফার করেছে কৌশিক। শ্রুতি প্রতিবারই অনীহা প্রকাশ করে সে অনুরোধ ফিরিয়ে দিয়েছে। সেজন্য দ্বিতীয়বার কৌশিক নিজেও খায়নি। অসম্ভব চিন্তামগ্ন চুপচাপ গাম্ভীর্য নিয়ে অগুণতি সিগারেটের ধোঁয়া উড়িয়ে যাচ্ছে। সময়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ট্রেনটা ঠিকঠাক ছুটলেও শ্রুতির কাছে গতিটা খুবই স্লো মনে হচ্ছিল। ভাবছিল, দৌড়ে আগে পৌঁছনো গেলে সে দৌড়েই যেতো।

স্টেশনের বাইরে জয়ের জন্যে দাঁড়িয়ে থাকা কোনও গাড়ির হদিশ পাওয়া গেল না। তেমন কোনও অঘটন ঘটে থাকলে গাড়ি আসতে নিশ্চয়ই ভুল হতো না। সুতরাং, বেশ কিছুটা নিশ্চিন্ত হতে পারে শ্রুতি। আরো বেশি নিশ্চিন্ত হয় যখন জয়ের সঙ্গে পরিচিত একজনের দেখা হয়ে যায়। তার কাছেই খবর মেলে, প্রীতম কোন নার্সিং হোমে আছে।

শ্রুতিকে একটা প্রাইভেট ট্যাক্সির ভাড়া দরদাম করতে দেখে জয় অযৌক্তিক মনে করে, কতগুলি টাকা খরচের কী দরকার আছে মাসি? সাট্‌ল ট্রেকারে অনায়াসে পৌঁছে যাওয়া যাবে।

দরকার নিশ্চয়ই আছে। শ্রুতির কণ্ঠ দৃঢ় রূঢ় হয়ে ওঠে, যদি অতই বুঝতিস তাহলে তো ভাবনাই ছিল নারে। তুই বরং বুঝতে চেষ্টা কর, বাবার এই অসুখটার উৎস কোথা থেকে হতে পারে।

জয় অপ্রস্তুত। চুপচাপ গাড়িতে উঠে বসে। কিন্তু চলতি পথে হঠাৎই মুখ খোলে, তুমি কিন্তু ভয়ানক নার্ভাস আর টেনশড্ হয়ে পড়েছো মাসি। আমার ওপর খামোকা রাগ দেখালে। তোমাকে আঘাত দেওয়া আমার উদ্দেশ্য ছিল না।

মাসির মনের অবস্থাটা যে কোনও সুস্থ মানুষের পক্ষেই সঙ্গত ও স্বাভাবিক। শ্রুতির হয়ে জবাব দিলো কৌশিক, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদের উপস্থিতিটা খুবই জরুরি। পরে সহজ করে বোঝাতে চেষ্টা করলো, টিঙ্কিকে নিয়ে একা বৌদি কতটা অসহায় বোধ করছে ভাবতো। হয়তো বলবি, বাবা তো আর নির্বান্ধব হয়ে জঙ্গলে বাস করে না। তাছাড়া, যথেষ্ট উঁচু পদে কাজ করে। নিশ্চয়ই প্রয়োজনীয় সব কিছুরই ষোলো আনা ভালো ব্যবস্থা হয়েছে। তাহলেও যে কোনও রোগির কাছেই তার নিজের লোকেদের উপস্থিতিটা বেশি প্রয়োজনের। বিশেষ করে এই রোগে

তো চিন্তামুক্ত থাকা জরুরি। আমরা গিয়ে পৌঁছলে দাদা কিছুটা তো চিন্তা মুক্ত হবে। তোদের মতো বয়সে আমরা কিন্তু বুঝতে শিখেছিলাম, বাবা মা কিসে খুশি হবে। আনন্দ পাবে।

জয়ের মাথাটা ক্রমশ নুয়ে পড়ছে। আর কৌশিক নানাভাবে বুঝিয়েই চলেছে, এ পর্যন্ত ক'টা চিঠি লিখেছিস মা বাবাকে? যে কোনও বাবা মা যে পুজোর ছুটিতে দূরে থাকা তার সন্তানের জন্য পথ চেয়ে বসে থাকে তা তো তোকে বুঝিয়েছিলাম। অথচ, কলকাতার জমাট উৎসব ছেড়ে তুই কিন্তু যাসনি। কলকাতা থেকে সিন্ত্রি ধানবাদ এমন কী আর দূরে? আজ গিয়ে, কাল ফেরা চলে। এবার তো তোর জন্মদিন পড়েছিল শনিবারে। তবু, তুই এখানেই থেকে গেলি বাজে একটা অজুহাতে। দাদা আমাকে চিঠি লিখেছিল অনেক দুঃখ করে। আমরা কিন্তু বাবা মা-র পছন্দ অপছন্দের যথেষ্ট গুরুত্ব দিতাম। ওঁদের সেন্টিমেন্ট বুঝে সমঝে চলতাম। অপছন্দ খাবার কেই বা খেতে চায়? তেমনি এক অপছন্দ খাবার খাওয়ার জন্য মা একদিন জোর করছিল। নিতে চাইছিলাম না দেখে বাবা বুঝিয়েছিল, ভালোবেসে দিলে অপছন্দের জিনিসও খুশি মনে নিতে শেখ। পাওয়া ভালোবাসা ফিরিয়ে দিতে নেই। ঠকবি যে।

শ্রুতি চুপচাপ শুনছিল। এখন পরিষ্কার বুঝতে পারছে, জয়কে কেন এত গুরুত্ব দিয়ে ডেকে পাঠানো হয়েছে। মনে পড়ে যায় শেষ দেখার সময় প্রীতম দুঃখ করেছিল, আমি বড় একা হয়ে গেছি শ্রুতি। বড্ডো নিঃসঙ্গ লাগে। ছেলে মা মেয়ে মিলে আমার বিরুদ্ধে যেন একটা ফ্রন্ট হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওদের চাহিদার কী কোনও অন্ত আছে? নিজেকে উজাড় করে দিয়েও কারও মন পাই না কিছুতেই। ছেলেমেয়েরা তো সর্বক্ষণ ওদের মা-র মুখ থেকে শুনে শুনে আমাকে একটি অপদার্থ মনে করতে শিখেছে। মাঝে মাঝে নিজেকে একটি দুধেল গাই মনে হয়। দুধের প্রত্যাশায় গরুটাকে বাঁচিয়ে রাখতে যতটুকু আদরযত্নে রাখা দরকার সেটুকুই শুধু পেয়ে থাকি। অভাবী সংসারে মানুষ হওয়া আমি এ পর্যন্ত না নিজেকে না প্রকৃতিকে ভালোবেসেছি। শুধু নিজের জনদেরই ভালোবেসেছি। তাই অনেক কিছু না-পাওয়ার গ্লানিতে আমার হৃদয়টা বড় নড়বড়ে ঝাঁঝরা হয়ে পড়ছে। আমি যে ভালোবাসার বড় কাঙাল শ্রুতি। আসলে কী জানো? বিয়ে করা বউ-এর কাছ থেকে কোনও পুরুষই বোধহয় প্রত্যাশিত ভালোবাসা পায় না। পাবে কেমন করে? বিয়ের বন্ধনের আগে থেকেই তো ভবিষ্যতের উজ্জ্বল ভাবনায় হিসেব নিকেশ শুরু হয়ে যায়। এসব আজকাল বুঝতে পারি। তাই অল্প আঘাতেই অতি বেশি মেজাজ খারাপ করে ফেলি। নৈরাশ্যে সব কিছু ছেড়ে ছুঁড়ে নির্জন কোথাও বনবাসী হতে ইচ্ছে করে।

তাই বুঝি? কৌতুক করে হেসে ফেলে শ্রুতি।

প্রত্যুত্তরে প্রীতম নিজেকে শক্ত মনের মানুষ বোঝাতে চায়, এখন হাসছো বটে পরে দেখে নিও। টিঙ্কির বিয়েটা হয়ে যেতে দাও। জয় নিজের পায়ে দাঁড়াক। রীতিকে সব কিছু বুঝিয়ে দিয়ে সংসার ছেড়ে ঠিক বেরিয়ে যাবো।

পারবে না। না-পারার কারণ ব্যাখ্যা করে শ্রুতি, তুমি তো ওদেরকে মনেপ্রাণে ভালোবাসো। তাই বনে গেলেও ওদের কথাই ভাববে। ভালোবাসার কাঙালেরা ওসব পারে না।

এই দুর্বলতাই আমাকে শেষ করে দিচ্ছে। শ্রুতির যুক্তি মেনে নিয়ে বুক উজাড় করা দীর্ঘশ্বাস ছড়ায় প্রীতম, ওরা কিন্তু আমাকে ছেড়ে আনায়াসে থাকতে পারবে। হয়তো প্রথম দিকে কষ্ট পাবে। কিন্তু, মানিয়ে নিতে সময় লাগবে না। এখন যে ধরে রেখেছে সেকি ভাবছো, ভালোবেসে? না। শুধু অর্থনৈতিক দিক থেকে আরো বেশি ভালো থাকার স্বার্থে। আমার যা কিছু সঞ্চয় আর ভবিষ্যতের প্রাপ্তির নমিনি কে, সব কিছুই ওরা জানে। অস্থাবর কিসের কতটুকু অংশীদার কে, তাও অজানা নয়। সুতরাং, অর্থনৈতিক নিরাপত্তার যেখানে কোনও অভাবই রাখিনি সেখানে আমি চলে গেলেই বা ভাবনা কিসে?

রকমারি রান্নার খাবার খেতে ভালোবাসে প্রীতম। সেদিন ওর প্রিয় খাবারগুলি রান্না করেছিল শ্রুতি। আলোচনার মাঝপথে খাওয়া থেমে যায় প্রীতমের। চোখ ছলছল করে ওঠে। শিশুর মতো কেঁদে ফেলে, আঘাত ছাড়া তোমাকে আর কিছুই তো দিইনি শ্রুতি। অথচ আশ্চর্য দেখো, নিজে আঘাত পেয়ে সেই তোমার কাছেই ছুটে এসেছি। কেন বলতে পারো?

জেনেও কোনও উত্তর দেয়নি শ্রুতি। মনে মনে রীতির ওপর ভীষণ রাগ হয়েছে। রীতিটা ছোটবেলা থেকেই বড় বেশি স্বার্থপর উচ্চাভিলাষী। প্রীতম তো প্রথম দিকে পড়াতো একা শ্রুতিকেই। সে সময় . কাছাকাছি থাকা দুই পরিবারের লোকেদের মধ্যে গড়ে ওঠা হৃদ্যতার সূত্রে অবাধ মেলামেশার সুযোগ তারও অনেক আগে থেকেই। প্রীতমকে মনেপ্রাণে ভালোবেসে ফেলেছিল শ্রুতি । প্রীতম সবই বুঝতো। কিন্তু, ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখায়নি। হয়তো শ্রুতি সুশ্রী ছিল না বলে। পরে রীতিও যখন একই সঙ্গে পড়তে বসতো প্রীতমের নজরটা ছিল সুন্দরী রীতির দিকে। সেদিনের সামান্য মাইনের শিক্ষক প্রীতমকে কিন্তু মোটেই পাত্তা দিত না রীতি। হঠাৎই প্রীতম এখনকার বড় অঙ্কের বেতন আর বাড়তি অজস্র সুযোগ সুবিধার চাকরিটা পেয়ে গেল। সাহস পেয়ে সরাসরি বাবার কাছে বিয়ের প্রস্তাবটা রেখেছিল প্রীতম। শুনে এককথায় রাজি রীতি। তখন বড় বোনের উদারতা দেখিয়েছে শ্রুতি।

নয়তো কী? অসম্ভব কষ্ট বুকে ঈর্ষাকাতর হয়ে বাগড়া দিতে তো পারতো। বাবাও তো দ্বিধায় ছিল বড় মেয়ের আগে ছোটকে বিয়ে দিতে।

রীতির বিয়ে হয়ে যেতে আজীবন কুমারী থাকার সংকল্প নিয়েছিল শ্রুতি। এই তো কয়েক বছর আগেও কুমারীই ছিল। একে তো সুশ্রী ছিল না কোনওকালে। তারপর শরীর স্বাস্থ্য ভেঙে বুড়িয়ে যাচ্ছিল অকালে। অরিত্র তো ছেলেবেলাকার বন্ধু। খেলার সাথী। বিদেশ থেকে ফিরে সব কিছু জেনে শুনে কী মায়ায় পড়ে গেল কে জানে। একরকম জোর জবরদস্তি করেই বিয়ে করে ফেললো কোনও আপত্তি না শুনে।

ভাগ্যক্রমে হার্ট স্পেশালিস্ট ডঃ চৌধুরির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। নার্সিংহোম থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন। পরিচয় দিতে পরিমিত হাসলেন, খুউব ভালো করেছেন আপনারা এসে। মিঃ গুপ্ত এখন সজ্ঞানেই আছেন। আপনাদেরকে দেখলেই ওঁর অসহায় ভয়ার্ত ভাবটা কেটে যাবে। দ্যাট উইল বি হেল্পফুল ফর হিজ রিকভারি। বাট ডোন্ট ডিসটার্ব হিম। একদম কথা বলবেন না। হি নিডস কমপ্লিট রেস্ট। সবরকম চেকিং একজামিন করে দেখেছি। রিপোর্ট কোয়াইট ওকে। আশ্চর্যরকম রোগমুক্ত শরীর। শুনেছি, স্মোক ড্রিংকস-এ অভ্যস্ত ছিলেন না। ফ্যাট নেই। তবু কেন যে এমন বিস্ময়কর ম্যাসিব স্ট্রোক হলো! আই থিংক, পারহ্যাপস হি মাইট বি হাইলি শকড্ বাই এনি আননোন রিজন। অন্য কোনও কারণ আপাতত খুঁজে পাচ্ছি না। এনি হাউ, অল টাইম আপনাদের তরফে কেউ একজন যেন প্রেজেন্ট থাকেন। বাহাত্তর ঘন্টা পার না হলে কিছু বলা যাচ্ছে না। ওকে, আই উইল ভিজিট এগেইন ইন দ্য ইভনিং।

এখন কেবিনের সামনে ডিউটি দিচ্ছে সুখরাম। প্রীতমদের বাংলোয় সর্বক্ষণের পরিচারক। আগে ওর বাবা দীনরাম কাজ করতো। নিষ্ঠা সততা আন্তরিকতায় আপনজন হয়ে গিয়েছিল দীনরাম। সেই সুবাদে বাবা অসুস্থ অক্ষম হয়ে পড়ার পর এখন কাজ করছে সুখরাম। কোনদিক থেকেই বাবার সঙ্গে মিল নেই ছেলের। নমস্তে জানিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে সুখরাম। দেখেই বোঝা যায় প্রকৃতিস্থ নয় সে। ঢুলু ঢুলু রক্তিম চোখ। কাছের বাতাসে এখনও দিশি মদের গন্ধ ভাসছে।

সুখরামের কাছে মোটামুটি খবর পাওয়া গেল। প্রীতমকে ভর্তি করার সময় নাকি লোকে লোকারণ্য ছিল। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে একে একে সকলে ফিরে গেছে। টিঙ্কি একা থাকায় রীতিকেও ফিরে যেতে হয়েছে। আজ সকালে নিজেই ড্রাইভ করে এসেছিল রীতি। টিঙ্কি নাকি স্কুলে যাবেনা বলে বায়না ধরেছিল। অনেক বকে ঝকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে এসেছে।

পাশের বাংলোর দত্ত সাহেবের ছেলে ছানু আর সুখরাম কাল রাত জেগেছে। ছানুর আবার আজই আসানসোলে চাকরির ইন্টারভিউ আছে। যাবার আগে বলে গেছে, ফিরে এসে আজও রাত জাগবে।

সুখরামকে ছুটি দিলো শ্রুতি। সেই সঙ্গে কৌশিক আর জয়কেও যেতে বললো। কৌশিক ইতস্তত করলো, তা কেমন করে হয়? আপনি যান, আমি বরং থাকি।

একই ব্যাপার। শ্রুতি প্রস্তাব দিলো, তুমি এসে আমাকে রিলিজ করলেই হবে। চেন সিসটেমে সকলে মিলে চালিয়ে দেয়া যাবে।

প্রীতম এখন ঘুমোচ্ছে। দরজার পাল্লা সরিয়ে উঁকি দিয়ে দেখলো শ্রুতি। অসহায় শিশুর মতো লাগছে মুখটা।

সন্তর্পণে পাল্লাটা ভেজিয়ে দিয়ে বাইরে রাখা সোফায় বসলো শ্রুতি। পুরনো হারানো দিনের স্মৃতি নিয়ে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে। বিষণ্ণতায় ডুবে গিয়ে অশুভ আশঙ্কা করে, প্রীতম যদি না—বাঁচে তো অবস্থাটা কী দাঁড়াবে? ভাবতে পারে না। বিব্রত অশান্ত পায়চারি করে সময় কাটিয়ে দেয়।

দুপুরে কৌশিককে নিয়ে রীতি আসে। নিজে থেকেই জয়কে না নিয়ে আসার কারণ ব্যাখ্যা করে, ঘুমোচ্ছে বলে ওকে আর ডাকলাম না। অত ভোরে উঠে এসেছে তো। শরীরের ওপর দারুণ ধকল গেছে।

কেবিনে ঢুকতে যাচ্ছিল রীতি। শ্রুতি বাধা দিয়ে বলে, এখন যাসনি। শব্দ শুনে জেগে যেতে পারে। এখন যত বেশি ঘুমোবে ততই ভালো।

কিসব সার্টিফিকেট চেক বই আর কিছু সাদা কাগজ দেখিয়ে রীতি বলে, ঘুম ভাঙলে এগুলিতে সই করতে পারে কিনা দেখলে কেমন হয়?

শরীরের সমস্ত রক্ত যেন মাথায় উঠে আসে শ্রুতির। রীতির গালে থাপ্পড় বসিয়ে দিতে ইচ্ছে করে। তা পারলে হয়তো মনের রাগঝাল কিছুটা কমতো। কিন্তু, এসময় যথেষ্ট সংযত থাকা উচিত ভেবে শান্ত আচরণ করে, তুই কি ধরেই নিয়েছিস যে বাহাত্তর ঘন্টা পার হবে না! এখন ওকে কোনওরকম ডিসটার্ব না করাই ভালো। টাকার দরকার থাকে তো বল না। আমি মোটামুটি তৈরি হয়েই এসেছি। দরকার হলে আরো আনা যাবে।

কৌশিকও সমর্থন করে, এই মুহূর্তে এগুলি সই করাতে গেলে দাদার মনের ওপর চাপ পড়বে।

রীতিকে এখানে রেখে যাওয়া যুক্তিযুক্ত মনে করে না শ্রুতি। রীতির হাত ধরে, কৌশিক তো এখন থাকছেই। তুই বরং আমার সঙ্গে ফিরে চল। কিছু জরুরি কথা আছে। ডঃ চৌধুরি সন্ধ্যেবেলা আবার ভিজিটে আসবেন বলেছেন। তার আগেই

ফিরে আসতে হবে। ওঁর কাছে পরামর্শ চাইবো, যদি প্রয়োজন মনে করেন তো কলকাতা থেকে আরো অভিজ্ঞ স্পেশালিস্ট আনার ব্যবস্থা করতে হবে।

প্রয়োজন আছে মনে করলেন না ডঃ চৌধুরি। বললেন, প্রেসার আর পালসবিট ভালোরকম ইমপ্রুভ করছে। হার্ট ছাড়া শরীরে আর কোনও সাইড এফেক্ট নেই। এটা খুবই ভালো লক্ষণ। কাল সকালে আবার ই সি জি করবো। বাট ফর ইওর ওন স্যাটিসফেকশন যাকে খুশি ডাকতে পারেন। আই উইল নেভার টেক ইট আদার ওয়াইজ।

অনেক ভেবেচিন্তে ডঃ চৌধুরির ওপর বিশ্বাস রাখা শ্রেয় মনে করে শ্রুতি। কৌশিকও একমত। তবু বৌদির মতামতটা যাচাই করতে বলেছিল। কৌশিকের প্রস্তাবে গুরুত্ব দেয়নি শ্রুতি।

এখন রাত গভীর। কৌশিক রীতি টিঙ্কি জয় ওরা একে একে ফিরে গেছে। অফিস ছুটির পর থেকে অনেক শুভানুধ্যায়ী এসেছিল। ডাক্তারের মানা আছে বলে শ্রুতি কাউকেই কেবিনে ঢুকতে দেয়নি। রীতি ওদেরকেও নয়। এমন কি নিজেও একবারটির জন্য ঢোকেনি। তবে, মাঝে মধ্যেই দরজার কপাট নিঃশব্দে ফাঁক করে উঁকি দিয়ে দেখছে। চিৎ হয়ে শুয়ে থাকা প্রীতম জেগে না ঘুমিয়ে আছে বুঝতে পারছে না।

ছানু আজও রাত জাগুক শ্রুতি তা চায়নি। কিন্তু ছেলেটি নাছোড়বান্দা। ওর সঙ্গী হিসেবে থাকার জন্য কৌশিক বা জয়ের তরফে স্বতঃপ্রণোদিত কোনও আগ্রহ না দেখে শ্রুতি থেকে গেছে। ছানু অবশ্য আপত্তি জানিয়েছিল, একা থাকতে আমার কোনওই অসুবিধা হবে না। থাকতে চান কাল থাকবেন। সবে আজ এসেছেন, ট্রেন জার্নির পর বিশ্রাম দরকার। শ্রুতি বুঝিয়েছে, ঘরেতেও দুশ্চিন্তায় ঘুম আসবে না। তার চেয়ে এখানে অনেক বেশি নিশ্চিন্ত থাকা যাবে।

ছানু ছেলেটাকে বেশ ভালো লাগছে শ্রুতির। বেশিদূর পড়াশুনা করেনি বলেই বোধহয় এতটা উদার নিঃস্বার্থ হৃদয়। যথেষ্ট সভ্যভব্য মানুষও বটে। আন্তরিকতার তুলনা হয় না। তথাকথিত শিক্ষিতদের চেয়ে ঢের ঢের ভালো ছেলে। এতদিন তো জানা ছিল, শিক্ষিত হওয়া মানে তো জ্ঞানের আলোকে হৃদয়কে প্রসারিত করা। সকলকে কাছে বুকে টেনে নেওয়া। অথচ আজকাল বাস্তবে কী দেখা যাচ্ছে? শিক্ষিত হলেই আর দশজন থেকে নিজেকে আলাদা ভাবতে শুরু করা। অহংকারে দূরে নিজেকে গুটিয়ে নেয়া। দিন দিন মানুষের হৃদয়টা কেমন যেন ছোট হয়ে যেতে বসেছে।

ক্লান্ত ছানু এখন বসে বসে ঝিমোচ্ছে। হাড় কাঁপানো শীতে কম্বল জড়ানো তবু শরীরের শুধু মুখটুকুই বেরিয়ে আছে। বড় নিষ্পাপ পবিত্র লাগছে। একটু আগেও

সে জেগে ছিল। নানা কথার মাঝে বললো, বেশিদূর লেখাপড়া করতে পারিনি বলে আগে দুঃখ ছিল। এখন আর নেই। কেন জানেন? চেহারা পোশাক আচার আচরণ মুখের ভাষায় আর শিক্ষিত অশিক্ষিতের তফাত খুঁজে পাই না যে। লক্ষ্য করে দেখবেন, তথাকথিত ভদ্রঘরের শিক্ষিত ব্রিলিয়ান্ট ছেলেরাই হালের বড় বড় ডাকাতি খুন রেপ স্মাগলিং ইত্যাদি কেসে বেশি সংখ্যায় জড়িত থাকছে। প্রীতমকাকু একদিন সান্ত্বনা দিয়ে বুঝিয়েছিলেন, কঠিন অসুখের জন্য বেশিদূর পড়তে পারিসনি তো অত দুঃখ কিসের? বেশি পড়াশুনো করেই বা হচ্ছেটা কী? গার্জেনরা তো শুধু ছেলেমেয়েদের একাডেমিক কোয়ালিফিকেশনের দিকেই নজর রেখে ছুটছে। কেননা, হাই এডুকেশন মানেই ভালো চাকরি। ভালো চাকরি মানেই সচ্ছল ভোগ বিলাসের জীবনে প্রতিষ্ঠা। ফল কী দাঁড়াচ্ছে? ঘরে ঘরে ব্রিলিয়ান্ট অথবা হাই এডুকেটেড ছেলে। সত্যিকার মানুষ বলতে যা বোঝায় তা ক'জন আর হচ্ছে? এখন সমাজ সংসারে অশান্তির মূল কিন্তু এখানে। দেখে নিস তুই বরং অনেক বেশি সুখ শান্তিতে জীবন কাটাতে পারবি।

একনাগাড়ে কথাগুলি বলে গিয়ে ছানু জানতে চাইলো, সত্যিই কি তাই?

ঠিকই বলেছে তোমার প্রীতমকাকু। শ্রুতি সুযোগ বুঝে প্রশ্ন জুড়ে দেয়, ও তো তোমাকে মনের মানুষ মনে করে, খুবই ভালোবাসে। তাহলে নিজের মনের সুখদুঃখের কথাও নিশ্চয়ই বলে?

ক'দিনের আর পরিচয় আমাদের। ছানু জানায়, আমরা হালে এসেছি এখানে। এই সামান্য সময়ে যেটুকু বুঝেছি তাতে মনে হয়েছে, ওঁর হৃদয়টা যত বড় আর কারও বোধহয় ততটা নয়। ওঁর সেন্টিমেন্ট আবেগ উদারতা কেউই বোধহয় ঠিকঠাক বোঝার চেষ্টা করে না। ওঁর একান্ত নিজস্ব কিছু রীতিনীতি মূল্যবোধ আছে। তাতে কেউ আঘাত করলে বেজায় মাথা গরম করে ফেলেন।

ফেলা জাল গুটিয়ে আনতে তৎপর হয় শ্রুতি, হার্ট অ্যাটাকের আগে তেমন কোনও কারণে মাথা গরম করে ফেলেছিল কি?

জানি না। তবে, আনন্দ ফুর্তিতে থাকা লোকটাকে ইদানীং কারও সঙ্গে খুব একটা বেশি কথা বলতে দেখতাম না।

ডঃ চৌধুরির অনুমান, হয়তো বড় রকমের কোনও শক পেয়েই স্ট্রোকটা হয়েছে।

হতেই পারে। ছানু নিজের মত ব্যক্ত করে, হার্ট মানে তো হৃদয়। হৃদয় যা চায় মানুষ তা পায় না। দিন দিন অপছন্দের মাত্রাটা বড্ড বেশিরকম বেড়ে যাচ্ছে। যা কিছু অপছন্দ সেসবের সঙ্গেই তো মানুষকে আপস করে চলতে হচ্ছে। যে সহজে মেনে মানিয়ে নিতে পারছে তার কিছু হয় না।

ছানুর কথার সূত্রে শ্রুতিকে নস্টালজিয়ায় পেয়ে বসে। প্রীতম একদিন বলেছিল, প্রতিটি সংসারই এখন মাতৃতান্ত্রিক হয়ে যেতে বসেছে। সংসার আর সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে যা কিছু ভাবনা চিন্তা তা যেন একা মায়েদের। আমরা পুরুষেরা প্রথমে লড়াই করি। পরে শান্তি আর সম্মান বজায় রাখতে ইচ্ছাকৃত হার মেনে নিই। নিস্পৃহ নির্বিরোধী নেহাৎ ভালো মানুষ হয়ে যাই। লোকে তখন 'ভেড়ুয়া' বলতে থাকে। মায়েরা তো আফটার অল রমণী। কোমল স্বভাবের। নরম মনে কতটুকু আর শাসন করা চলে? শাসন ছাড়া কি কখনও ডিসিপ্লিন আসে? ওটার বড় অভাব এখনকার ছেলেমেয়েদের।

নার্সিংহোম থেকে প্রীতম ছুটি পাওয়ার পর এক মুহূর্তও এখানে থাকা সঙ্গত মনে করছে না শ্রুতি। দু'দিনের উপস্থিতিতেই বুঝতে পারছে, ওর অভিভাবকমূলক খবরদারি মেনে নিতে রীতির কষ্ট হচ্ছে। হয়তো বা মনের গভীরে পাহাড় প্রমাণ রাগ ক্ষোভের বারুদ জমে উঠছে। যে কোনও মুহূর্তে বিস্ফোরণ ঘটতে পারে। তাছাড়া, উড়ে এসে জুড়ে বসা বেশি আন্তরিকতার কদর্থ হতেই বা কতক্ষণ। এরই মধ্যে জয় আর টিঙ্কির আচরণে রীতিমতো ঘেন্না ধরে গেছে। টিঙ্কি কত সহজেই প্রিয় টিভি সিরিয়ালের সামনে বসতে পারছে। জয় স্টিরিও টেপ রেকর্ডারে ওয়স্টার্ন মিউজিক শুনছিল তুঙ্গে শব্দ তুলে। অথচ, বাবা তাদের বাঁচবে কিনা নিশ্চিত নয় এখনও। মেজাজে দশকথা শুনিয়ে দিয়ে শ্রুতি এখন ভাবছে, শাসনটা ওরা মনে প্রাণে মেনে নিতে পেরেছে কিনা কে জানে। দু'দিন পরে হয়তো এমনও দেখা যাবে, রীতি যথারীতি যাওয়া শুরু করেছে অফিসার্স ওয়াইভস ক্লাবে।

বাহাত্তর ঘন্টা তো নয়, যেন বছর মনে হচ্ছিল শ্রুতির। বিপদ সময়সীমা পার হয়ে যেতে ডঃ চৌধুরি ঝিলিক দেয়া হাসলেন, নাউ হি ইজ আউট অব ডেঞ্জার। শুধু তাই নয়, আনএক্সপেকটেড কুইক ইমপ্রুভ করছেন। এই হারে রিকভারি করতে থাকলে সাত দিনে ছেড়ে দেবো ভাবছি। একমাস নিয়ম মেনে রেস্টের পক্ষে এই খুপরি ঘরের চেয়ে অত বড় বাংলোর খোলামেলা ঘর অনেক বেশি হেল্পফুল হবে।

সুখবরটা লুফে নিয়ে প্রীতমের কাছে আবেদন রাখলো কৌশিক, অফিসকে জানিয়ে আসতে পারিনি। আমি কি কাল ভোরের কোল্ডফিল্ড ধরে সোজা অফিস যাবো? শনি রবিবার ছুটি আছে, তখন না হয় আবার আসা যাবে।

সকলের সামনেই শ্রুতির সুখ্যাতি করে বসে প্রীতম, শ্রুতি তো কিছুদিন থাকছেই। অরিত্রর সঙ্গে ওর নাকি ফোনে কথা হয়েছে। ও একাই একশো। কাজেই তোর কাজের কোনও ক্ষতি না হয় সেভাবেই আবার আসবি। জয়কেও সঙ্গে নিয়ে যা।

আগের চিঠিতে জানিয়েছিল, ওর কলেজ থেকে তিনদিনের সুন্দরবন ট্যুর আছে। তাছাড়া, ভবিষ্যতে আমি শুনতে চাই না যে আমার অসুখের জন্য ওর রেজাল্ট খারাপ হয়েছে।

কৌশিক আর জয় যে সাত তাড়াতাড়ি সত্যিই চলে যাবে স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি শ্রুতি। পরে অবশ্য বুঝতে পেরেছে, চাকরির বর্তমান লোভনীয় পদ ও পোস্টিংই কৌশিককে যেতে বাধ্য করেছে। একদিন অনুপস্থিত মানেই বাড়তি রোজগার হাতছাড়া।

নিজের সুখ্যাতি শুনতে কার না ভালো লাগে! প্রীতমের মুখ থেকে নিজের সুখ্যাতি শুনতে শ্রুতিরও ভালো লেগেছিল। কিন্তু, প্রীতম ঘরে ফিরে আসার পর নানা আশঙ্কার উৎপাত শুরু হয়েছে। এই যে প্রীতম সর্বক্ষণ শ্রুতিকেই বেশি করে কাছে পেতে চায়। আর আবদার মেনে নিয়ে রোগীর খাবারটা রান্না করতে হচ্ছে। সকাল দুপুর রাত্রে মুখের কাছে অন্ন পথ্য যোগান দেওয়া, পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত সময় বিশেষে হাতের স্পর্শের সেবাযত্ন। আদর অনুগত আচরণ আবার অভিভাবকত্ব করা। এসবের অন্তরালে গহীন গোপন ভালোবাসা তো আছেই। সেটা হয়ত অব্যক্ত অনুভূতির ফসল। অদৃশ্য মধুময় সুবাস। একান্ত হৃদয়গত এসব ব্যাপার রীতি কিভাবে নিচ্ছে কে জানে।

একদিন একান্তে প্রীতম বলে বসলো, আসবে বলেও কৌশিক তো এলো না। তোমারও স্বামী সন্তান সংসার আছে। ভাবছি, তুমি চলে গেলে এমনভাবে কে আর দেখবে।

তুমি তো ক্রমশই আরো সুস্থ হয়ে উঠবে। শ্রুতি বোঝায়, একা চলতে ফিরতে পারবে। শুধু একটা মাস একটু নিয়ম মেনে সাবধানে থাকতে হবে। রীতি তো আছেই।

রীতি আগেও ছিল। তবু তো অনেক কিছু না পাওয়ার দুঃখ ছিল। এই ক'দিনের অসুস্থ সময়ে তুমি একটু একটু করে অনেক দুঃখই মুছে দিচ্ছিলে যে।

বিবাহোত্তর জীবনে হৃদয় মনে জমে থাকা অনেক শূন্যতা অতৃপ্তি যন্ত্রণার কষ্ট কথার ঝুলি খুলে বসে প্রীতম। হৃদয়হীন প্রেমহীন অভ্যাসিক যুগলবন্দী জীবন থেকে বিবাহ-পূর্ব উচ্ছলতার দিকে হাত বাড়াতে চায়। সত্যিকার ভালোবাসা যে আত্মসুখ বিসর্জন আর ত্যাগের সাধনে শ্রুতি তা জানে, মানে। তাই, বাঙ্ময় নীরবতায় আবেগের সুখটাকে বাস্তবমুখী করে তোলে। অতিদর্শনে প্রীতমের প্রেম হারাতে রাজি নয় সে। আবার, অনেক দিনের অদর্শনে অরিত্রকেও হতে দিতে পারে না আর একজন প্রীতম।

*ছবি ঃ ইন্দ্রনীল ঘোষ*

# দিনকাল

ট্যাক্সিটা ছুটছে ময়দান রেসকোর্স ছাড়িয়ে দক্ষিণে শহর উপকণ্ঠের দিকে। পার্ক স্ট্রিটের নামী ম্যানসনের সৌখিন ফ্ল্যাট থেকে ফিরছে চিতেন। হাতে সর্বশেষ দেশলাই কাঠি। প্যাকেটে চাপে চ্যাপ্টা শেষের সিগারেট।

এরকম মুহূর্ত এযাবৎ যতবার এসেছে জ্বালতে গিয়ে কোনবারই ফসকায়নি চিতেন। যে কোন ব্যাপারেই তার নার্ভ খুব স্ট্রং। চিত্ত নিঃশঙ্ক। নিশানায় নির্ভুল লক্ষ্যভেদ। বস্তুত সেজন্যই ব্যবসাটা লাফিয়ে বেড়ে চলেছে।

অনীহায় সিগারেটটি জ্বালায় না চিতেন। ট্যাক্সির সিটে অবসন্ন গা এলিয়ে দেয়। জানলা দিয়ে নরম বাতাস ঢুকছে। চুলে কপালে যেন মা-র হাতের স্পর্শ পায়। তন্দ্রালু চোখে ভাবে, এই তো সেদিনও মা-র ডাকে, স্পর্শে সকালের ঘুম ভাঙত। সংস্কার ছিল, ঘুম-চোখ খুলে মা-র মুখ না দেখলে দিনটা নির্ঘাত মাটি হবে। ব্যবসায় নিশ্চিত মন্দা যাবে।

কোন একদিন শেষতম সিগারেট আর দেশলাই কাঠি হাতেই চিতেনের জীবনের পরিবর্তনের সূচনা। ধোঁয়ার কুণ্ডলীর দিকে তাকিয়ে হঠাৎই জ্ঞানচক্ষু খুলে গিয়ে মনে হয়েছিল, জীবনের বার আনা তো ফুঁকেই ফুরিয়ে গেল। আশি পঁচাশি বছর গড় আয়ুর যুগে ষাটে পা দিলে যদি বার্ধক্য, তা হলে একালে চল্লিশোত্তর বয়সকে বার্ধক্য বলা যাবে না কেন! তাছাড়া বয়স কী শুধু বছরেই বাড়ে? জন্মের পর থেকেই তো সংগ্রাম শুরু। জ্ঞান হতেই সাবালক। পিতৃহীন কতটুকু বয়সে। সেই তখন থেকেই আদিকাকার মুখ চেয়ে অভাবী সংসারের জন্য নিরন্তর সংগ্রামই এনে দিয়েছে অভিজ্ঞতা, পরিপক্কতা। কৈশোর যৌবন কখন যে এল গেল তা টের পাওয়া যায়নি। অকালে বার্ধক্য এসে যাচ্ছিল। দু'টি কবিতার বিশেষ দু'টি লাইন প্রায়শই খুঁচিয়ে দিত। একটি 'লাস্ট টাইম লাস্ট টাইম'। অপরটি 'আই শ্যাল নট পাস দিস ওয়ে এগেইন।' সেই থেকে জীবনটা অন্য মুখে ঘুরে গেছে।

পরিচিত বিশ্বস্ত ট্যাক্সির ড্রাইভার আধো-ঘুমন্ত চিতেনকে বড় সড়কের ওপর নামিয়ে দেয়। জায়গাটা বাড়ি থেকে অল্প দূরত্বের আড়ালে।

বজবজ সড়কের ওপর এই পাকা বাড়িটা আদিকাকার টাকায় বেনামে কেনা।

নিচের তলায় মা থাকেন। ঠাকুরঘর রান্নাঘর কমন বৈঠকখানা---সব নিচে। পরিপাটি সাজানো বাড়তি একখানা ঘর আছে যেটি সব সময় তালাবন্ধ থাকে। বোন ভগ্নিপতি অথবা কোন অতিথি এলে কাজে লাগে। ধনী পরিবারের সুপাত্রে কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয় করে স্বপ্নাকে বিয়ে দিয়েছেন আদিকাকা।

দোতলায় ফ্ল্যাট সিসটেম। পৃথকভাবে দুটি ছোট পরিবারের থাকার উপযোগী উত্তম ব্যবস্থা। দু'টিতে যথাক্রমে চিতেন এবং ছোটভাই হিতেন থাকে। রিটায়ারমেন্টের পর দোতলার ওপর নিজের জন্য পছন্দমতো সৌখিন স্বয়ংসম্পূর্ণ দেড়খানা ঘর করেছেন আদিকাকা। সবার ওপরে আদিকাকা। নিচে অন্য সকলে যেন প্রজা।

বাড়ির সামনে ছোট্ট লন। ফুল বাগিচা গ্যারেজঘর। লন পেরিয়ে গাড়িবারান্দা হলঘর। পাশে পৃথকভাবে দোতলায় যাবার সিঁড়ি। ওপরে কে কখন যায় আসে তা নিচের ঘর থেকে টের পাওয়া যায় না।

দোতলা পর্যন্ত পৌঁছাতে চিতেনকে বেশ কয়েকবার দাঁড়াতে হয়। তার চুল এলোমেলো। জবা রঙ ঢুলু ঢুলু চোখ। মলিন পোশাকে ইতস্তত সিঁদুর লিপস্টিকের ছাপ ছোপ। রণক্লান্ত বিধ্বস্ত বিষণ্ণতায় ভরা দেহ। পা দু'টি ঠিকঠাক চলছে না।

ইস্কুলে যাবার মুখে বাবার সামনে পড়ে চিনু ভীত বিব্রত বোধ করে। কোন রকমে, পাশ কাটিয়ে দ্রুত নিচে নেমে যায়। দীদার কাছে খবরটা পৌঁছে দিতে স্নেহের নাতনিকে বুকে জড়িয়ে তিনি ডুকরে কেঁদে ওঠেন। শব্দটা এত প্রকট যে ওপরে চিতেনের কানে আসে।

কণিকা স্কুলের শিক্ষিকা। স্কুলটা অনেক দূরে হাওড়ায়। রোজকার মত কাকডাকা ভোরে ফার্স্ট বাস ধরে কণিকা বেরিয়ে গেছে। বাইরে রাত কাটিয়ে ঘরে ফিরলে পোষা কুকুরটা সাধারণত চিতেনের কাছে ছুটে আসে। আজ আসেনি।

পাশের ঘর থেকে চিকুর পড়ার শব্দ ভেসে আসছে। সামনের বছর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে। মা-র চাপে পড়ে রোজ ভোররাত্রে ঘুম থেকে ওঠে। উঁকি মেরে চিতেন দেখতে পায়, ঝিমোতে ঝিমোতে আবোল তাবোল পড়ছে চিকু। আজকাল কেমন যেন অন্যমনস্ক উদাসীন হয়ে যাচ্ছে ছেলেটা। একা থাকতে ভালবাসে। দীর্ঘক্ষণ বাথরুমে সময় কাটায়। ইদানিং চেহারা পোশাক আচরণে অভব্যতা নজরে আসছে। হঠাৎ হঠাৎ মেজাজে রোখা চোখা কথা বলে। বেশিরকম রেগে গেলে চোখ মুখে জিঘাংসা ফুটে ওঠে। বাপ ছেলেতে ক্রমশই যেন দূরত্ব বেড়ে চলেছে।

দু' ঘরের ভেতর-দরজার অর্গল বন্ধ করে চিতেন। সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে স্নানঘরে যায়। দীর্ঘসময় সাওয়ারের নিচে কাটায়। তারপর লুঙ্গি পরে ড্রেসিং টেবিলের

সামনে দাঁড়ায়। আয়নার প্রতিবিম্বে বুকের ডানদিকে দু' পাটি দাঁতের সুস্পষ্ট দাগ দেখতে পায়। ছোপ ছোপ রক্ত জমে আছে ইতস্তত। নীপার চুম্বনের দাগ। নখের আঁচড় রেখাও দেখা যাচ্ছে যত্রতত্র। শরীর থেকে বিলিতি সাবান শ্যাম্পু পাউডারের সুবাস ভেসে বেড়াচ্ছে।

চিতেন ভাবে, কামনাটা কার বেশি? নিশ্চিত নীপার। কণিকা ফ্রীজ তো নীপা ফার্নেস। স্বামী থেকে তৃপ্ত নয় নীপা। বজবজে অগাধ পৈত্রিক সম্পত্তি আর ব্যবসা আছে ধীমানের। প্রতি মাসে ভাল অংকের টাকা পায় সেখান থেকে। সেই টাকায় বিলাসী জীবন কাটায়। পেল্লাই ভুঁড়ি, অ্যালকহলিক চর্বি ধীমানের। অল্পতেই নাকি ওর হাঁপ ধরে যায়। কেমন যেন বুড়িয়ে গেছে। মুখে শুধু রোমান্টিকতার নিরুত্তাপ প্যানপ্যানানি। ভালবাসা ভালবাসা। 'বিছানায় কী ওসবের কোন মূল্য আছে! ওসব অক্ষম পুরুষের লক্ষণ।' এসব নীপার মুখে শোনা কথা।

মাঝে মাঝে চিতেনের মনে হয়, ধীমান একটি বিশুদ্ধ গর্দভ। তা না হলে কাব্য-কবিতা গানের জগত নিয়ে এত বেশি মাতামাতি করে সময় কাটায়? দু' চারখানা গান আবৃত্তির রেকর্ড বেরিয়েছে। সিনেমার পত্রপত্রিকায় এক আধবার ফটোসহ পরিচিতি বেরিয়েছে তো ব্যস খোশমেজাজে আছে। যখন তখন বউ ছেড়ে হিল্লি দিল্লি বোম্বে দৌড়ে বেড়াচ্ছে। কী যে পায় কে জানে। একটাই সন্তান। ছেলেটা মামা বাড়িতে থেকে পড়াশুনো করে। একান্ত নিঃসঙ্গ নীপা ঠিকঠাক থাকবে কেন। ভালই তো, নেপোয় মারছে দই।

চিতেনের ব্যবসাটা ইলেকট্রিক গুডস্ ম্যানুফ্যাকচারিং-এর। সেও আদিকাকার টাকায় শুরু। স্মল স্কেল ইণ্ডাস্ট্রিজের মালিক মানেই ফোর লেবার-পাওয়ার্স ম্যান। মালিক হলেও তাকে জুতা সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ করতে হয়।

মাঝে মাঝে মেশিন চালায় চিতেন। বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে লেবারদের সঙ্গে রেজিসটেন্সের তার জড়ায়। প্রায় অর্ধনগ্ন ঘর্মাক্ত অবস্থায় হিটচেম্বারে অনেক রাত কাবার হয়ে যায়। কন্ট্রাক্ট মতো সঠিক সময়ে অর্ডার সাপ্লাই দেবার জন্য কতদিন সময়মত স্নানখাওয়া ঘুম পর্যন্ত হয় না। সুতরাং তার স্লোগান, 'খেটে খাই ষোল আনা তৃপ্তি চাই।' কণিকা অনুযোগের আঘাত দেয়, ' জীবনে শুধু দেহটাই চিনেছো তুমি।'

কণিকা যেন বাড়িতেও মিসট্রেস। স্বামী নয়তো যেন ওর স্টুডেন্ট। সব সময় মেজাজী শাসন গর্জন খবরদারী খিটমিটি। ভাল্লাগে না। বিছানায় অত নিয়মনীতি রুচিই কী ভাল লাগে?

সেক্স ব্যাপারটা যে কোন সংস্কৃতি বা পূজার্চনা নয় তা কোনমতেই কণিকাকে

বোঝাতে পারে না চিতেন। নীপা দারুণ খুনসুটি জানে। ওর শরীরে এতটুকু বাড়তি মেদ নেই। দুটি শরীর মিলেমিশে একাত্ম হয়ে যায়। তৃপ্ত হলে নীপা ইংরেজিতে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে 'য়ুনো হাউ টু প্লে চিতু। এ রিয়েল স্পোর্টসম্যান য়ু আর। ইটস্ এ প্লেজেন্ট থ্রিলিং এনজয়মেন্ট টু মী।' চওড়া বুক পুরুষ্টু ঠোঁট তীক্ষ্ণ নাক চোখ সুশ্রী ভুরু চুল গোঁফ-এর প্রশংসা করে বলে, 'য়ু আর এ রিয়েল হ্যাণ্ডসাম ম্যানলি ওয়ান, হ্যাভিং এভরিথিং ফর লেডি কিলিং।'

'আর ধীমান?' একবার প্রশ্ন করেছিল চিতেন।

'ভেড়ুয়া। বাট সেন্ট পার্সেন্ট জেন্টলম্যান। ইনোসেন্ট পার্সন। নিষ্পাপ শিশুর মতো। য়ু বিলিভ অর নট ইন ফ্যাক্ট কোন নারীকে ঠিকঠাক পেতে গেলে দ্য ম্যান মাস্ট বী নটি।'

থিয়োরিটা চিতেনের বিশ্বাস হয় না। তাহলে কণিকাকে তেমন করে পাওয়া যায় না কেন। কণিকা নটি ব্যাপারটাকে নষ্টামি মনে করে বলে, 'একটুকু প্রেম ভালবাসা সহানুভূতি যদি তোমার থাকত।'

বিয়ে ব্যাপারটাকে আজকাল কেমন যেন প্রেম-ভালবাসাহীন স্বার্থসর্বস্ব মনে হয় চিতেনের। হাজারো ঝক্কি ঝামেলা। কণিকা যেন বিধবা হবেই ধরে নিয়ে ভবিষ্যতের সিকিউরিটির ভাবনায় ব্যস্ত। নইলে স্কুলের চাকরিটা ছাড়ল না কেন! অভাবটা কিসের!

আদিকাকা অকৃতদার থেকে ভাল আছেন তাও মনে করে না চিতেন। ভদ্রলোক দাদার ছেলেমেয়ে বউদির মুখ চেয়ে বিয়ে থা করেননি। দায়িত্ব কর্তব্য ত্যাগে ভরা জীবন। নানা সূত্রে বাড়তি রোজগারের ধান্দায় জঙ্গলের পোস্টিং-এ স্বেচ্ছাকৃত নিঃসঙ্গ কষ্টকর চাকরি করেছেন। বর্তমানে বিষয় আশয় সম্পদে সার্থক পরিপূর্ণ হলেও তাঁকে কী সুখী বলা চলে?

কারখানায় যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছিল চিতেন। ইদানীং সে খেতে নিচে নামে না। ধনিয়া যথারীতি ওপরে খাবার নিয়ে আসে। টেবিলের ওপর সাজিয়ে রেখে বলে, 'খাওয়া হলি কর্তাবাবু আপনারে ডাকিছেন।'

আদিকাকা ডেকেছেন শুনে চিতেন অবাক হয়। অনেক দিন হল দু'জনে দেখা-সাক্ষাৎ হয় না। আগে সকাল সন্ধ্যা দু'বেলা কুকুর নিয়ে বেড়াতে বের হতেন আদিকাকা। তখন দেখা হয়ে যেত। আজকাল নাকি বেশি সময় ঘরের মধ্যেই থাকেন। আসলে জঙ্গলে থাকতে থাকতে কেমন যেন অসামাজিক হয়ে গেছেন। আত্মীয় বন্ধু কারও সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন না। পূজা পার্বণ আনন্দ উৎসবে অথবা কোন শোকসংবাদে বিন্দুমাত্র প্রতিক্রিয়া দেখা যায় না। সব রকম আমন্ত্রণ নিমন্ত্রণ

মুখের ওপর প্রত্যাখ্যান করে দেন। লৌকিকতা সামাজিকতা বিলাসিতার বালাই নেই। ভালমন্দ খাওয়ায় অনীহা অনাগ্রহ। স্বেচ্ছা নির্বাসিত অদ্ভুত আশ্চর্যের মানুষ।

'সাঁঝের ব্যালায় বেরুন বটে, তবে কুকুর নেন না। ফেরেন রাত করে।' আদিকাকা সম্পর্কে সেদিন মুনিয়া কোন এক আগন্তুককে যেন বলছিল। ধনিয়ার মেয়ে মুনিয়া। বছর সতেরো বয়স হবে। আঁটসাঁট সুশ্রী চেহারা। 'ওভাব না থাকলি অ্যাদ্দিনে ব্যে হয়্যে মা হোত।' ধনিয়া শুনিয়েছিল, 'সোমত্ত মেয়ে গাঁয়ে নিরাপদ নয় তাই নিয়ে এনুন। কর্তাবাবুকে দেখভাল করবে।'

চিতেন বুঝতে পেরেছিল, আসলে আদিকাকার কাছ থেকে সবুজ সংকেত পেয়েই মুনিয়াকে আনা হয়েছে। ধনিয়াকে নিশ্চিত ভরসা দেয়া হয়েছে পাত্রটাত্র পেলে বিয়ের টাকার কথা চিন্তা করতে হবে না।

অনেকদিন পর আদিকাকা ডেকেছেন। কিছুকাল আগেও ডাকলে চিতেনের ভয় করত। আশঙ্কা হতো হয়তো কোন ত্রুটিতে শাসন করবেন। আজকাল ভয়টা অন্যত্র। আশঙ্কা—নির্ঘাৎ আবার টাকা চাইবেন। কিছুতেই কারণটা মাথায় আসে না, দুদিন অন্তর এত টাকা দরকার হয় কীসে। রিটায়ারমেন্টের সব টাকাটাই হাতে আছে। ইনসিওর, রেকারিং বণ্ডগুলিও ম্যাচিওর হয়েছে। পেনসনের এক কানাকড়িও সংসারের জন্য খরচ করতে হয় না। অথচ কেন যে ইদানীং কিস্তিতে কিস্তিতে ছোট বড় অঙ্কের টাকা চেয়ে নিচ্ছেন তা কে জানে। বিনা প্রশ্নেই প্রতিবার টাকা নেওয়ার সময় নিজে থেকে আগেভাগে বলে থাকেন, 'ভেব না বিনা কন্ট্রিবিউশনে তোমাদের ঘাড়ে বসে খাচ্ছি। যেটুকু চেয়ে নিচ্ছি সেটাও আমার দেওয়া টাকার সুদের মধ্যেই পড়ে।'

দীর্ঘদিন পর আদিকার ঘরে ঢুকে চিতেন হতবাক। দারুণ সাজগোজ করা হয়েছে ঘরটায়। দেবদেবীর ছবিগুলি সব উধাও। সৌখিন পেলমেট পর্দা ঝুলছে। তিন দেয়ালে সমুদ্র পাহাড় অরণ্যের বর্ণালী সারমাইকা সিনারিও। ঠাকুরের আসনে ইসকনের রাধাকৃষ্ণ। পোর্টেবল ভিডিও কেনার খবরটা নিশ্চিত বাড়ির লোকেরা জানে না। নয়তো পাঁচকান হয়ে কানে নিশ্চয়ই আসত।

বেআব্রু গায়ে আধশোয়া আদিকাকার গলায় রুদ্রাক্ষের মালা ঝুলছে। নানা পরিবর্তন এসেছে চেহারায়। মোটা পেট থলথলে বুক। তোবড়ানো গালে মাংস জমেছে। চোখ তো আর বড় হয় না। সময় বিশেষে প্রস্ফুটিত ডাগর ডাগর লাগে। কোণগুলিতে লালচে আভা নজরে আসছে। মুখে বেশ জেল্লা এসেছে। যৌবনের দ্যুতির মতো চকচক করছে। কত বয়স হবে আদিকাকার? তা পঁয়ষট্টি। ভোগই করেননি, নয় তো এই বয়সটা তাঁর তীর্থ ও ত্যাগের। কিন্তু, চোখমুখ শরীর তো

মানুষের চরিত্রের দর্পণ। বুদ্ধিমান চতুর আদিকাকা কী তাঁর চেহারার মধ্য দিয়ে নিজেকে ধরা দিচ্ছেন? সন্দেহটা বিশ্বাস করতে চিতেনের কষ্ট হচ্ছিল।

পড়ছিলেন আদিকাকা। চিতেনকে দেখে বালিশের নিচে গুঁজে দিলেন। আদিকাকা তো ধর্মের বই পড়েন। তাহলে এত লুকোচুরি কেন। চিতেন একটু অবাক হল। ধন্দ লাগল।

'আমাকে ডেকেছিলেন?' চিতেন সহজ হতে চাইল।

'হ্যাঁ, বসো।'

ইশারায় দূরের টুলটা কাছে এনে বসতে বললেন আদিকাকা। যথেষ্ট রাশভারী গাম্ভীর্যপূর্ণ ব্যক্তিত্বের চোখে চোখ রেখে তাকাতে চিতেনের ভয় করছিল।

'ভালই তো আছ মনে হচ্ছে।' চতুর চাল চাললেন আদিকাকা, 'সব খবরই তো কানে আসে। কোথায় যাও; দিনে কত টাকা ওড়াও। সেজন্য অবশ্য কিছু বলার নেই। পার্টিকে খুশি করতে বা ব্যবসায় ওসব দরকার হয়েই থাকে।'

'এসব কথা শোনাতে নিশ্চয়ই আমাকে ডাকেননি?'

'না।'

'তাহলে? আমাকে এক্ষুণি বের হতে হবে।'

'আসলে আমার হঠাৎ কিছু টাকার দরকার হয়ে পড়েছে। তাই—'

'কত?'

'আপাতত হাজার পাঁচেক। এবার একটু বেশিই চাইছি। খুবই জরুরি।'

এত টাকা কীসের জন্য দরকার তা জানার জন্য প্রবল আগ্রহ হয় চিতেনের কিন্তু আদিকাকার মত লোকের কাছে এ সম্পর্কে কোন প্রশ্ন শুধু অশোভনই নয়, ধৃষ্টতাও বটে। নিজেকে সংযত করে নেয় চিতেন।

'দিন দশেক পরে দিলে চলবে?'

'তাহলে কী এত আগে চাইতুম?'

চিতেন বিব্রতবোধ করে। টেনশনের মাত্রা বেড়ে যায়। সে এখন নানা ঝামেলায় আছে। নানা দাবীতে কারখানার লেবাররা রোজই ধর্মঘটের হুমকি দিচ্ছে। যেকোন দিন থেকে প্রোডাকশন বন্ধ হয়ে যেতে পারে। তেমন কিছু ঘটলে অনেকগুলি বড় অর্ডার হাতছাড়া হয়ে যাবে। হালে বদলি নিয়ে আসা নতুন ইনকাম ট্যাক্স অফিসার কিছুতেই পোষ মানতে চাইছে না। আদিকাকা যে গোড়াতেই দুর্বল জায়গায় ঘা দিয়ে রেখেছেন। তাই এতসব সমস্যার কথা তাঁকে শুনিয়ে কোন লাভ হবে না তা বুঝতে পারে চিতেন।

'অন্তত দু'দিন পরে দিলে?'

'বললাম তো বিশেষ জরুরি। কাল সকালে পেলেই চলবে। তবে তোমার তো আবার সব দিন ঘরে ফেরা হয় না। তাই—'

'ঠিক সময়ে পেলেই তো হল।' বিরক্তি দেখিয়ে অনুমতি চায় চিতেন, 'এবার তাহলে আমি আসতে পারি কী?'

'এসো।'

মেঝেয় দামী কার্পেটের ওপর আসর সাজানো হয়েছে। সুন্দর নকশা কাটা ডিশে চিংড়ি ভেটকি ভাজা। চিলি চিকেন স্যালাড কাজুবাদাম। ছোট ট্যাংরা মাছের ঝাল চচ্চড়ি। পাঁপড় আচার চীজ। ইমপোর্টেড হোয়াইট হর্স বোতল ঘিরে তিনটি স্বচ্ছ কাঁচের গ্লাস। ফ্রীজের বরফঠান্ডা জলের বোতল। পাঁচ পাঁচ পাঁচ নম্বরী সিগারেটের প্যাকেট। সৌখিন লাইটার অ্যাসট্রে ন্যাপকিন।

এসব আয়োজন অধীশের জন্য। স্বার্থের দিকে নজর রেখে হঠাৎ হঠাৎ হিতেনের বন্ধু পাল্টে যায়। নিত্যনতুন বন্ধুর আড্ডা জমে। বহুজাতিক সংস্থার জুতা কারখানায় এতদিন কাজ করে হিতেন বুঝতে শিখেছে, এসব প্রতিষ্ঠানে ওপরে ওঠার কায়দা কানুনই আলাদা। শুধুমাত্র প্রতিভা কর্মদক্ষতা আর নিষ্ঠানীতি নির্ভর নয়। সেজন্যই ড্রইংরুমটা রুচিসম্মত আপ টু ডেট ওয়েল ডেকরেটেড। ব্যক্তিবিশেষকে এন্টারটেন করার জন্য ছোটখাটো বার—ব্যবস্থাও আছে। অধীশ বিদেশ থেকে ট্রেনিং নিয়ে সম্প্রতি এখানকার কারখানায় উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন মর্যাদার পদে বদলি হয়ে আসার পর থেকেই হিতেন পুরাতন পরিচিতির সুবাদে বন্ধুত্বটা ঝালিয়ে নিতে সুযোগ সন্ধানে ছিল। যদিও সে জানে, আজকাল ব্যবসা কিংবা চাকরি ক্ষেত্রে প্রকৃতপক্ষে কেউ কারও সত্যিকার বন্ধু হয়ে ওঠে না। অথচ পরিচিত 'বন্ধু' বলে।

সুযোগটা এনে দিয়েছে অধীশ নিজেই। যদিচ সে ড্রিংকস-এ তেমন অভ্যস্ত নয়, সুন্দর পরিবেশ গুড কম্প্যানি পেলে আপত্তি করে না। তেমনি এক আসরে বসে হিতেনের সামনে একদিন বলেছিল, 'জানিস কী ইচ্ছে করে? বেশ্যাবাড়ি কিংবা বাঈজিবাসা বা নাইট ক্লাবে নয়—মডার্ণ ঘরোয়া কোন পানের আসর বসবে। সেখানে একজন সুশ্রী সুন্দরী নিষ্পাপ মহিলা অন্তত থাকবে। কামগন্ধহীন তার রক্তিম ঠোঁট থেকে স্নিগ্ধ হাসি ঝরবে। চোখ দুটি হবে কাজলটানা স্বপ্নিল। পশমের মতো একরাশ চুল উড়বে। পরনে থাকবে হালকা গোলাপী পোশাক। সেই হাতের পরিবেশিত খাবার পানীয় তন্দ্রালু স্বপ্নময় এক জগতে পৌঁছে দেবে। উফ্ ভাবা যায় না।'

চিয়ার্সে চুমুক দেয়ার পর থেকেই তেমন একজন মহিলার অপেক্ষায় আছে

অধীশ। অথচ আশ্চর্য, চর্চিতা একটিবারের জন্যও এখনো দেখা দিচ্ছে না কেন? কেমন যেন রহস্যময় লাগছে।

বছর তের বয়সের একটি ছেলে হঠাৎ আসরে এসে বসে। হিতেন পরিচয় জানায়, 'আমার ছেলে হিনু। ভাল নাম হিরন্ময়। এতক্ষণ টিউটরের কাছে পড়ছিল।'

হিনু পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে গেলে অধীশ বাধা দেয়। অস্বস্তি বোধ করে। কিছুতেই সহজে হতে পারে না। ইশারায় হিতেনকে কিছু বোঝাতে চায়। ইংগিতটা হিতেন ধরতে পেরে বলে, 'এসবে ও মাইন্ড করে না। সেভাবেই ওকে তৈরী করা হচ্ছে।'

'তবু কেন জানি না আমার ভাল্লাগছে না।' কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিসিয়ে বলে অধীশ।

'এখন তো আর ভেবে লাভ নেই। বী মেরী। ফার্স্ট পেগ কুইক খেতে হয়। ফিনিস ইট।'

'তিন নম্বর গ্লাসটা কার?'

'চর্চিতার।' প্রথম পেগ শেষ হতে দ্বিতীয়বার মদ ঢালতে ঢালতে হিতেন বলে, 'ধৈর্য ধর। একটু পরেই আসছে।'

হিনু টুকটাক খাবার খাচ্ছিল। চর্চিতা আসরে আসতে উঠে ভেতরে চলে যায়। 'দেখলে তো কেমন বিচ্ছিরি মুখ করে উঠে গেল।' চর্চিতা নালিশ জানায়।

শাড়ির পরিবর্তে চুড়িদার পরেছে চর্চিতা। রেডিমেড কেনার জন্য শরীরের সঙ্গে ঠিক মানানসই হয়নি। এতক্ষণ দুষ্টুমিষ্টি হাসিতে অধীশের দিকে তাকাচ্ছিল চর্চিতা। ঠোঁট কামড়ে জিগ্যেস করে, 'দেখতে কেমন লাগছে অধীশদা?'

'গায়ে যেন একটু ছোট হয়েছে মনে হচ্ছে।'

'অনেক দিন থেকেই ওর আব্দার ছিল, চুড়িদার পরে ফটো তুলবে। সারপ্রাইজ দেব বলে না-জানিয়ে আজই কিনে এনেছি।' হিতেন খাটো হওয়ার কারণ দর্শায়।

'হিনু উঠে গেল কেন?' অধীশ জিগ্যেস করে।

'চর্চিতার পোশাকটা বোধ হয় পছন্দ হয়নি।'

তৃতীয় গ্লাসে মদ ঢালতে গেলে অধীশ বাধা দিয়ে বলে, 'এটাও তো অপছন্দ করতে পারে। ওকে বোধ হয় ডেকে আনা দরকার।'

'কেন?' চর্চিতার চোখে বিস্ময়।

'একা নিঃসঙ্গবোধ করতে পারে। আত্মীয় বন্ধু অতিথি এলে, ছোটরাও তাদেরকে কাছে পেতে চায়।'

অধীশের সূক্ষ্ম অনুভূতির যুক্তি হিতেনকে নাড়া দেয়। হিনুকে বুঝিয়ে আদর

করে আসরে এনে বসায়। চর্চিতা খুশি হতে পারে না। আসর ছেড়ে হঠাৎই ভেতর ঘরে যায়। ম্যাক্সি কাম নাইটি পরে আসে। হিনুর চোখমুখে খুশি উছলে পড়ে।

'পিঙ্ক কালারেরটা পরলে তোমাকে আরো বেশি সুন্দর দেখায় মাম্মী।'

'বেশ তো সেটা কালকে পরা যাবে।' চর্চিতা সহজ হয়।

'ভীষণ টায়ার্ড লাগছে।' হিনু বলে, 'এবার আমি ঘুমাবো। মশারী টাঙিয়েছো?'

'হ্যাঁ।'

হিনু চলে যেতে আসর জমে ওঠে। তিনটি গ্লাস এই পূর্ণ তো নিমেষে শূন্য হয়ে যায়। রেকর্ড প্লেয়ারে চিত্রা জগজিৎ গোলাম আলীর গজল বাজে। হিতেন চর্চিতা নিচুস্বরে ঠোঁট মেলায়। চর্চিতা কখনও আধশোয়া কখনও বা হিতেনের কাঁধে মাথা রাখে। কখনও বা হিতেনের জন্য তার কোল পাতা।

অধীশ অস্বস্তি বোধ করে। হাতঘড়িতে সময় দেখে। অনেক রাত হয়েছে। এখনই বেরিয়ে পড়লে হয়তো বা বিপদ এড়ানো যাবে।

ফ্রীজ থেকে একটা বীয়ারের বোতল নিয়ে আসে হিতেন। কোল্ড ড্রিংকস্ খাওয়ার ভঙ্গিতে বোতলটা শূন্য করে ফেলে। শ্রীচৈতন্যের ভঙ্গিতে নাচতে নাচতে বেসামাল হয়ে ডিভানের ওপর উবু হয়ে পড়ে। নিস্তজ হয়ে যায়।

বেসামাল চর্চিতাও। অধীশের বুকে মাথা রেখে নিবিড় করে জড়িয়ে ধরে জিগ্যেস করে, 'আমাকে ভালবাস অধীশদা?'

'বাসি তো।' শ্যাম্পু করা চর্চিতার চুলে আঙুল বুলিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নেয় অধীশ। আশঙ্কা আচ্ছন্ন করে ফেলে। এই অনুষ্ঠানটা সাজানো নাটক নয় তো? হিতেন যদি ঘুমের ভান করে পড়ে থাকে তো মহা সর্বনাশ। ব্লাকমেলের ফাঁদ পাতাও তো হতে পারে। অধীশের বুকের ভিতর মোচড় দিয়ে ওঠে। বড় অসহায় বোধ করে।

'আমি ভাল না অধীশদা?'

'ভাল। খু-উ-ব ভাল।'

'তাহলে এবার থেকে রোজ আসবে?'

'আসব।'

অধীশ চলে যেতে নির্বাক বিষণ্ণতায় চর্চিতা ক্লান্ত হয়ে যায়। ভাবে, একসময় ডিঙি নৌকোয় ভেসে বেড়ানোর মতো জীবন ছিল। সব যেন কেমন গোলমেলে ছন্নছাড়া হয়ে গেল। সেসময় আজকের মত সিগারেট মদ খাওয়া অভ্যাস ছিল না। স্বামীর স্বার্থে বন্ধুজনের কোলে ঢলে পড়তে হতো না। পুরুষদের সঙ্গে সমতালে খিস্তি চুটকী অশ্লীল আলোচনার প্রয়োজন ছিল না। পার্টিতে নাচগান খুনসুটি আর

ভাল করে খেলানো অভ্যাসগুলিতো হিতেনের কাছে শেখা। তার আকর্ষণীয় অঙ্গভঙ্গি জিভঠোঁট চাহনির মাদকতা—সবই তো হিতেনের ওপরে ওঠার পাথেয়।

হিতেন যখন স্কুল-শিক্ষক তখন কী সুন্দর নিষ্পাপ ছিল। সততার জন্য চোখমুখে বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠত। আর এখন? জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান জিনিসটিই খোয়া গেছে। যার নাম চরিত্র।

দুপুরে বুকের ওপর জার্নাল খুলে চর্চিতা শুয়েছিল। কলিং বেল-এর ডাক শুনে ভাবনায় পড়ে যায়, অসময়ে আবার কে?

হিনু এখন স্কুলে। আজকাল হঠাৎ হঠাৎ স্কুল ছুটি হয়ে যায়। হিনু কিন্তু খেলে বেড়িয়ে নির্দিষ্ট সময়েই ঘরে ফেরে। বিয়ের পর কোনদিন আগে ফিরে হিতেন চমক দেয়নি। এত বছর পরে? এখন তো প্রায় প্রতিদিন নানা কাজের অজুহাতে রাত করে ঘরে ফেরে।

দরজা খুলে চর্চিতা অবাক হয়, তর্পিত দাঁড়িয়ে আছে।

'স্কুটারটা হঠাৎ বিগড়ে গেল তাই রাখতে এলাম।' তর্পিত বলল।

'ভেতরে আসবেন না?'

'ফ্রিজ থেকে এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল খাওয়াও তো।' ভেতরে ঢুকে তর্পিত বলে, 'জরুরী কাজে হেড কোয়াটার্স যেতে হবে।'

'রোদ্দুর থেকে এসেছেন, আগে বিশ্রাম নিন তারপর।'

'কত ভাব তাই না?' সোফায় বসে তর্পিত বলে, 'কী করছিলে?'

'মাথার যন্ত্রণাটা বেড়েছে তাই শুয়েছিলাম।'

'পুরনো রোগ। ডাক্তার দেখাচ্ছো না কেন?'

'দেখানো হয়েছে। চেকিং-এ কিছু পাওয়া যায়নি।'

'তাহ'লে?'

'ডাক্তার বলেছেন, সবই নাকি দুশ্চিন্তা থেকে।'

'কীসের এত দুশ্চিন্তা? না করলেই পার।'

চর্চিতা ম্লান হাসে। মনে মনে ভাবে, চিন্তার কী আর কোন অন্ত আছে! একটা চিন্তা তো সাক্ষাৎ সামনে বসে। তা কী কখনও বলা চলে?

ফ্রিজ থেকে দু'পিস সন্দেশ আর ঠাণ্ডা জলের সরবত এগিয়ে দিয়ে বলে, 'রীতের সঙ্গে মিটমাট করে নিন তপুদা। এভাবে আর কতদিন কাটাবেন?'

'এভাবে কাটাব কেন? ভাবছি ডিভোর্স করব।'

বিরোধ থাকতেই পারে, তাই বলে বিচ্ছেদ! চর্চিতা ভাবে, তা'হলে নিজেকে এতটা উদার উজাড় করে দিয়ে কী হল?

'তাহ'লে আমি যে হেরে যাব তপুদা।'

তর্পিত কোন জবাব দিল না। মিষ্টি আর সরবত খেয়ে বলে, 'আজ উঠি।'

'হিতেনের সঙ্গে দেখা হয়?'

'না। যেটুকু ওপরে তুলে দেয়ার ক্ষমতা ছিল সাহায্য করেছি। ওর কাছে আমার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। নিজে থেকে আসে না। তবু ওর ডিপার্টমেন্টে মাঝে মাঝে দেখা করতে যেতাম। অনেকদিন হ'ল আমিও যাওয়া ছেড়ে দিয়েছি।'

'কেন?'

'মনে হয় ও পছন্দ করে না। সব সময় কাজের ব্যস্ততা দেখায়।'

তর্পিতের কণ্ঠস্বর ইমোশনে ভারী হয়ে আসে। চর্চিতার হাত থেকে লবঙ্গ নিয়ে মুখে দেয়। সিগারেটের ধোঁয়া উড়িয়ে বলে, 'তোমার কষ্টটা বুঝতে পারি। ওকে বাদ দিয়ে আমাদের সম্পর্ক ধরে রাখা অসম্ভব তাও বুঝি। আজকাল যখন তখন অসময়ে আসায় ভয় পাও জেনেও কেন আসি জান? তুমি ভীষণভাবে কাছে টান যে।'

চর্চিতা নিরুত্তর নিরুত্তাপ। চোখের কোণে জল চিক চিক করে। তর্পিত চলে যেতে মাথার যন্ত্রণাটা দশ গুণ লাফিয়ে ওঠে। মনের ভেতর তর্পিত তর্পিত ঢেউ খেলে যায়।

চোখমুখে দীপ্ত প্রতিভাময় উজ্জ্বল তর্পিত। স্মার্ট ইজি অ্যাণ্ড ফ্রী মাইণ্ডেড ম্যান। নিখুঁত দাঁতের সুন্দর হাসি। ছোটবেলা থেকেই বড় দুঃখী। অসাধারণ পাণ্ডিত্য। সর্ববিষয়ে অপরিসীম অভিজ্ঞতা। যেকোন সাবজেক্টে ধারাবাহিক বক্তব্য রেখে যেতে পারে। তার অপূর্ব বাচন-ভঙ্গীতে অবিশ্বাস্য গল্পকথাও মোহগ্রস্তের মতো শুনতে ভাল লাগে। তর্পিত-স্মৃতি চর্চিতাকে চিন্তিত অসহিষ্ণু উত্তপ্ত করে তোলে।

চর্চিতার মনে পড়ে, হিতেনকে একদিন বলেছিল, 'মেয়েদের থার্ড আই খুব স্ট্রং হয় হিতু। কেন বুঝতে পারছো না, তোমার স্বার্থের দিকে তাকাতে গিয়ে কত বড় বিপদ ডেকে আনছো। তপুদা নিবিড় করে আমাকে পেতে চাইছেন। ওঁর তৃষ্ণার্ত কাঙাল চোখের দিকে তাকালে আমার ভীষণ ভয় হয়।'

'তর্পিত ইমোশনাল নয়।' হিতেন ভরসা দিয়ে বলেছে, 'তোমার এত ভয় পাবার কিছু নেই। আসলে ও বড় নিঃসঙ্গ অসহায়। ভালবাসার কাঙাল। তোমার সেবাযত্ন আদর আপ্যায়নেই ঠিকঠাক আছে। নয় তো নোংরা পথে গিয়ে নষ্ট হয়ে যেত। ওর সুস্থমতে বেঁচে থাকা তোমার হাতে।'

'হিনু বড় হচ্ছে লক্ষ্য করেছো হিতু?' রাত্রে বিছানায় শুয়ে চর্চিতা জিগ্যেস করে বসে।

'কত বড়?'

'সেদিন স্লিপিং স্যুট কাচতে গিয়ে কী যেন দেখলাম মনে হ'ল।'

'তাই নাকি! এই বয়সটা ডেঞ্জারাস। এখন থেকে ওর ওপর বেশি নজর দিতে হবে তাহ'লে।'

'আজকাল আমাদের কাছে কেউ এলে অথবা আমরা দু'জনে কোথাও গেলে একা নিঃসঙ্গ বোধ করে। শুধু দু'জনে একত্রে থাকলে হিংসে করে। অখুশি হয়।'

'এখন ভেবে কী হবে? ইট ইজ টু লেট। সময় থাকতে আরেকজন সঙ্গী আনতে চেয়েছিলাম। তখন তুমি এতটুকু গুরুত্ব দাওনি।'

'এখন থেকে আমাদেরকেই বেশি সঙ্গ দিতে হবে। বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা ফাড্ডা একদম কমিয়ে দেয়া দরকার।'

'বন্ধু বলতে এখন একা অধীশ। তর্পিত মাঝেমধ্যে আসত। কতদিন হল সেও আসা ছেড়ে দিয়েছে।'

'আজ এসেছিল।'

'এতক্ষণ বলোনি তো! কী বলল?'

'সিঁড়ির নিচে স্কুটার দেখনি? বিগড়ে গেছে তাই রাখতে এসেছিল। সরবত খেল চলে গেল।'

'অজুহাত। ঠিক আমাদের বাড়ির কাছেই স্কুটারটা বিগড়ে গেল? আশ্চর্য!'

হিতেনের মুখ থেকে প্রথম এই ধরনের অবিশ্বাস্য মন্তব্য শুনে চর্চিতার আশ্চর্য লাগে। নিজ অপরাধবোধে সঙ্কোচ বোধ করে। গহীন গোপনীয়তা ধরা না দিতে তৎপর হয়।

'প্রশ্নটা আমারও।' পুরনো কথার প্রসঙ্গ টেনে চর্চিতা বলে, 'হিনু তো কবেই বলেছিল, লোকটা রোজ রোজ আসে কেন মা? বাবার সঙ্গে ক'দিন আর দেখা হয়। তোমার সঙ্গেই তো বেশি গল্প করে। আমি কাছে গেলেই বলে, তুমি ওঘরে যাও মাই বয়। দেখছো তো বড়রা গল্প করছে।'

'তুমি ভেবে দেখেছো কখনও—কেন এত বেশি আসত। এখন পাত্তা দেই না তবু কেন আসে?'

'ভেবেছি। ভেবে যা বুঝলাম তোমাকে বলেছি, বিশ্বাস করোনি। আজকাল তো দেখে মনে হয়, ভীষণ ফ্রাসটেশনে ভুগছে। কেমন যেন নিস্তেজ হয়ে গেছে। রীতিমতো মায়া হয়।'

'এককালে আমারও হতো। আজকাল আর হয় না। দেখলে তো টেণ্ডারলি হ্যাণ্ডেল করে—স্ত্রীর সঙ্গে জুড়তে পারলে? লেট হিম অফ নাও। এরপর হিনু হয়তো বিদ্রোহ করে বসতে পারে।'

'শুধু আমাকে বলছো কেন? তোমার নিজেরও সংযত হওয়া দরকার। অনেক তো ওপরে উঠেছো। সে শুধু আমাকে নিচে নামিয়ে তার বিনিময়ে। আর নয়। অধীশদা যেন এ বাড়িতে আর না আসে।'

মাথার অসহ্য যন্ত্রণায় চর্চিতা ছটফট করতে থাকে। অন্য দিন হলে হিতেন প্রেমভালবাসা উজাড় করে বুকে টেনে নিত। মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে হৃদয়গত অনেক কথা বলত। সান্ত্বনা দিত। পরিবর্তে নির্বাক থেকে আলো নিবিয়ে দেয়। পাশের ঘরে আলো জ্বলছে বুঝতে পারে। হিনু এখনো ঘুমোয়নি বোধহয়। নিঃসঙ্গ বোধ করছে কী? এঘরে অন্ধকারে ডুব দিয়ে হিতেন বুঝতে পারে, চর্চিতার মতো তারও মাথায় অসহ্য ছটফটানি যন্ত্রণা ধেয়ে আসছে।

মেঘলা দিনে অনেকের মন মেঘলা হয়ে যায়। বিশেষত যারা নিঃসঙ্গ তাদেরকে ভীষণ বিষণ্ণতায় পেয়ে বসে। মন উদাসী হয়ে উড়ে যেতে চায়। চোখের কোণ বিন্দু বিন্দু জলকণায় চিক চিক করে ওঠে। দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণায় বুক ভারী হয়ে যায়। অনেক গভীরে তলিয়ে যেতে থাকে। সে বড় ভয়ঙ্কর দুঃসহ সময়। চিকুর এখন সেই সময়।

গুমোট গরমে সকালে ছাদে গিয়েছিল চিকু। আদিদাদু তখন সৌখিন তোয়ালে দিয়ে আদুর বুক ঢেকে দাঁত পরিষ্কারের পর তিন আঙুলে জিভের নোংরা চাঁছছিলেন। হা-করা মুখের গহ্বরটা বীভৎস দেখাচ্ছিল। শব্দটাও বিকট বিরক্তিকর। গারগেলের জল গলায় ঢেলেই চিৎকার করে উঠলেন। ঘরবাড়ি কাঁপানো সেকি চিৎকার চেঁচামেচি। মাঝে মাঝে ইংরেজিতে গালমন্দ। করিডোরে বেসিনের কাছে দাঁড়িয়ে ভয়ে তটস্থ মুনিয়া। ক্ষেপে যাওয়ার কারণটা চিকু বুঝতে পারছিল। জলটা নির্ঘাত কম গরম হয়েছে। নুনের ভাগটাও হয়ত পরিমাণমত হয়নি। তাই বলে সাতসকালে অন্য সকলের শান্তি ভঙ্গ করবেন? মনে মনে গাল পেড়েছিল চিকু, 'বুড়ো বড় বেআক্কেলে।'

তখন থেকেই চিকুর মেজাজটা বিগড়ে আছে। সমাজ সংসার শিক্ষাক্ষেত্রের বিরুদ্ধে তার নানা অভিযোগ ক্রমশই জমাট বেঁধে উঠছে। মাঝে মাঝে মন বিদ্রোহী হয়ে উঠতে চায়। প্রতিকারের পথ খোঁজে।

অল্প বয়স থেকেই এ বাড়ির মানুষজনের হালচাল চিকুকে বয়সীদের মতো গাম্ভীর্য এনে দিয়েছে। তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণশক্তি সন্ধানী দৃষ্টি তার আয়ত্তে। নানা ঘাত প্রতিঘাতে চাতুর্য বুদ্ধি বেড়েছে। জীবন ও জীবন যাত্রার প্রতি দারুণ অবিশ্বাস

জন্মেছে। সাম্প্রতিক তার বড় আবিষ্কার, মুনিয়ার সঙ্গে আদিদাদুর অবৈধ সম্পর্ক। তিনি গোপনে মদ খান ভি ডিও-তে ব্লু ফিল্ম দেখেন। অবসীন অশ্লীল জার্নাল কেনেন। কিন্তু কেন? তিনি তো রিটায়ারমেন্টের পর গীতা উপনিষদ ভাগবতে ডুবে থাকতেন। মা-র কাছ থেকে সঞ্চয়িতা চেয়ে নিয়ে পড়তেন। রাঙা কাকীকে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের বিশেষ কোন পছন্দের রেকর্ড বাজিয়ে শোনাতে বলতেন।

ছাদে অস্থির পা চালিয়ে চিকু পায়চারী করে। ভাবতে থাকে, জীবনের পড়ন্ত বেলায় এসে আদিদাদুর পদস্খলনের কী কারণ থাকতে পারে? নিজেই উত্তর সাজায়। হয়ত ভেবে থাকবেন, সারাজীবন ভোগই করলাম না তো আবার ত্যাগ কীসের। বেশী বয়সে সকলের মনেই বোধ হয় হিসেব নিকেশ আসে। ত্যাগীরা বস্তুবাদী ভোগী হয়ে ওঠেন। বাবার জীবনেও কী একই নিয়মে উল্টোমুখি পরিবর্তন আসছে? দাবীদাওয়া নিয়ে শ্রমিক আন্দোলনে কারখানা বন্ধ হওয়ার পর থেকে বাবা আর বাইরে রাত কাটান না। চোখ মুখে ভাবনা উদ্বেগ বিষণ্ণতা ছেয়ে থাকে। তবু, মা-র সঙ্গে আগের মতো ঝগড়া হয় না। সবসময় ঘরেতেই থাকেন। বইটই পড়েন টিভি দেখেন ক্যাসেটে গান শোনেন। মাঝে মধ্যে বাড়িতেই এক আধটু মদ খেয়ে ঝুল বারান্দায় গা এলিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে থাকেন।

মা এখন আচ্ছা জব্দ। চৈতন্য চেহারার প্রতীক পত্রনবীশ অসময়ে যখন তখন আসতেন। প্রায়ই ফোন করতেন। চিনুর কাছ থেকে বিশ্রী কত ঘটনার সংবাদ শোনা গেছে। যথেষ্ট বয়স হয়েছে চিনুর। একালের ছেলেমেয়েরা অল্প বয়সেই অনেক কিছু বুঝতে শেখে। যেমন সে নিজেও শিখেছে।

চিকু খোঁজ নিয়ে জেনেছে, প্রফেসর পত্রনবীশ নাকি বাংলায় এম এ ডক্টরেট। নানা কাগজে লেখেন টেখেন। সাহিত্যে মা-র প্রবল অনুরাগ। মনে পড়ে, লেখকদের সম্পর্কে বাবা একদিন বিরূপ মন্তব্য করায় বলেছিলেন, 'শিল্পী সাহিত্যিকদের মন রোমান্টিক হয়েই থাকে। তাঁদের সৃষ্টির দিকে তাকিয়ে ওসব ব্যাপার স্যাপার ধর্তব্যের মধ্যে আসে না।' যুক্তিটা শুনতে চিকুর ভাল লাগেনি।

চিকু আজকাল সবকিছুতেই অবিশ্বাসী আর বাতিকগ্রস্ত হয়ে উঠছে। মা যদিও বলেন, প্রফেসর পত্রনবীশ নাকি ওর দূর সম্পর্কের দাদা, চিকুর বিশ্বাস হয় না। আজ পর্যন্ত কোনদিন 'মামা' বলে ডাকতে পারেনি ভদ্রলোককে।

কাকা কাকীই বা ভাল কীসের। হিনুর কাছে তো নাড়ীনক্ষত্র সব শোনা জানা। লনে প্রায়ই একা চুপচাপ বসে থাকে হিনু। যেন কত দুঃখী বিষণ্ণ নিঃসঙ্গ। কারণ জিগ্যেস করলে বলে 'কিছু ভাল্লাগে না দাদা। কোথাও চলে যেতে ইচ্ছে করে।' একদিন কথা প্রসঙ্গে চিকু বলেছিল, 'তোর বাবা মা দু'জনেইতো আর কাজে বেরিয়ে

যান না। এত দুঃখ কীসের?' শুনে কান্নায় ভেঙে পড়েছিল হিনু। অনেক কাহিনী শুনিয়েছিল।

কাকা কাকী নাকি এখনো একসঙ্গে শোয়। হিনুর অসুখ করলেও। অনেক রাত পর্যন্ত বাবা মা-র কথা নানা আলোচনা শব্দ শুনতে পায় হিনু। কাকী অনেক বেলা পর্যন্ত জেগে বিছানায় শুয়ে থাকেন। স্বামীর হাতে তৈরী চা খেয়ে তবে বিছানা ছাড়েন। তারও আগে হাঁটু কোমরের ব্যথায় কাকাকে দিয়ে ম্যাসেজ করিয়ে নেন। পার্টি ফার্টি থেকে ফিরলে তো আর কথাই নেই। মত্ত অবস্থায় মনেই রাখেন না যে, পাশের ঘরে তাঁদের ছেলে আছে। আরো কত কী যে।

হঠাৎই হিনুর ঘরে ঢোকে চিকু। পড়ার টেবিলে বসে হিনু ঝিমোচ্ছে। চিকুর পায়ের শব্দে তন্দ্রা ভাঙে। শব্দ করে পড়তে থাকে। ফিরে তাকিয়েও দেখে না কে এসেছে। হরলিক্স-এর গ্লাস হাতে কাকা এলেন। টেবিলের ওপর রেখে বললেন, 'তুই এত সকালে?'

'দেখতে এলাম ও কেমন পড়ছে।'

'আসতে তো পারিস মাঝে মাঝে। ওকে একটু গাইড করতে পারিস। বড় ভাই হিসেবে তোর একটা নৈতিক দায়িত্ব আছে।'

'আসব। আমার পরীক্ষাটা হয়ে যাক আগে।'

'চা খাবি, না হরলিক্স?'

'কিচ্ছু না। এক্ষুণি চিনুকে স্কুলে পৌঁছে দিতে যেতে হবে। ক'দিন যাবত ওর স্কুলের গাড়িটা আসছে না।'

'চিনি কম দিয়েছো কেন? যাচ্ছেতাই?'

হরলিক্সে চুমুক দিয়ে হিনু চিৎকার করে ওঠে। আজকাল হিনুকে এরকম রোখা মেজাজী কথা বলতে শোনা যায়। ছেলেটা অকাল পরিপক্ক বেয়াদব হয়ে উঠছে। সব কিছুই বাবা মা-র অতি আদরে। কাকা কত সহজে এরকম আচরণ সহ্য করে গেলেন। চামচে করে চিনি এনে ভুল শুধরে নিলেন। আদেশের ভঙ্গিতে হিনু বলল,'পাশের জানলাটা খুলে দিয়ে যেও।'

ভাবটা এমন যেন পড়তে বসে বাবাকে উদ্ধার করছে।

চিনুর স্কুলটা কাকার ফ্যাক্টরী গেট ছাড়িয়ে নদীর ধারে। বাস থেকে নেমে এটুকু পথ পায়ে হেঁটে যেতে হয়। সেই সূত্রে একটা দৃশ্য রোজই নজরে পড়ছে। ফ্যাক্টরীর মেইন গেট বন্ধ হয়ে যাবার শেষ বাঁশির পরও মিছিলের মতো লোক ঢোকে। কিছু লোক রোজই মাইক নিয়ে জড়ো হয়। হাজারো উত্তেজক স্লোগান দেয়। আজও দিচ্ছিল। অজস্র কারখানা-কর্মী এখনো গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে। 'ভেঙে দাও গুঁড়িয়ে

দাও জ্বালিয়ে দাও' স্লোগানে সকলে কণ্ঠ মেলাচ্ছিল।

'ওরা রোজ রোজ এসব বলে কেন দাদা?' চিনু কৌতূহল প্রকাশ করে।

'মালিক ওদের ন্যায্য দাবী মেনে নেয় না বলে।'

'মা বাবা তো আমাদের অনেক দাবীই মেনে নেয় না।' স্লোগানের উত্তাপ গায়ে মেখে চিনু বলে, 'আমরাও বলব তাহ'লে?'

'না।'

'কেন?'

'বাবা মা গুরুজন। তাছাড়া, বাড়িটা তো আর কারখানা নয়।'

'গুরুজনরা বুঝি দোষ করে না? মেজ মামা কত দেরী করে ঘুম থেকে ওঠে। অথচ সবাইকে বলে, বী আর্লি রাইজার। নিজে কত বেলা করে অফিসে যায়। অথচ, তিনদিন স্কুল যেতে লেট হওয়ার নোটিশ দেখে গুড্ডুদাকে কত জোর মেরেছিল।'

'তোর কী তাতে? ওসব ওদের ব্যাপার।'

চিকুর ধমক খেয়ে চিনু চুপসে যায়। ভয়ে আর কথা বাড়ায় না। পায়ে পায়ে স্কুল গেট এসে পড়ে। হাত নেড়ে টা টা জানিয়ে ভেতরে ঢুকে যায়।

চিকু লক্ষ্য করে, স্কুলের সামনে দেয়াল জুড়ে নানা রাজনৈতিক স্লোগান আর রক্ত দেবার শপথ বাক্য লেখা হয়েছে। যাত্রা সিনেমার পোস্টারের কোন কোনটায় মেয়েদের নগ্ন ছবি ছাপা। ছবিতে পুরুষদের হাতে কুডুল ত্রিশূল রামদা ভোজালী অথবা আগ্নেয়াস্ত্র দেখা যাচ্ছে।

এসব দেখেশুনে চিকুর মাথা গরম হয়ে ওঠে। একটা প্রতিবাদ জানানো দরকার মনে করে। পরক্ষণেই ভাবে, হেডমাস্টার জীবন জোয়ারদারকে তো সে চেনে জানে। সক্রিয় রাজনীতির মানুষ তিনি সকালের বাজার সেরে আসতেন তো দেড়ঘন্টা লেটে। স্কুলে স্বনামের দু'খানা বই পাঠ্য আছে জোয়ারদার স্যারের। আবার বেনামে মদের দোকান কয়লার দোকানের লাইসেন্সও আছে। নিজের বাড়িতে বসে কোচিং ক্লাশ করেন। এমনতর লোকের কাছে প্রতিবাদ করে কী আর হবে।

ইদানীং চারদিকের গুরুজনদের জীবন ও জীবনযাত্রা চিকুকে দারুণ বিদ্রোহী করে তোলে। ছোটবেলা থেকেই তার বুকের ভেতর নানা ক্ষোভের পাহাড় জমে আছে। নিয়মের বেড়ি ঘেরা তার জীবনে শুধু শাসন আর শাসন। পড়া আর পড়া। খেলাধুলার এতটুকু সুযোগ নেই। সমবয়সী কারও সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মেলামেশার স্বাধীনতা নেই। ইচ্ছেমত টি. ভি দেখার অনুমতি মেলে না। এই বয়স পর্যন্ত দূরে কোথাও ট্যুরে গেছে মনে পড়ে না। কবিতা লেখা ছবি আঁকায় ঝোঁক ছিল। মা একদিন কান মলে

দিয়ে বলেছিলেন, 'এসবে পেট ভরবে না। ভাল রেজাল্ট হওয়া চাই। নৈলে তলিয়ে যাবে। ডোন্ট ওয়েস্ট টাইম। যাও পড়ো গে।'

কিছুদিন আগে ছোটমাসী এসেছিলেন। ছোটমাসী মহা ফুর্তিবাজ। চটকদার বিলাসী তার সাজপোশাক। বয়কাট চুল। আচার আচরণ প্রসাধনে ষোলআনা সাহেবীআনা। চোখ উল্টিয়ে ভুরু নাচিয়ে ঠোঁট চেপে এমন সব কথা বলেন যেন এদেশে জন্মেই ভুল করেছেন। তার কাছে স্বদেশ স্বদেশী মানেই নিকৃষ্ট। ঘৃণার যোগ্য। বিদেশ বিদেশীমাত্রই সব কিছু যেন ভাল আর আদরণীয়।

ছোট মাসী অসময়ে বাপের শেষ সন্তান। সেজন্য ছোটবেলা থেকেই নাকি ভীষণ জেদী আদরের। অল্প বয়সকালে বাবা মারা যেতে আদরটা দশগুণ বেড়েছে। যদিও মামাবাড়ি চিকুর কাছে অপছন্দের এবং ছোটমাসী এক আতঙ্ক বিশেষ তবু তার জেদ জুলুমে ক'দিনের জন্য চিকুকে যেতেই হয়েছিল।

কলকাতার উল্টাডাঙ্গায় পুরনো আমলের মামাবাড়িটা যেন একটা দুর্গ। ধোঁয়া অন্ধকারময় স্যাতঁসেতে। অনেক শরিক লোকজনের চিৎকার চেঁচামেচি হৈ হট্টগোলে মেসবাড়ির মতো। কাছেই খালধারে বস্তী বাজার খাটাল। অনেকগুলি স্ক্যাপিয়ার্ড গো-ডাউন। ছোটবড় কয়েকটা কারখানা। সমাজ বিরোধীদের নানা অসামাজিক কাজের আস্তানা। যখন তখন দাঙ্গা বোমাবাজি, খুনোখুনি লেগেই থাকে। নোংরা নোংরামির চূড়ান্ত। বাড়িটার ঘিঞ্জি ঘরগুলির ভেতর থেকে আকাশ মাটি গাছগাছালি ঠিকঠাক দেখা যায় না। ক্বচিৎ কাক পাখির ডাক শোনা যায়। লোডশেডিং হলে যেন দম বন্ধ হয়ে আসে।

মামাবাড়িতে সব কিছুই আজব ব্যাপার। তিনটে হেঁসেল থেকে তিন রকম রান্নার গন্ধে বাতাস বিদ্‌ঘুটে ভারী হয়ে থাকে। বড়মামা বেঁচে নেই। মেজমামা বিয়েথা করেননি। বড়মামার সংসার দেখভাল করেন। বিধবা বড়মামীকে নিয়ে কীসব গোলমেলে ব্যাপার স্যাপার আছে। মেজমামা প্রফেশনাল পার্টি করেন। অনেকগুলি কারখানা অফিসের ইউনিয়ন নেতা। ইউনিয়নের কাজের সুবিধার জন্য একটা গাড়িও পেয়েছেন। সেজমামার সরকারী অফিসে চাকরি। যখন খুশি কাজে যান আসেন। ষোলআনা বাবুমশাই। অলস ঘরকুনো। অথচ, জমিদারী মেজাজ। সবসময় তাঁর শাসন গর্জন হাঁকডাক ফরমায়েস লেগেই থাকে।

মামাবাড়ির দোতলার বারান্দায় ঝাউ পাতাবাহারের কয়েকটা টব সাজানো আছে। টবের আড়াল থেকে গুড্ডু খেলনা বন্দুকের গুলি ছুঁড়ছিল। নিচে চৌবাচ্চার আড়ালে পিস্তল হাতে বিট্‌লু দাঁড়িয়ে। টি ভিতে হিন্দী ফিল্ম দেখে তারই অনুকরণে দু'জনের মধ্যে জোর লড়াই চলছিল।

খাঁচার ভেতর বন্দী অনেকগুলি কচিকণ্ঠের কান্নার শব্দ শুনে চিকু দৃষ্টি ফিরিয়ে গগাইকে দেখল। খাঁচার মতো রিকশা ভ্যানে গগাইও স্কুলে যাচ্ছে। কতটুকু আর বয়স গগাই-এর। তা তিন পেরিয়েছে।

গলির মুখে স্কুল ইউনিফর্ম পরা বেশ কিছু ছেলেমেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দেখলেই বোঝা যায়, ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়ে। তাদের হাতে বা গলায় ওয়াটার বটল ঝুলছে। পিঠে সৈনিকের মতো ব্যাগ। যেন যুদ্ধে যাবার অপেক্ষায় আছে। তারা সকলে হাত পা ছুঁড়ে খেলা করার মতো পরস্পর অঙ্গভঙ্গি করছিল। ছেলেমেয়েদের পড়াশুনো নিয়ে অভিভাবকেরা দারুণ সিরিয়াস আলোচনায় ব্যস্ত।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে চিকু এসব দৃশ্য দেখছিল।

'টুমি বোম্ থুড়তে পার?'

প্রশ্ন শুনে চিকু চমকে ওঠে। পিছন ফিরে তাকিয়ে জেলি মাখানো রুটি হাতে ডিকুকে দেখতে পায়।

'না। তুই পারিস নাকি?' একগাল হেসে চিকু জিগ্যেস করে।

'আলবত্ পারি। ডেখবে টুমি?'

আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে অন্দরে ছুটে যায় ডিকু। একটা টেনিস বল নিয়ে আসে। মস্তানি ভঙ্গিতে নিচে বিট্লুর গায় ছুঁড়ে দিয়ে চিৎকার করে ওঠে, 'মা-র-র্ ছালাকে।'

তারপর ওস্তাদি ঢঙে দু'হাত তুলে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে, 'ডেখলে তো বিত্লুদা থতম্। এবার লাস্টা হাপিত করতে হবে।'

'কোত্থেকে শিখেছিস এসব?' চিকুর চোখমুখে বিস্ময়।

'বাবার কাত্ থেকে। বাবার মতন থিস্তিও দিতে পারি। 'হারাম থোর' মানে কীগো দাদা?'

'চোপ।'

চিকুর গা ঘিন ঘিন করে ওঠে। উত্তর না দিয়ে ঘরে এসে খবরের কাগজ খুলে পড়তে বসে। নানা খবর পড়তে পড়তে শুনতে পায়, 'জয় শীরাম। হারাম থোর, তোর থুন পিলুংগা। এই মাটিতে তবর দাও।' বারান্দায় দাঁড়িয়ে নিজের মনে খেলার ছলে ডিকু আরো কত কী যে বলছে।

পরিবেশ দূষণের ওপর আলোচনাটা গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়ছিল চিকু। ডিকু কাছে এসে গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বলে, 'এট্টু, ওষুদ দেবে দাদা? বড্ড মাতা ধরেথে।'

'এটুকু ছেলের আবার মাথা ধরা কীসের?'

'বাবা এলেই ভয়ে মাতা ধরে তা জানো না? তাল রাতে বাবা এতেছিল তো।'

চিকুর মনে দপ করে আতঙ্ক হয়। না জানি ডিকু কীসব কাহিনী শোনাতে শুরু

করে দেবে। ছোটমামার তো আর গুণের অন্ত নেই। এককালে সাড়া জাগানো পাড়া মাতানো মস্তান ছিলেন। বেকার অবস্থায় নিজে থেকে বিয়ে করে বসলেন। সেই অবস্থাতেই ডিকুর জন্ম। বাধ্য হয়ে মেজমামা পুলিশের চাকরিতে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। শহরের উপকণ্ঠে কোন থানায় যেন পোস্টিং। চব্বিশ ঘন্টা স্টেশনে থাকতে হয়। ওরই মধ্যে সুযোগ পেলে হঠাৎ বাড়ি আসেন। তেমনিভাবে হয়তো গোপনে কাল রাত্রে এসে থাকবেন। ভোর হতেই আবার চলে গেছেন।

চিকু ইচ্ছাকৃত নীরব থাকে। প্রতিক্রিয়াহীন নিস্পৃহ নিরুৎসাহী ভাব দেখায়। ডিকু তবু বলে যায়, 'সে এক তাণ্ড। বাবা মদ খেলে থু-উ-ব পালোয়ান হয়ে যায় তো তাই মা-কে খাট থেকে ত্যাংদোলা করে নামালো। এ্যাত এ্যাত টাকা দিয়ে বলল, সব একদিনে তামিয়েছি। মা মেদাদ দেখিয়ে থিল। ব্যাস্ এ্যামন ট্যালালো না! তারপর মা-র বুতের ওপর উঠে তুস্তি তরল। মা একদুম থাণ্ডা। আমি চোক পিত্ পিত্ তরে দেকথিলাম তো তাই ভয় তরলো। ভয়ে চোক বন্দো তরলাম তো সকাল হয়ে দ্যাল।'

নিচে থেকে ছোটমামীর হাঁকডাক শুনে ডিকু তখনকার মত বকবকানিতে ক্ষান্ত দেয়। তা নাহ'লে আরো কত কিছু কেচ্ছা কাহিনী শোনাত কে জানে। ওইটুকু ছেলের মন। এদের বয়সী ছেলেরা কী আর অত বোঝে!

মায়ের ডাক শুনে নিচে নেমে যাবার আগে ডিকু পা বাড়িয়ে দু'কদম পিছন ফিরে আসে। চিকুর প্রায় কানের কাছে মুখ এনে কণ্ঠস্বর নিচু করে বলে যায়, 'পরে আরো মদার মদার দল্প থোনাব।'

বিকেল বেলায় পাড়ার কে একজন কেরোসিন তেল নিয়ে ফিরছিল। বিট্‌লু দেখতে পায়। দারুণ খবর। খেলা থামিয়ে দে ছুট্। সোজা মায়ের কাছে পৌঁছে যায়। কাজের লোক যতীন তখন বাড়িতে নেই। মেজমামী দারুণ ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। এই বুঝি পেয়ে ধন হারিয়ে যায়। টাকা আর কার্ড হাতে চিকুর কাছে ছুটে আসেন। সঙ্গে কেরোসিন কন্টেনার হাতে বিট্‌লু প্রস্তুত। যেন সাগরে মাছ ধরতে যাবে।

কন্টেনারের পর কন্টেনার বসিয়ে বিরাট লাইন পড়েছে ততক্ষণে। পাড়ার মস্তানরা লাইন কন্ট্রোল করছিল। কপাল ফাটা গাল চেরা কানকাটা চোয়াড়ে চেহারার একজনকে দেখিয়ে বিট্‌লু বলে, 'ফান্টাদাকে দেখছো তো—বচ্চন মিঠুনের মতো গায়ের জোর ফান্টাদার। অনেক টাকা গাড়ি বাড়ির মালিক। মস্ত বড় কালীপূজা করে। দশ বিশটা মার্ডার ফান্টাদার কাছে নস্যি ব্যাপার। ফান্টাদাকে সব্বাই ভয় পায়, সম্মান করে।'

কেরোসিন-কন্টেনারের সারিবদ্ধ লাইনের অদূরে রকে বসে ফান্টাদা সম্পর্কে

বিট্‌লু নানা গৌরব-কথা শোনাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, বিট্‌লুর কাছে আদর্শ পুরুষটি বোধহয় তার ফান্টাদা। কুৎসিত চেহারার ওই ব্যক্তিটি সম্পর্কে এত কিছু শুনতে চিকুর ভাল লাগছিল না।

'এসে অবধি দেখছি, পড়শুনোয় তোর একদম মন নেই। সামনে এগজামিন। জীবনে বড় হতে গেলে মন দিয়ে পড়াশুনো করতে হবে যে।' চিকু বলে।

'ধ্যেৎ। পড়াশুনো করে কী কখনও বড় হওয়া চলে?' বিট্‌লু তুড়ি মারে।

'চলে না—কে বলেছে?'

'দেখছি তো চারদিকে। তেমন কাউকেই তো চোখে পড়ে না। বাবা নাকি অনেকদূর পর্যন্ত পড়াশুনা করেছে। এখনো কত বই কিনে পড়ে। তবু তো সবসময় মা গালমন্দ করে, 'অপদার্থ হাঁদারাম। ছোটবড় ভাইরা দু'হাতে চুটিয়ে কামাচ্ছে। আত্মীয় বন্ধুরা নানা ধান্দা করে ফুলে ফেঁপে উঠছে। তুমিই শুধু নিষ্কর্মার ঢেঁকি।'

আর কথা বাড়ায়নি চিকু। অথচ বলার ছিল, 'বড়লোক আর বড় হওয়া এক নয় ভাই।' তারপর বাবা কাকা আদিদাদু আর মামাদের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে বলা যেত, 'তাঁরা বড়লোক হতে পারেন, কিন্তু কতটুকু আর বড়?'

কিছুই বলেনি চিকু। ভেবে দেখেছে, বিট্‌লু তো মিথ্যে কিছু বলেনি। চোখ মেললেই চারিদিকে আত্মীয় অনাত্মীয় নানা গুরুজন। যেন অজস্র গ্রহ তারা উপ-গ্রহের বৃত্ত। দূষণমুক্ত আলোযুক্ত আদর্শপুরুষ ক'জন?

নিরানন্দ বিষণ্ণ চিকু অসম্ভব কষ্ট বুকে যথারীতি সবার আগে দৈনিক পত্রিকার রবিবাসরীয়র পাতা খুলে বসে। 'আমার ছেলেবেলা' প্রিয় ফিচারটায় ম্লান চোখ রাখে। অক্ষর শব্দ বাক্য সমষ্টির গভীরে তলিয়ে যেতে থাকে। নির্মল বাতাস দিশারী আলোর প্রার্থনায় বুক উজাড় করা মুঠো মুঠো দীর্ঘশ্বাস ছড়িয়ে যায়।

*ছবি ঃ অনুপ রায়*

# নাম যশ

মুদির দোকানটা রেল লেবেল ক্রসিং-এর কাছেই। মাত্র দু'পুরুষের ব্যবসা। অথচ, পড়ন্ত জৌলুসহীন অনাদৃত। বিষ্টু মুদিকেও অকালে দেখতে হয়েছে আশি বছরের বুড়োদের মতো। শরীরে খুঁত নেই কোন। পোশাকে অযত্ন। নাকের ডগায় চশমা। তবু, অনেক কিছুই ঠিকঠাক ঠাহর করতে পারে না। অনেক সময় চেনা মানুষকেও চিনতে ভুল হয়। গদিতে বসে যখন তখন ঝিমোয়। খদ্দের এলে ওজনদার ছোকরা হিসেব জুড়তে ডাকে। নয়তো, মশা মাছির অত্যাচারে কিছু সময়ের জন্য ঝিমোনি কাটে। তখন আবার অন্য এক উৎপাত শুরু হয়ে যায়। নানা স্মৃতিকথা নড়াচড়া করে।

আদিতে ছিল চাষবাস। কয়েক বিঘা জমিতে শুধু গোলাপ ফুলেরই চাষ হতো। শোনা কথা, ইংরেজ শাসনকালে বাজার দর সবচেয়ে ভাল ছিল। ঠাকুর্দা নীরুমালীকে চোখে দেখেনি বিষ্টুমুদি। তবে শেষ সময়কার গোলাপ বাগান দেখেই আগেকার অবস্থাটা আঁচ করতে পেরেছে। বাবা পঞ্চুচরণের যদিও হাসকিং মেশিন ছিল, কিন্তু নতুন বৃত্তি সূত্রে হয়ে গিয়েছিল পাঁচু মুদি।

তখন কতটুকু আর জায়গা নিয়ে জুতা কারখানা ছিল? পাশে হুগলী নদী। বজবজ হয়ে ডায়মণ্ডহারবারের দিকে গেছে। তারপর আরো এগিয়ে সাগরে মিশেছে। অন্যদিকে মেটিয়াব্রুজ কলকাতা বন্দর শহর। নদীর ধারে অনেকগুলি ইটখোলা। বাকি গোটা অঞ্চলটাই তো গ্রামঘর চাষ আবাদের জমি জলা পুকুর জঙ্গল আর গাছপালা। ঘরে ঘরে হ্যারিকেনের আলো। উঠোনের তুলসী তলায় প্রদীপ। গাছেদের মাথা ছাড়িয়ে বাঁশের ডগায় আকাশ দীপ। ঘুটঘুটে অন্ধকারে জোনাকির আলো টিপ টিপ। ঝোপঝাড়ে ঝিঁ ঝিঁ ডাকত। অধিক মানুষ জনেরাই জীবন কাটাত চাষ আবাদ আর মাছ ধরে। কেউ কেউ বড়জোর কাজে যেত চিত্তিরগঞ্জের চটকলে। নয়তো কলকাতার রেল অফিসে। মোদ্দা কথা, গোয়াল গোলা আর পুকুর নিয়ে মোটামুটি সরল সুখী জীবন ছিল।

জুতা কারখানা পত্তনের প্রথম দিকে চেক সাহেবরা জীপে চড়ে রাউণ্ড দিত।

সাহেবদের গাড়ি দেখলেই ভয়ে সোমত্ত ছেলেরা দে ছুট। যেন ছেলে ধরা এসেছে। বয়স্ক গার্জেনদের যথেষ্ট বোঝাত সাহেবরা। তাতে কিস্যু ফল হতো না। আর দশজনের মত পাঁচু মুদিও সাফ কথা বলেছিল, ব্যাটা নেকাপড়া করচে। মুচির কাজ করতি যাবে কোন দুঃখ্যুতে। অভাবটা কীসে?

কারখানায় কর্মীর অভাবে সাহেবদের তখন গালে হাত। ব্যবসার পাততাড়ি গোটানোর মত অবস্থা। সব কিছু পাল্টে দিল, দেশভাগ। হিন্দু মুসলমান দাঙ্গায় ঘরে ঘরে তখন রিফিউজি। অভাব অনটন হাজারো সমস্যা। ওপার বাংলা থেকে পালিয়ে আসা নিঃস্বদের পেটের টান। বেঁচে থাকার জন্য যে কোন কাজ একটা হলেই হল। হোক না কেন কাজটা চামড়ার জুতা তৈরি করা। ব্যস, সাহেবদের ফাঁকা জুতা কারখানা ভরাট টইটম্বুর। কারখানা আর নগরের গতর বাড়ছে তো বাড়ছেই। দারুণ রমরমা অবস্থার শুরু। সে সময় বিত্তবানেরাও লোভে পড়ে কোম্পানির কাছে চাষের জমি বিকিয়েছে। সেই টাকায় বড় বড় ব্যবসা হাঁকিয়ে রাতারাতি আঙুল ফুলে কলাগাছ। জমি তো মা। মা-কে কি বিকোন উচিত? পাঁচু মুদির মত আঙুলে গোনা ক'জন মাত্র এই নীতি আঁকড়েছিল।

মাত্র ন'ক্লাস পড়ে ক্ষান্ত দিয়েছে বিষ্ণুচরণ। ওয়াজেদ আলীর 'ভারতবর্ষ' মনে ধরতে বাপের ব্যবসার হাল ধরেছিল। কিন্তু পরে যখন নামটা 'বিষ্টু মুদি' হয়ে গেল সেকি আপশোস। আরও কারণ ছিল। তল্লাটের দাদু থেকে নাতি সক্কলেই ডাকে, 'বিষ্টুদা'। এ আবার কেমনতর? কারখানার চাকরি বাবুদের নজরে মুদি দোকানি যেন কেমন তাচ্ছিল্যের মানুষ। সম্মানে বড় ঘাই লাগত। তখন থেকেই মনের ভেতর গুপ্ত একটা বাসনার জন্ম হলে কী হবে? প্রথম পক্ষ ছিল বাঁজা। কপাল ভাল সে গত হল। তা দ্বিতীয় পক্ষ এসেই কি আর ব্যাপারটা সহজ হল? সে বিয়োন দিতে সময় নিল পাক্কা পাঁচ বছর। দেরিতে হলেও ডুবমারা স্বপ্নটা তখন ভুচুং করে ভেসে উঠেছিল। অনেক দূর পর্যন্ত পড়াতে হবে ছেলেকে। বংশের মুখ আলো করবে জগৎ। গণিমান্যি মানুষ হয়ে নাম ছড়াবে। সেই সুবাদে নামের সঙ্গে জুড়ে বসা 'মুদি' লজ্জাটা বিদেয় হয়ে কি দাঁড়াবে? শ্রীযুক্ত বাবু জগৎ চরণ মালাকার। আহা কি মিষ্টি মধুর নাম।

তা জগৎ-এর সঙ্গে 'মুদিটা' জুড়ে বসেনি বটে। তল্লাট ছাড়িয়ে জুতা কারখানা নগরের লোকজনেও জগা নামেই চেনে। যেমন করে বাপ ঠাকুর্দা হয়েছিল বিষ্টু আর পাঁচু। এটা কোনও ব্যাপারই না। জগা তো আর মুদি নয়। সংক্ষেপে জগা মালাকার। বিষ্টু মুদি তাতেই খুশি। তবে ভাবনা একটা আছে বটে। তাহ'ল একালের লেখাপড়া করা ছেলেদের হালচাল রহস্যময়। মন বোঝা দায়। দিনকালের গতি

প্রকৃতি মোটেই সুবিধের নয়। শিক্ষিত ছেলেদের নানা অপকর্ম দেখছে তো চারদিকে। গা শির শির নিত্যনতুন খবর পড়ছে কাগজে।

জগাটা আবার ধর্মকর্ম মানে না। তবু বারোয়ারি পুজোর বই-এ নামটাম ওঠে। পরাণ তেলির ছেলে হীরুর সঙ্গে সবতাতেই জগার কমপিটিশান। হীরু বাইক কিনল তো ওরও চাই। দিতে হল কিনে। অমনি পথ ধরে, রঙিন টিভি এসেছে ঘরে। হালে মেটেবুরুজের কোন এক বন্ধুর কাছ থেকে বিলিতি টেপ রেকর্ডার পেয়েছে। হীরু লাখ টাকার কালীপুজো করে তো জগাও শুরু করেছে গত বছর থেকে।

তা জগা পারবে কেন হীরুর সঙ্গে লড়াইয়ে নেমে? কতভাবে বোঝাতে চেয়েছে বিষ্টু মুদি; তেল কলের সঙ্গে মুদি দোকান আর হাসকিং মেসিন পর্যন্ত লড়াইটা তবু একরকম ছিল। এখন চাষবাস কোথায়? হাসকিং মেশিন উঠে গেছে। ওদিকে ওরা যে ভিডিও সিনেমা হল করেছে। বেশি রাতে নাকি ব্লু ফিল্মও চলে। শোনা যায়, হীরুটা নাকি হালে হেরোইন চক্রের পাণ্ডাও হয়েছে। দেখা হলে পরাণ কত দুঃখ্যু করে।

বাপের কথা শুনে অবুঝ জগা ভোরের স্বপ্ন দেখায়, আর ক'টা দিন সবুর ধরো। এই সরকার পাল্টি গেল বলে। লেখাপড়া শিখে চাকরির মুখ চেয়ে আর বেশিদিন থাকতে হবেনি। তখন দেখব, হীরু ব্যাটার এত দেমাক কোথায় থাকে।

দুঃখ্যু শুধু একা পরাণের নয়। জেলেপাড়ার বন্ধু সিধু তো সেই ছোটবেলা থেকেই জাল ধরা ঘেন্না করে। কোম্পানির সীমানার কাছে গুদাম করে চা পাতার ব্যবসা করে। আহামরি আয় ছিল না। ছেলেটা ডাগর হতে ভাল গাড়ি বাড়ি হয়েছে। হঠাৎ একদিন দেখা হল। কুশল জানতে চাইলে হাঁটুর ওপর কাপড় তুলে নজর কাড়ল, দ্যাখনা পা দু'টো কেমনতর ফুলেছে। পাপ ধরেছে যে। ভাল থাকার কী আর উপায় আছে?

হাজার কথার মাঝে হঠাৎ নবাব হওয়ার গুহ্য কথাটাও ব্যক্ত করল সিধু। ব্যবসা তো এখন ছেলে পবনার হাতের মুঠোতে। শুধু কিআর চা পাতায় এত টাকা আসে? সিধুর নিশ্চিত বিশ্বাস, অন্য কিছু চালান হয় চা পাতার পেটিতে। কোথা থেকে এত টাকা আসছে শুধুলে পবনা তিরিক্কি মেজাজ দেখায়। বুড়ো বাপকে ধমকায়, তোমার মত সাদা ব্যবসা করলি পেটে ভাত জুটবেনি এ যুগে। কথায় কথায় ভয় দেখায়, জেনেই যখন গেছতো চুপ থাক। উপদেশ দিতে এয়েচো কি ফল ভাল হবেনি। তার চেয়ে আরামে খাওদাও ঘুমোও। বুড়া হয়েছো তো। অযথা মাথা ঘামিয়ে ঝামিলি বাড়াও কেনে?

বুক উজাড় করা দীর্ঘশ্বাস ছড়ায় সিধু, আর বেশিদিন বাঁচবুনি মনে হচ্ছে। হঠাৎ

মরলি পবনাটাকে এট্টু বুদ্ধি দিস। ওর তো তিনকুলে আর কেউ নেই।

পা ফুললেই মানুষ মরে নাকি। বিষ্টু মুদি ভরসা দেয়, অযথা ভাবছিস কেনে? যথাযথ চিকিচ্ছে কর। সব ঠিক হয়ে যাবে।

মনে হয় না হবে। সিধুর চোখের কোণে তর সয় না জলের। মনটাই যে ভেঙ্গে গেছেরে। টাকার পিছনে ছুটতে গিয়ে পবনাটাকে মানুষ করতে পারলুমনি। ব্যাটা বেথা পর্যন্ত করলনি। সে শালাও শুধু টাকার পিছনেই ছুটতে শিখেছে।

ক'দিন পরের কথা। দিনটা ছিল লক্ষ্মীবার। দোকান বন্ধ থাকার দিন। মাল গস্ত করতে যাচ্ছিল বিষ্টু মুদি। ট্রেনে ওঠার মুখে সিধুর মরণ খবরটা শুনে আঁতকে উঠল। দেহটা নাকি পড়েছিল বাড়ির পথে খাল ধারে। পুলিসের সন্দেহ, শ্বাসরোধ করে মারা হয়েছে। অনুমানটা পরিষ্কার হতে লাস পাঠানো হয়েছে মোমিনপুরের মর্গে।

খিদিরপুরে গস্ত সেরে অবাক দৃশ্য দেখল বিষ্টু মুদি। জিনস্ প্যান্ট পরেছে পবনা। পলিয়েস্টার জামার বোতাম খোলা বুক। তাগড়াই গোঁফ। রঙটাই যা কয়লাটে কালো। দারুণ স্বাস্থ্য সুপুরুষ। মেয়েরা তো পুরুষই চায়। মোটর বাইকের পিছন সিটে বসে কোমর জড়িয়ে আছে একটা ধুমসি মেয়ে। অচেনা মুখ। নিশ্চিত নষ্ট চরিত্রের। নয়তো অমন বেসরম সাজে?

মুন্‌শিগঞ্জের মোড়ে দু'পায়ে ভর করে বাইক থামিয়ে সিগারেট কিনছিল পবনা। বিষ্টু মুদির দিকে নজর পড়তে চটজলদি বাইক চালিয়ে দিল। ফুড়ুৎ করে উধাও হয়ে গেল পাখির পাখনার মত চুল উড়িয়ে।

ময়না তদন্তে খুনের প্রমাণ মেলে সিধুর শরীরে। লাশ ছাড়া পেল পরদিন বিকেলে। পবনা তখনো নিপাত্তা। সন্দেহটা অনেকেরই পবনার উপরে। পুলিসের ভয়ে মুখ খুলল না বিষ্টু মুদি। সিধুর বাড়িও গেল না একই কারণে। শ্মশান পথে গিয়ে দাঁড়াল গুটি গুটি বিষণ্ণ পা ফেলে।

টেম্পোর ওপর খাট ফুল আর নতুন কাপড় দিয়ে সাজানো হয়েছে সিধুকে। চন্দন ধূপ অগুরুর গন্ধ ছাপিয়ে বাতাসে দিশী মদের তেজি গন্ধ ভাসছে। অগুনতি শ্মশান বন্ধুর হরিধ্বনি নয়তো যেন মিছিলের স্লোগান। দূর থেকে সন্ধানী চোখ রেখেও পবনাকে দেখতে পেল না বিষ্টু মুদি। কান্নায় বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল। হঠাৎই জগার মুখটা ভেসে উঠল চোখের সামনে। মনে মনে মনস্থ করল, চাকরি একটা পেলেই বিয়ে দিয়ে বেঁধে ফেলবে জগাকে। তবে যদি নিশ্চিত হওয়া চলে।

স্টেশনের লেবেল ক্রসিং থেকে জুতা কারখানা আর নগর অল্প দূরে। সেখানে সব কিছুই আধুনিক আর ঝকমকে। রাতে আলো ঝলমল করে। অথচ, এখানে এখনো সূর্য ডুবলেই ঝটপট অন্ধকার নামে। স্টেশনে আলোর ব্যবস্থা আছে, জ্বলে না। প্লাটফর্মের দু'ধারে রেলের জমিতে গজিয়ে ওঠা দরমা হোগলার বেড়া আর টালির চাল দেয়া অগুনতি ঝুপড়ি। ভেতরে মদ গাঁজা চুল্লু আর সাট্টা জুয়ার আড্ডা বসে। পেট্রোল চিনি চোলাই মদের রমরমা কারবার চলে। ট্রেনের লোক প্লাটফর্ম ছাড়ল তো শুনশান অন্ধকারে গা ছম ছম অবস্থা। স্টেশন চত্বরে হেরোইন পেডলারদের স্বর্গরাজ্য। ওপারে হাওড়া হুগলি থেকে নৌকায় নদী পেরিয়ে এপারে মাল চালান আসে। সন্ধের পর কলকাতার দিক্ থেকে ট্রেন পথে পাতাখোরেরা এসে ভীড় জমাতে শুরু করে। ফিরে যায় রাতের শেষ ট্রেনে। কেউ খায়, আবার অনেকে নিয়েও যায়।

এখন দু'নম্বর প্লাটফর্মে গুডস্ ট্রেনের শেষ ওয়াগনটা লেবেল ক্রসিং ছাড়িয়ে প্রায় ডিসট্যান্স সিগন্যালের কাছাকাছি। ওভার ব্রীজ পার হতে গিয়ে বিষ্টু মুদির গা ঘিন ঘিন করে ওঠে। অন্ধকারে জোড়ায় জোড়ায় বসে কিসব বেলজ্জ নষ্টামিই না করছে। এক নম্বর প্লাটফর্মে প্যাসেঞ্জার ট্রেনটা এমন নিশ্চুপ যে ওপার থেকে নজরে পড়েনি। নিবু নিবু আলোয় যাত্রী ঠাসা বগি। বড় মিটিং খেলা আর দিনের কাজ চুকিয়ে কলকাতা থেকে ফিরছে। কোন বগিতেই পাখা নেই। জানলার কপাট উধাও। দেয়ালে খাবলা তোলা সানমাইকা। সিট নেই অনেক।

কৌতূহলী যাত্রীরা ওপারে দেখছে কি? থমকে দাঁড়িয়ে দু'বগির ফাঁকে দৃষ্টি ফেলে বিষ্টু মুদি। অস্পষ্ট আলোয় কতকগুলি তৎপর ছায়ামূর্তি দেখতে পায়। ওয়াগন ভেঙে অগুনতি চিনির বস্তা নামছে। ট্রেন দু'টির মাঝের আড়ালপথে বস্তাগুলি নিমেষে পাচার হয়ে যাচ্ছে।

এসব ব্যাপার স্যাপার হামেশাই হয়ে থাকে। শান্তিপ্রিয় মানুষেরা না দেখার ভান করে। অথবা সাধারণ দর্শক হয়ে যায়। উপায় কি? গোপন সূত্রে রক্ষক ভক্ষকের দোস্তি যেখানে। বাঘ গরুতে জল খায় যখন এক ঘাটে।

আর এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকা সঙ্গত মনে করল না বিষ্টু মুদি। একটু পরেই হয়তো বখরা নিয়ে ঝগড়া শুরু হয়ে যেতে পারে। বোম পটকা গুলির শব্দ শুনে দোকান পাটে ঝাপ নামবে। বাড়ি ঘর দোরের দরজা জানলা বন্ধ হবে ঝপাঝপ। মারদাঙ্গা সংঘর্ষে তল্লাট জুড়ে তখন চূড়ান্ত অশান্তি অরাজকতার একশেষ। ভয়ে দোকানের পথ ছেড়ে উল্টো মুখে বাড়ির দিকে পা চালাল বিষ্টু মুদি।

পরের দিনটা সকাল থেকেই মেঘলা গুমোট। আজ আবার ফুলবাগানের মাঠে

ভোটের মিটিং। কালে কালে কত কিছুই দেখছে বিষ্টু মুদি। আজকাল ভোট মানেই তো রক্তপাতের যুদ্ধ। জোর যার মুল্লুক তার। ভোটের শেষে একপক্ষ বলবে, ব্যাপক রিগিং কারচুপি হয়েছে। জেতনদাররা দাবি করবে, ভোট হয়েছে সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ নির্বিঘ্নে। জনগণকে আগাম অভিনন্দনও জানাবে।

আজ আর দোকানে বসে ঝিমোচ্ছে না বিষ্টু মুদি। মিটিং নিয়ে সকাল থেকেই আতঙ্ক ছড়িয়ে আছে। বড় ভাবনা হচ্ছে জগাকে নিয়ে। নিরাপত্তার অভাবে দু'দিন ঘরে ফিরছে না ছেলেটা। অস্থির উদ্বেগে ঘন ঘন ঠাকুরের নাম করছে বিষ্টু মুদি।

আজকের মিটিং নিয়ে চাপা উত্তেজনার শুরু ক'দিন আগে থেকেই। আজ সেটা যেন বিস্ফোরক অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। এবারও পঞ্চায়েতের ভোটে গ্রাম সমিতিতে দাঁড়িয়েছে প্রেমানন্দ পাল। ঠাকুর্দাদের কালে দেশের কাজে লোকে সব কিছু উজাড় করে দিয়ে নিঃস্ব হয়ে যেত বলে শুনেছে বিষ্টু মুদি। দেশের কথা ভাবতে গিয়ে বিয়ে করার ফুরসতই পেত না অনেকে। আর এখন? যাদের কিছুই নেই দেশ সেবার নামে তারাই আখের গুছিয়ে নেয় সবার আগে। আর রাজনীতি তো অনেকের কাছেই লোভের বৃত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রেমানন্দ সেই অনেকদের দলে। চরিত্তির যোগ্যতা বলতে কিচ্ছুটি নেই। তবু যা কিছু নামযশ তা পার্টির জোরে।

প্রেমানন্দকে জেতায় সারদাসুন্দরী স্কুলের বুথ। জেতে নস্করপাড়া আর মণ্ডলপাড়ার একচেটিয়া ভোটে। অথচ আশ্চর্য কথা, ওদিকটা সেই অজ পাড়া-গাঁ থেকেই গেছে। তা গাঁয়ের কোন উন্নতি হয়নি বলে ভোটারদের ক্ষোভ অভিমান তো হতেই পারে। ওরা যদি হেড টিচার প্রবোধ মণ্ডলকে নির্দল প্রার্থী হিসেবে দাঁড় করিয়েই থাকে তাতে দোষটা কীসের! প্রবোধ মাস্টার জ্ঞানীগুণী নির্দোষ ভালমানুষ তো বটে। ভাল টাকার চাকরি পেয়েও গাঁ ছেড়ে যাননি। উল্টে নিজের চেষ্টায় স্কুলটাকে বাড়িয়েছেন। গাঁয়ে ডাকঘর এনেছেন। দাতব্য চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছেন। এহেন মানুষ যোগ্য প্রার্থী নয়তো কে? জগা তো ডাক ছেড়েই বলছে, সারদাসুন্দরী স্কুলের বুথে একটা ভোটও পাবে না প্রেমানন্দ। মাস্টারমশাই জিতবেই। প্রবোধ মাস্টারও বলে বেড়াচ্ছেন, জিতি তো জগার জন্যই তা সম্ভব হবে। শুনে হীরু আর কান কাটা কানাইরা হিংসায় জ্বলছে। জগা কিনা ফুলুকে ফেমাস হয়ে যাচ্ছে! পবনাটাও তো প্রেমানন্দের সাকরেদ। সব ব্যাটার যত রাগ ঝাল একা জগার ওপর। সে কেন জগা মুদি হয়ে থাকল না। লেখাপড়া শিখে কেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়তে শিখেছে। জগার মদতে নেতাজী ক্লাবের ছেলেরাই নাকি প্রেমানন্দর অন্যায়ের বিরুদ্ধে নস্করপাড়া মণ্ডলপাড়ার ভোটারদের খেপিয়ে তুলেছে। একে তো প্রবোধ মাস্টার প্রার্থী হতে উদ্বেগে আছে প্রেমানন্দ। তারপর ওরা মিলে তাতিয়েছে, জগা নাকি

ফুলবাগানের মাঠে প্রেমানন্দকে মিটিং করতে দেবে না বলেছে। ব্যস্ প্রেমানন্দরও চ্যালেঞ্জ, মিটিং হবেই। পবনার জন্য আগাম জামিন মঞ্জুর করিয়েছে। থানা থেকে শলা পরামর্শ সেরে এসে সংকেত দিয়েছে, পবনাকে নিশ্চিন্তে ঘরে ফিরতে বল। থানায় ব্যবস্থা পাকা। মিটিং-এ জোরদার সিকিউরিটি থাকবে। টাকা ছড়িয়ে যেভাবে হোক মাঠ ভরা লোক জড়ো করতেই হবে।

সব রটনা মিথ্যে করে শেষ পর্যন্ত মিটিংটা হল অবশ্য শান্তিতেই। কিন্তু, আগুনের ফুলকি উড়ল ভোটের আগের দিন গভীর রাতে। সেই সঙ্গে বোম পটকার শব্দ তো নয় যেন মোস্তাফাদের বাজির কারখানায় আগুন লেগেছে। কিছু সংঘর্ষও হল নেতাজী ক্লাবের ছেলেদের সঙ্গে। বিষ্টু মুদির দোকানটা লণ্ডভণ্ড একশেষ। জগার একটা চোখ গেল প্রবোধ মাস্টারকে বাঁচাতে গিয়ে। জগার দলের জখমের সংখ্যা জনা বিশেক।

এসব ত্রাসের উদ্দেশ্য ছিল, সারদাসুন্দরী স্কুলের বুথে ভোটার আসতে না দেয়া। এক কালে কারা যেন কইত লিখত, বন্দুকের নলই শক্তির উৎস। তাই বলে কি মানুষকে দাবিয়ে রাখা চলে? জনবল বড় বল বটে। সবচেয়ে বড় শক্তি যে চরিত্তির বল। নইলে প্রেমানন্দর চেষ্টাতে তো আর ঘাটতি ছিল না। কিন্তু, শেষ পর্যন্ত জিতল তো সেই প্রবোধ মাস্টারই।

ফুলবাগানের মাঠে যেন আর লোক ধরে না। যেন উৎসব মেলা বসেছে। যন্ত্রণায় কষ্টকাতর জগার জন্য আজ বিশেষ ব্যবস্থা। একা চেয়ারে বসে আছে। মাথা ঘুরিয়ে বাঁধা চোখের ব্যাণ্ডেজ। পাশে দাঁড়িয়ে মালার পর মালা পাচ্ছেন প্রবোধ মাস্টার। সেই মালা তিনি তক্ষুণি জগার গলায় ঝুলিয়ে দিয়ে বলছেন, আমার এই জয়ের জন্য জগা কানা হয়েছে। এ মালা ওরই প্রাপ্য সবার আগে।

হাজার মানুষের ভীড়ে মিলেমিশে দাঁড়িয়ে আছে বিষ্টু মুদি। এই মুহূর্তে, দূর থেকেও সব কিছু ঠিকঠাক ঠাহর করতে পারছে। বংশের মুখ আলো করা ছেলের গর্বে অভিভূত জন্মদাতা সে। অদ্ভুত এক রোমাঞ্চকর সুখের অনুভূতি তার শরীর জুড়ে। কিন্তু, মনে একটি মারাত্মক আশঙ্কাও উৎপাত শুরু করেছে, শেষ পর্যন্ত ছেলেটা না 'কানা জগা' হয়ে বসে।

*ছবি ঃ ইন্দ্রনীল ঘোষ*

# সাঁকো

বিছানায় শুয়ে শান্ত ভোরের বুক বিদীর্ণ করা চাপা চি চি কান্না শুনে, চমকে উঠেছিল শোণিমা। তখন থেকেই অশুভ আশঙ্কায় বিব্রত বিরক্ত বোধ করছিল। বেলা যত বাড়ছিল, অষ্টমীর আচরণও ক্রমশ অসহনীয় হয়ে উঠছিল।

ক'দিন আগে ছোট মেয়ে অঘ্রানীকে নিয়ে কীসব অলক্ষুণে স্বপ্ন দেখেছে অষ্টমী। সেই থেকে বায়না ধরে আছে, দেশ গাঁয়ে যাবে। শোণিমা নিজে স্কুলের শিক্ষিকা। সকাল ন'টার মধ্যে প্রিয়ঙ্করকে অফিস যেতে হয়। ঘরে পনেরো মাসের দামাল দুষ্টু ছেলে আপ্পু। একা এতসব ঝক্কি ঝামেলা সামলাবে কেমন করে। এই মুহূর্তে অষ্টমীকে ছেড়ে দিতে রাজি হয়নি শোণিমা। চোখের জল আর নাকে শব্দতোলা ছিঁচকাঁদুনিতে কাজ না-হওয়ায় কাল বিকেল থেকে বিশ্রীরকম মেজাজী আচরণ শুরু করেছে অষ্টমী। গোঁসা করে রাতে খাবার পর্যন্ত খায়নি।

বেশ বেলা পর্যন্ত চা জল স্পর্শ করেনি অষ্টমী। অস্পষ্ট বিড় বিড় শব্দে কীসব গালমন্দ অভিসম্পাত করছিল। ঢিমেতালে কাজ করে যাচ্ছিল। কাজের ফাঁকে ফুরসত পেলেই হাঁটুর ভাঁজে মুখ গুঁজে কাঁদছিল। শুনতে মরা কান্নার মতো লাগছিল।

শোণিমা ধৈর্য হারালো 'তোমার ভাবগতিক ভাল  লাগছে না অষ্টমী। সাত-সকাল থেকে কী যে মরাকান্না শুরু করেছ। বলেছিই তো, কাজের নতুন লোক পেলেই তোমাকে ছেড়ে দেব।'

'মুই কী তোমাদের কাজ ছেড়ে দেব বলেছি যে নোতুন নোক দেখতে হবে?' অষ্টমী প্রশ্ন রাখল।

জবাবে সিঁদুরে মেঘের ডরের কারণটা খোলাখুলিই বলল শোণিমা, 'ওসব চালাকির কথা থাক। একবার গেলে যে আর ফিরে আসবে না তা আমার ভাল করেই জানা আছে।'

'বিশ্যেস কর বৌদিমণি, মেয়েটাকে একবারটি চোকের দ্যাকা দেকেই ফিরে এসবো। লিশ্চিত এসবো।'

'বিশ্বাস—তোমাদেরকে?' শ্লেষাত্মক তাচ্ছিল্যের ঠোঁটে শোণিমা বলল, 'ঢের দেখা আছে। ভালবেসে যতই যত্নআত্তি করি না কেন তোমাদেরকে কিছুতেই বাঁধা

যায় না। স্বামীর মিথ্যে মিষ্টি দু'চারটা মন ভোলানো কথা শুনলেই সব অত্যাচার অপমান লাঞ্ছনা ভুলে যেতে তোমাদের এতটুকু সময় লাগে না।'

'সে আর দুষের কী গো বৌদিমণি!' অবাক অষ্টমী না-বুঝে মুখের ওপর বেফাঁস বলে বসল, 'সোয়ামী বলে কতা। নেকাপড়া করা ভদ্দর নোকেদের বউদের মতন হতি পারিনে যে।'

শোণিমা হতবাক। লজ্জায় স্তব্ধ বিমূঢ়। ম্লান বিষণ্ণ চোখ চেয়ে প্রিয়ঙ্করের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

প্রতিদিনকার মতো অ্যাটাচি কেসটা এগিয়ে দিয়ে বিচার চাওয়ার ভঙ্গিতে অষ্টমী বলল, 'আপনি যা হোক একটা বিহিত করুন দাবাবু।'

অফিসে বের হবার মুখে প্রিয়ঙ্কর অপ্রস্তুত। চতুর বুদ্ধিমান অফিসার হিসেবে সে প্রথম থেকেই বুঝতে পারছিল, অষ্টমীকে শেষ পর্যন্ত কিছুতেই ধরে রাখা যাবে না। এভাবে বেঁধে রাখার চেষ্টা উচিত কাজ হচ্ছে না। তবু, ইচ্ছাকৃত নিস্পৃহ উদাসীন থাকার একটিই কারণ। কাজের লোক জোটানো যে কত কষ্টের তা সে অষ্টমীর বেলায় হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছিল।

শোণিমার তখন ভরা মাস। আগেকার কাজের বউটা দু' দিনের ছুটির নাম করে সেই যে দেশে গেল তো আর ফিরল না। পরে খবর পাওয়া গিয়েছিল সে নাকি স্বামীর সঙ্গে ফের ঘর সংসার শুরু করেছে। আকাশ ভেঙে পড়া মাথা নিয়ে নতুন কাজের লোকের সন্ধানে সে প্রায় হন্নে হয়ে পাগল দশা। নিরুপায় হয়ে অফিস পিওন ষষ্ঠীপদকে শুধু পায়ে ধরতে বাকি ছিল।

শেষ পর্যন্ত সেই তার গাঁয়ের অষ্টমীকে জুটিয়ে দিয়েছে। প্রয়োজনের গুরুত্ব বুঝে অষ্টমীর প্রস্তাবমতো তার ছ'বছরের মেয়ে অঘ্রানীর দায়িত্ব নিতেও রাজি ছিল প্রিয়ঙ্কর। শেষ পর্যন্ত আদরের নাতনিকে ছাড়েনি অষ্টমীর শাশুড়ি। একাই এসেছে অষ্টমী। অষ্টমী এল তো ষষ্ঠীপদ অন্যত্র বদলি হয়ে গেল। সমস্যাটা আরও জটিল হয়ে দাঁড়িয়েছে সেজন্য।

অচলাবস্থার আশঙ্কায় আগাম সামাল দিতে প্রিয়ঙ্কর বলল, 'ফিরে এসে যেন শুনতে পাই তুমি খেয়েছ। যদি ছুটির ব্যবস্থা করতে পারি তো আমি নিজে তোমাকে নিয়ে যাব। মেয়েকে দেখিয়ে নিয়ে আসব। এই সুযোগে আমারও তোমার দেশ গাঁও আর সমুদ্র দেখা হয়ে যাবে।'

ধর্মতলা থেকে এক্সপ্রেস বাসে সাড়ে তিন ঘন্টা সময় লাগে। সেখান থেকে খেয়া পেরিয়ে ফের লোকাল বাসে প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিটের পথ। সমুদ্রের কাছাকাছি

অষ্টমীর দেশ গাঁয়ের নাম অমরাবতী।

অফিস থেকে ফিরে প্রিয়ঙ্কর বলল, 'খুব ভোরে উঠতে হবে অষ্টমী। ফার্স্ট বাস ধরতে না-পারলে পৌঁছাতে দুপুর হয়ে যাবে।'

প্রিয়ঙ্কর যে সত্যিই নিজে অষ্টমীকে নিয়ে তার গ্রামে যাবে স্বপ্নেও ভাবেনি শোণিমা। চোখ ছল ছল বিস্ময়ে বলল, 'এইটুকু ছেলেকে দিয়ে একা আমাকে রেখে যাবে তুমি?'

'কী আর করা যাবে বল?'

'ষষ্ঠীপদকে খবর পাঠালেই তো পারতে। সে এসে নিয়ে যেত। ক'দিন দেরি হলে কী এমন মহাভারত অশুদ্ধ হত।'

'তা অবশ্য হত না। ষষ্ঠীপদ নিয়ে যেত ঠিকই, কিন্তু অষ্টমী আর ফিরে আসত না।' শোণিমাকে বুকে টেনে নিয়ে প্রিয়ঙ্কর সহজ করে বোঝাল, 'আমি নিজে নিয়ে গেলে অষ্টমী ফিরে আসতে বাধ্য হবে। সেজন্যই যাব।'

শোণিমা আর কোনও বাধা হয়ে দাঁড়াল না।

শহরে কাজে আসার পর এই প্রথম গাঁয়ে যাচ্ছে অষ্টমী। অনেক রাত পর্যন্ত কাপড়ের পুঁটুলিতে সাত রাজ্যের ধন গোছগাছ করেছে। বাকি রাত অদ্ভুত এক উত্তেজনায় ঘুম হয়নি। বাসে বসে তন্দ্রালু চোখে ভাবছিল, মাটির দাওয়ায় পা ছড়িয়ে বসে গর্বকথা শোনাবে, 'মোকে নিয়ে বৌদিমণির সঙ্গি দাবাবুর কী যে বাদবিতণ্ডা। বৌদিমণি বলে কিনা, কাজের নোককে সঙ্গে নেঁ যেতে লজ্জা করবেনি? নোকেই বা কী ভাবব্যে। তারচে চেনা নোক দ্যে পেইঠ্যে দাও। দাবাবুর হক কতা, অষ্টকে কতা দিইচি, বিশ্যেস ভঙ্গ করতে পারবনি। তা শেষমেশ এলেন তো বটে।'

ফার্স্ট বাসটা ছেড়েছিলই নির্দিষ্ট সময়ের একঘন্টা পরে। পথে একবার টায়ার বদলাতে হল। তারপর কীসব যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দিল। সারা পথ খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলার মতো গতিতে আরও দেড় ঘণ্টা দেরিতে পৌঁছালো। খেয়াঘাটের চালাঘর হোটেলে অষ্টমীকে খেতে বলল প্রিয়ঙ্কর। সে খেল না। প্রিয়ঙ্কর একাই মাছ ভাত খেল।

গাঁয়ের বাস স্টপে নেমে দ্রুত হাঁটছিল অষ্টমী। হাঁটাতে ভীষণ ঠমক। শোণিমার দেওয়া মলটা পা থেকে শব্দ ছড়াচ্ছিল। কিছুটা দূরত্বে প্রিয়ঙ্কর। দীর্ঘ লম্বা চেহারার পুরুষ। মাখনের মতো গায়ের রং। চোখে সান গ্লাস। পরনে শাদা টেরিকটের কুর্তা পায়জামা। কাঁধের ঝুলন্ত ব্যাগে রাত কাটানোর মতো টুকিটাকি জিনিসপত্র। কোলাপুরি চটি পরতে গিয়েছিল, অষ্টমী বারণ করেছে: 'ধুলা হবেগো দাবাবু। নাগরা জুতুডাই

ফরুন।' এতদিনে অনেকক্ষেত্রে অষ্টমীর পছন্দ অপছন্দ মতামতে চলতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে বলে শেষ পর্যন্ত সখের শৌখিন নাগরা জুতোই পরে এসেছে।

পায়ে পায়ে ধুলো উড়িয়ে পাখনা ওড়া পাখির মতো হাঁটিছিল অষ্টমী। পাকা সড়ক থেকে নিচে নেমে সহজ সোজা আলপথ, মেঠো পথ ধরে, ভাঙা পথের ধুলোয়। কখনও বা বাঁধের ওপর দিয়ে।

গতিতে অনেকটা পিছিয়ে পড়েছিল প্রিয়ঙ্কর। সাঁকোর মুখে অপেক্ষায় ছিল অষ্টমী। হাত বাড়িয়ে বলল, 'ধরেন গো দাবাবু। ডর কীসে—সাঁতার তো ঝানেন।'

সাঁতার না-জানলেও প্রিয়ঙ্কর ভয় পেল না। যেভাবে নিঃসঙ্কোচে দ্বিধাহীন হাত ধরে সাঁকো পার হল তা এক দৃশ্য বটে।

সাঁকো পেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে অষ্টমী ভাবছিল, দাবাবু ঝ্যানো রাজপুত্তুর। এমনতর নোকের সঙ্গি হাঁটতে পারা গব্ব সুখ আলন্দের। ভাগ্যের কতা। এও তো জেবনে এক স্বপন বটে।

এক চিলতে শীর্ণ নদী। উপোসী খালবিল। ঠা ঠা রোদ্দুর। জলাজমি ক্ষেতজমি ফেটে চৌচির। ইতস্তত সাপের গর্ত দেখিয়ে অষ্টমী বোঝাচ্ছিল, 'অ্যাখুন সাপ ধরার সময় গো দাবাবু। চড়া রোদ্দুরের আগে হলি দেখতি পেতেন গর্তর মুখে ইঁদুর ব্যাঙ ধরি খাবে বলি ক্যামন ওৎ পাতি আছে। সাঁপুড়েরা তো সিসময়েই খপ করি ধরি ফ্যালে।'

মনসার থানে বুড়ো বটগাছ। ছায়ায় বসে জাল বুনছে মোহন্ত। গাইগরু পুকুর বাড়ি আর অনেক জমি জিরেতের মালিক মোহন্ত। মাঝে মাঝে সমুদ্রে মাছ ধরতেও যায়। মেয়েমানুষের ওপর ভীষণ কুনজর। সর্বনাশা লিক লিক লালসার জিভ। এক কালে অষ্টমীর পিছনে লাগত। সর্বক্ষণ তক্কে তক্কে থাকত। ভাল ভাত কাপড় গয়নার সংসার পত্তনের লোভ দেখাত। নিজের শরীরের নানা অংশের মাসল দেখিয়ে বলত, 'কী আছে তোর বংশীর শরীলে? একটা ভড় যেন।'

মোহন্ত পঞ্চায়েতের লোকও বটে। ভক্তিতে নয়, তল্লাটের মানুষজন মান্য করে ভয়ে। কিন্তু মহাপূজার দিন জন্মেছিল বলেই না নাম অষ্টমী। অসুর মোহন্তকে সে ডরাবে কেন? মোহন্ত কিছুতেই পাত্তা না-পেয়ে গাল পেড়েছিল, 'বড় সতী সাবিত্তির রে।'

অষ্টমীর মনে নানান স্মৃতি ঘাই মারছিল।

ধূর্ত মোহন্ত বেল বেল চাউনিতে বলল, 'সেই তো আসতি হল অষ্ট ; তবে কেনে মুখ পোড়ালি গাঁ হাসালি?'

রাগে ফুঁসে উঠে খিস্তি দিতে যাচ্ছিল অষ্টমী। দাবাবু সঙ্গে থাকায় নিজেকে

সামলে নিল। শান্ত সংযত জবাব দিল, 'থাকব বুলে তো এসিনি। সক্কলের খপারাখপর নিতে এনুন। তোমাদের খপর ভাল তো খুড়ো?'

'খুড়ো' বলায় আহত অখুশি মোহন্তর মুখে কুলুপ পড়ল। রাগ ক্ষোভের জ্বলন্ত চোখে অষ্টমীর সঙ্গী অচেনা পুরুষটিকে বার কয়েক জরিপ করল। তারপর বিড়িতে গভীর টান দিয়ে বলল, 'হুঁ ভাল।'

মনসার থান থেকে দু' ক্রোশ দূরে অষ্টমীর দেশ গাঁ। জন্মভূমি পিতৃভূমি। আত্মীয় পরিজন। রক্ত-নাড়ীর সম্পর্ক যত। বিশ ঘরের বসত। দুই দিঘি আর পাঁচু মান্নার ডাঙা জমির ওপারে অন্য গাঁ। শ্বশুরের ভিটেমাটি। সেখানে সোয়ামী সতীন সন্তান সংসার। নান সুখ দুঃখ্যুর স্মৃতি।

উদাসী হয়ে যাচ্ছিল অষ্টমী। বড় বেটি পারু পরামর্শ দিয়েছিল, 'তুই পেইলে যা মা। নৈলে বাপ তোকে মারি ফেলবে।'

বুক উজাড় করা দীর্ঘশ্বাস ওড়াচ্ছিল অষ্টমী। ভাবছিল, পারুর বাপ তো খারাপ ছ্যাল না। রেতের ব্যালায় গাঁজা আফিং তাড়ির নেশায় একটু পিট্‌তো টিট্‌তো। তাই বলে সোহাগ তো কম করতোনি। না-হলি তিন ব্যাটা বেটি হল ক্যামনে!

অষ্টমীর এখনও বিশ্বাস, ভাল মানুষটাকে অর্জুনকাকাই গুণ করেছে। বেওয়া মেয়েটাকে শেষমেশ গছালো তো বটে। পথ চলতে এক টুকরো স্বপ্ন দেখল অষ্টমী। অ্যাদ্দিনে যদি অর্জুনকাকার কুমতলবটা ফর্সা হয়ে থাকে, তো পারুর বাপ বলতি পারে, 'থাক না পারুর মা। এবার থিকি আর যাতনা দিবুনি। যা করেচি সিতো বয়সের দুষে। মরদরা উসব এক আধটু করেই থাকে। তা বুলে কী মাগ ভাতারে সম্পক্কো থাকবেনি? ঈ ক্যামনতর কতা!'

ক্রমশ বেলা বাড়ছে। ধূসর তামাটে আকাশ যেন কোলশূন্য বুকের মতো বিষণ্ণতায় ভরা। খড়ের তড়পা বোঝাই গরুর গাড়ির চাকা থেকে কান্নার শব্দ ভাসছে। কাকপক্ষী পোকামাকড় সব বেপাত্তা। দু' একটা চিল চক্রাবর্তে উড়ছে। গাছের আড়াল থেকে ঘুঘু ডাকছে। মানুষজনশূন্য বিবাগী মাঠ। পথের ধারে কাঁটালতার ঝোপঝাড়। বৈঁচি আকন্দ ধুতুরা গাছ। শেকুল খেজুর নারকেল গাছের ছড়াছড়ি। বুড়ো কদ্দবেল গাছের ছায়ায় একটা কুকুর ঘুমোচ্ছে।

সূর্য এখন মাথার ওপর। ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুরে তেতে আগুন প্রিয়ঙ্কর। গলা শুকিয়ে কাঠ। তালু ফাটার মতো অবস্থা। দমকা হালকা হাওয়ায় নিঃশ্বাসে কষ্ট। অনভ্যস্ত এতটা পথ হেঁটে ক্লান্ত বোধ করছিল। অষ্টমীর বেলায় ঠিক তার উল্টো। গাঁ যত এগিয়ে আসছে সে যেন মুক্তডানা কিশোরীর মতো খুশিতে ডগমগ। কুল কুল হাসিতে ভরপুর। কষ্টের পথ বৃক্ষহীন অনাবাদী জমি অনায়াসেই পেরিয়ে যাচ্ছিল।

নয়নজুলির জল বেঁধে মাছ ধরছে ক'জনে। পুঁটি পাবদা আর নানারকম জিওল মাছ উঠছে। একগণ্ডা উদোম ছেলেমেয়ে গুগলি ঝিনুক কুড়োচ্ছে। নজর এড়িয়ে কিছু কুঁচো মাছও ওদের কোঁচড়ে। অষ্টমী বলল, 'গ্রীষ্ম না হলি বিলখালে অ্যাখুন বুনো হাঁস দেখতি পাতিন গো দাবাবু।'

'এখান থেকে সমুদ্র কতদূর?' প্রিয়ঙ্কর জানতে চাইল।

'নিকটেই। আওয়াজ শুনতে পারছুননি?'

'পারছি বলেই তো জিগ্যেস করলাম। সমুদ্র দেখেছ কখনও?'

'তা আর দেখবুনি! ছোটব্যালা থিকিই তো দেকচি। দিনি দিনি কত পরিবর্তন হল। ত্যাখুন তো লোকজন আসতুনি। অ্যাখুন শহর থিকিন কত নোক ফুর্তি করতে এসেন। সঙ্গে সোন্দর সোন্দর মিয়াছেলে থাকে।'

'এত খবর জানলে কেমন করে?'

'ভাসুর ঠাকুরের হোটেল আছে যে। সিবার য্যাখন ভরা পেটে নাতি খেয়েছিনুন নালিশ জানাতে গ্যেছলুম। এক রাত্তির ছিনুন। শুনেচি অ্যাখুন আরও সোন্দর হয়েচে।'

এক প্রশ্নের জবাবে অষ্টমীর ঠোঁটে হাজার কথার ফুলঝুরি। সমুদ্রের জলে ঢেউ নৌকা মাছ পাখি ঝাউবনের হরেক কথা। ভাসুরের দারুণ ভাল অবস্থার বর্ণনা। মাত্র দু'বছরের রোজগারে ভাসুর নাকি বিশ বিঘে ধানজমি বাড়িয়েছে। স্যালো মেশিন, হাসকিং মেশিন বসিয়েছে। চাষ আবাদের জমিঘেরা বাড়িটাই আগে হোটেল ছিল। এখন সেটাকে পাকা বিশাল হোটেল বাড়ি বানিয়েছে। কপিকল লাগানো ইঁদারা থেকে মোটরে জল ওঠে এখন। সেই জল লোহার নালি দিয়ে ঘরে ঘরে পৌঁছে যায়। ভটভটি মেশিনে বিজলী বাতি জ্বলে। আরও কত কী যে!

'অঘ্রানে যদি এসতেন দাবাবু....' অষ্টমী বলে যাচ্ছিল, 'খুউব ভাল লাগত আপনার।'

'তুমি কী জানো—কী ভাল লাগে আমার?'

'ঝানি গো সব ঝানি। বৌদিমণি মোকে সব বলেচে। আপনি নাকি ব্যের পূর্বে বিবাগী ছিলেন গো?'

'এসব কথাও তোমাকে বলেছে?' আলতো করে হাসল প্রিয়ঙ্কর।

'বলবেনি কেনে? মোকে ঝে ধারুণ বিশ্যেস করে। নিজের নোকের মতো ভালবাসে।'

'তুমি সেসব বোঝ তা হলে?'

'কেন বুঝবোনি! মুই তো মানুষ বটে।'

'তা হলে আবার ফিরে যাবে তো? আমার কিন্তু ভয় করছে।'

'ডর কেনে?'

'যদি তোমার স্বামী ছাড়তে না-চায়?'

হোঁচট খাওয়ার মতো যন্ত্রণা-মুখে থমকে দাঁড়াল অষ্টমী। চোখের চাহনিতে ঠিকরে পড়া রাগ। একমুঠো দীর্ঘশ্বাস ছড়িয়ে দ্রুত পা চালায়। বলে, 'উসব খারাপ কতা মুকে আনবেননি। শুনলি মন দুব্বল হয়্যে ঝায়। যা ভাগ্যিতে নি তা হবে ক্যামনি।'

অষ্টমীর চোখ মুখে চৈত্র দুপুরের উদাসী বিষণ্ণতা। কথার ছলে অজান্তে দুর্বল জায়গায় আঘাত দেয়ায় নিজেকে অপরাধী মনে করল প্রিয়ঙ্কর। সবকিছু সহজ করার জন্য বলল, 'বেশ তো ঘাট হয়েছে, আর বলব না। তার চেয়ে তোমার সেই অঘ্রানে বেড়াতে আসার কথাটাই বল শুনি।'

নিমেষে সহজ হয়ে যায় অষ্টমী। আগের প্রসঙ্গে ফিরে আসে, 'অ্যাখুন নরম রোদ্দুর থাকে তো তাই হাঁটতি কষ্ট হবেনি। হুই যে মাঠ দেকচেন সিসময় সোনায় ভরি থাকে। ঘুঙুরের মতন ঝিন্ ঝিন্ শব্দ হয়। আকাশ থিকি কত্ত পাখি নামি আসে। পাকা ধানের উপ্রে মেলা বসি যায়। কিচির মিচির কত্ত কতা কয়। ফর্ফর্ ফর্ফর্ উড়াউড়ি কত্ত ব্যস্ততা—ঝদি দেকতেন! চারিদিকে লবান্নের গন্দ। বাতাসটাও মজার বটে। উসময় জম্মেছ্যাল বলি শাউড়ি মেয়েটার নাম রেখ্যেছ্যাল অঘ্রানী।'

কিছুক্ষণ দম নিল অষ্টমী। তারপর বলল, 'এগুন অঘ্রানে খোকাবাবু তো ডাগর হয়ে ঝাবে। বৌদিমণিকে নিয়ে এস্যে দেকবেন, অষ্ট মিথ্যে বলেনি।'

প্রিয়ঙ্কর ফের ভাবল, অষ্টমী ততদিন থাকবে তো! আশঙ্কাটা যেন আজগুবিই থেকে যায়। এ পর্যন্ত কত যে কাজের লোক এল গেল। কিছুতেই কেউ বেশিদিন টিকে থাকে না। প্রথম দিকে বেশ বোকা সরল সোজা থাকে। কিছুদিন বাদেই পাড়ার আর দশটা ঝিয়ের সঙ্গে মিলেমিশে চালাক চতুর হয়ে যায়। সবতাতেই ট্রেড ইউনিয়নী শ্রমিকের ঢঙে কথাবার্তা বলতে থাকে। তখন সর্বক্ষণ তোয়াজ করে চলতে হয়। প্রতিবেশীরাও প্রলোভন দেখায় ভাঙ্চি দেয়। বছর দু'বছর না-গড়াতে এভাবেই কাজের লোকগুলি ভেগে যায়।

অষ্টমীর সেই জ্ঞানচক্ষুটা এখনও খোলেনি। ইদানীং অবশ্য যখন তখন শোণিমার সঙ্গে তর্কযুদ্ধ জুড়ে দেয়। অন্যান্য বিক্ষোভও দেখায়। দু'একবার অনশনও করেছে। অষ্টমীর হয়ে প্রিয়ঙ্কর বোঝাতে চেষ্টা করেছে, 'স্বামী সন্তান সংসার ছেড়ে থাকলে তোমার মেজাজটাও এরকম হত নিমা। কেন যে বোঝ না, কীইবা বয়স ওর। শরীরের চাহিদাটাও তো আছে। পাগলা কুকুরীকে না-খোঁচানই ভাল। বরং, বুঝিয়ে সুজিয়ে মানিয়ে চলার চেষ্টা কর।'

একজন শিক্ষিতা শিক্ষিকার পক্ষে গেঁয়ো ঝিয়ের মেজাজ যতটা মানিয়ে নেয়া সম্ভব শোণিমা তা করে। অষ্টমীর বেলায় বরং বেশিই দুর্বলতা দেখায়।

'স্বামী তোমাকে ছাড়লো কেন অষ্টমী?' অচমকা বিনা কারণেই জিগ্যেস করে বসল প্রিয়ঙ্কর।

'মোর নাকি মাতা খারাপ। নানা অত্যাচার করত।' সহজভাবেই জবাব দিয়ে অষ্টমী সালিশী মানল, 'তা দেকলেন তো অ্যাদ্দিন। মুই কী ফাগল?'

'মোটেই না'। প্রিয়ঙ্কর তোয়াজের সুরে বলল, 'তোমার মতো এত ভাল কাজের লোক এর আগে কোনওদিন পাইনি। সত্যি বলছি।'

'আসলে উসব ছলকতা গো দাবাবু। উসব বুঝবেননি। ছোটনোকেদের ঘরে ইসব হয়েই থাকে। নৈলে আপনাদের কাজের নোক মিলবে কোত্থুনে।'

প্রিয়ঙ্কর কথা বাড়াল না। মনে মনে ভাবল, ঘটনা সত্যি। এযাবৎ যত কাজের লোক এসেছে হয় তারা স্বামী-পরিত্যক্তা; নয়তো বিধবা।

হিজল বন পেরিয়ে ডাঙা জমিতে একটা কাঁটা মাদার গাছ। ছায়ায় বসে বনমালী বিন্দাবন মুকুন্দ পবন তাসের জুয়া খেলছিল। সকলেরই উদোম গা কপনি পরা। পাশেই তাড়ির ভাঁড় তেলেভাজা বিড়ি দেশলাই। শহরের মানুষ দেখে ভয়ে সেঁধিয়ে গেল। তাস টাকাকড়ি লুকিয়ে ফেলল।

ধড়িবাজ মুকুন্দ জুলজুল সন্দিগ্ধ চোখে প্রিয়ঙ্করকে দেখছিল। অষ্টমীকে পাশ কাটিয়ে যেতে দেখে বিন্দাবন গলা খাঁকারি দিল,'অষ্ট নাকি?'

অষ্টমীর ঘোমটা খসে পড়েছিল। মাথার কাপড় গুছিয়ে অসন্তুষ্টির জবাব দিল, 'দেকতি পারছুনি। চোকের মাতা খেয়্যেচো?'

'আবার তা হলে এলি?' বনমালীর প্রশ্নে ঠাট্টার স্পর্শ।

'এসবুনি কেনে। তোর বউয়ের মতন পেইলে তো ঝাইনি। তোর মেয়ের মতন গলায় দড়িও দুবুনি!'

'তা তুই আমার মতো দুখী নয় তো বটেই।' বনমালী খোঁচা মারল, 'তোর বরাত ভাল। শহরে নতুন স্যাঙা করেছিস মনে হচ্ছে।'

নোংরা মন্তব্যটা অষ্টমীকে তীব্র দংশন করল। মাথায় সারা শরীরের রক্ত উঠে দাপাদাপি করছিল। ছিঃ ছিঃ কী নজ্জার কতা। দাবাবু কী ভাবলেন কে জানে। সঙ্কোচে কুঁকড়ে গেল অষ্টমী। মনে মনে গাল পাড়ল, 'বেজন্মা ওলাউঠো, তোর মুকে তিন নাতি।'

প্রিয়ঙ্কর সঙ্গে থাকায় চরম অপমানটা বেমালুম হজম করে অষ্টমী শুধু বলল, 'ছোটনোকের কতা শুনলি চিত্তির জ্বলি ঝায়।'

আক্রামের উঠোনের ওপর দিয়ে হাঁটলে পথটা অনেক ছোট হয়ে যায়। সেই সুযোগটা নিল অষ্টমী।

আগে মহেশতলায় থাকত আক্রাম। সেখানে অনেক জমিজিরেত। কিন্তু শরিকী গোলমালে শ্বশুরের ভিটেয় পালিয়ে এসেছে। তাই বলে তিনপুরুষের ব্যবসাটা ছাড়েনি। ফি সপ্তাহে মঙ্গলাহাটে ছোটদের জামা বেচতে যায়।

উঠোনের ওপর বড় জারুল গাছের ছায়ায় বসে মেশিনে সেলাই করছে আক্রাম। পায়ের কাছে বসে ন'বছরের ছেলে নুরুল জামায় বোতাম লাগাচ্ছে। আগে সাকিনা মদত করত। সাকিনাকে দাওয়ায় বসে ছোট কাঁথা সেলাই করতে দেখে বোঝা গিয়েছিল সে ফের পোয়াতি। ফি বছর পোয়াতি হয় সাকিনা। নাসবন্দীতে আক্রামের নাকি দারুণ আপত্তি। বলে কিনা, 'কাফের হতে পারবুনি।'

নুরুলের চুলে আদর করে দু'টো লজেন্স দিল অষ্টমী। আক্রামকে জিগ্যেস করল, 'চাচা ভাল তো?'

মেশিন থামিয়ে চোখ তুলল আক্রাম, 'হ্যাঁরে বেটি অ্যাদ্দিনে মনে পড়ল?'।

অষ্টমী নিরুত্তর হাসল। সাকিনার কাছে গিয়ে নিজে থেকেই বলল,'বসবুনি। ফের বাঁদিয়েচো? তোমার মরণ ভাল।'

দূর থেকে হলুদ খড়ের চালাঘরগুলি দেখা যাচ্ছিল। চালের ওপর পুঁই কুমড়ো গাছ। শুয়ে থাকা দু'টো কুমড়ো। ঘরের পাশে ঝিঙে শশার মাচান। সারি সারি লঙ্কা ঢ্যাঁড়শ গাছ। উঠোনের ওপর স্বর্ণচাপা গাছটাও নজরে আসছে।

ক্লান্ত প্রিয়ঙ্করকে যেন মরুভূমিতে জল দেখাল অষ্টমী, 'হুই মোর বাপের বাড়ি দেখা যাচ্চে গো দাবাবু।'

মাটির দাওয়ায় বসে এনামেলের থালায় পান্তা খাচ্ছিল ক্ষুদি। দাদা ক্ষুদিরাম মণ্ডল অষ্টমীর পিতৃতুল্য লোক। মাথায় একদল ঝাঁকড়ানো কালো কুচকুচে চুল। জামরঙ কালো শক্তসবল স্বাস্থ্য। ইস্পাতের মতো বুক। শরীরে বয়সের বিন্দুমাত্র টান ধরেনি।

সাড়া জাগানো হাঁক ছাড়ল ক্ষুদি, 'হেঁই দ্যাখ কুড়ানী, অষ্ট এইস্‌তেছে।'

ক্ষুদির বউ কুড়ানী হাঁক ডাক শুনে উঠোনে নেমে এল। অনম্র বুক তার। ভারী নিতম্ব ঊরু জঙ্ঘা। চোখা নাকে নাকছাবি। ডোরাকাটা কোরারঙের শাড়ির আঁচলে ঢাকা জামাহীন বুক। ডান কাঁধ অনাবৃত। কোমরের নিচে অন্তর্বাসশূন্য। হাতে ঝুটা পলা। কপালে মেটে সিঁদুরের টিপ। গালভরা খিলিপানে লাল ঠোঁট। দেখেই বোঝা যাচ্ছিল, ক্ষুদির সঙ্গে বয়সের বিস্তর ফারাক।

প্রিয়ঙ্কর দেখে থ। বেসরম চাউনি দেখে লজ্জায় দাঁতে জিভ কাটল কুড়ানী।

মাথায় কাপড় টানল। ততক্ষণে আগান বাগান থেকে একদঙ্গল ছেলেমেয়ে ছুটে এসে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। দারুণ কৌতূহল সকলের। বেশি বয়সের ছেলেটা ভেতরের বিস্ময় বেশিক্ষণ চেপে ধরে রাখতে পারল না। বেফাঁস চিৎকার করে উঠল, 'হাঁই বাপ! ই যে মোদের কুঁড়েঘরে হাতি এয়েচে।' অপেক্ষাকৃত কম বয়সের মেয়েটি ভুল শুধরে দিল, 'ধেৎ। ঠাকুর রে। নিমাই সন্ন্যেস যাত্রা দেকিসনি? নিমাই সেজ্জ্যেছ্যাল। মুই ঠিক ধরতি পেরেচি।'

প্রিয়ঙ্কর মিটিমিটি হাসছিল। কয়েক জোড়া কচি নিষ্পাপ চোখের জুল জুল চাহনি আর ওদের কথা শুনে বেশ মজা লাগছিল। চোর চোখে লক্ষ করল, কুড়ানীর ঠোঁটেও মিট মিট টেপা হাসি।

কুড়ানীকে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে চৌকাঠ থেকে ধমক দিল অষ্টমী, 'হাঁদার মতন দাঁইড়ে দেকচো কী? দাবাবু গো দাবাবু। দেবতা নোক। বড্ড পরিশ্যম হইচে। শিগ্‌গির বসতি দাও। সরবত আনো।'

এতক্ষণ যেন মাটির ঘরে হঠাৎ নামা চাঁদ দেখছিল কুড়ানী। চোখের পাতা পড়ছিল না। মনের আশ মিটছিল না। স্বপ্নের ঘোর কাটিয়ে লজ্জায় আনত ঠোঁটের হাসি চাপল। ছুটে গিয়ে খেজুর পাতার চাটাই নিয়ে এল। দাওয়ায় বিছিয়ে দিয়ে বলল, 'বসেন গো বাবু।'

লঙ্কা পিঁয়াজ আলুপোস্ত দিয়ে পান্তা গিলছিল ক্ষুদি। শেষ হতে কুড়ানী বাসন কুড়িয়ে জায়গাটা ন্যাতায় মুছে দিয়ে গেল। যুবক বয়সের একজনের সঙ্গে ক্ষুদি পরিচয় করিয়ে দিল, 'আমার ঘরজামাই দাসু। ছেলেটা তো বিবাগী। মুখ্য খাটো বুদ্ধির চাষাভুষো মানুষ আমি। দাসু লেখাপাড়া জানে। ওর বুদ্ধিমতে চলি বাবু।'

দাসু অন্যান্যদের মতো ভক্তিতে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করল না। বেশ উদ্ধত যুবক। বলিষ্ঠ বুক। শক্ত চোয়াল। কালো বেড়ালের মতো জ্বলন্ত চোখ।

করজোড়ে নমস্কার জানিয়ে দাসু বলল, 'তা আপনি আসায় ভালই হয়েছে। অনেক কথা আছে আপনার সঙ্গে। আগে বিশ্রাম নিন।'

কুড়ানী এক গ্লাস সরবত দিয়ে গেল। কাগজি লেবুর পাতা নিংড়ানো গুড়ের সরবত। সঙ্গে কয়েকখণ্ড তরমুজ। সবই অমৃতের মতো লাগছিল। ক্ষুদির নাতনি নেকি তালপাতার পাখায় বাতাস করে যাচ্ছে। পাখাটার চারদিক কাপড়ের পাড় মোড়া। ছোটমেয়ে কলমী তেল চিটচিটে ছেঁড়া কাঁথা বালিশ নিয়ে এসে বলল, 'এট্টু উটুন বাবু পেতেদি। শুবেন।'

এতক্ষণের আন্তরিক আতিথেয়তা প্রিয়ঙ্করের ভালই লাগছিল। বিছানার চেহারা দেখে অস্বস্তিতে বাধা দিল, 'দরকার নেই। কতক্ষণ আর থাকব।'

'সি কি! থাকবেননি?' ক্ষুদির চোখে বিস্ময়।

'না। সমুদ্র দেখতে যাব। কাল ফিরতি পথে অষ্টমীকে নিয়ে যাব।'

'অষ্ট কালকেরেই ফিরবে!' ক্ষুদির মন বিষণ্ণতায় ভরে গেল।

কিছুক্ষণ পরে বড় জামবাটিতে খাবার এল। মুড়ি মুড়কি নারকেল। সঙ্গে একবাটি দুধ। দুধেরও যে এত সুন্দর ঘ্রাণ থাকে প্রিয়ঙ্কর জানত না। ক্ষীর হতে আর কতটুকু সময় বাকি ছিল। পুরুষ্টু সরও দিয়েছে কিছুটা। সবটাই বেশ আয়াস করে খেল। সবশেষে চা এল। চা পাওয়া যাবে ভাবা যায়নি। কালচে রঙের গুড়ের চা। সরবতের মতো মিষ্টি। বিস্বাদ তবু খেতে হল।

সিগারেটের ধোঁয়া উড়িয়ে আয়াস করছিল প্রিয়ঙ্কর। মুঠিতে প্যাকেটটার দিকে লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ক্ষুদি বলল, 'দামি সিগ্রেট মনে হচ্ছে।' প্যাকেটটা এগিয়ে দিয়ে প্রিয়ঙ্কর বলল, 'রেখে দাও। আমার আরও অনেক আছে।'

পুরস্কার নেয়ার ভঙ্গিতে ক্ষুদি দু'হাত পেতে প্যাকেটটা নিল। একটা সিগারেট ধরিয়ে বাকিটা কোঁচড়ে গুঁজে রাখল। বুক ভরা ধোঁয়া টেনে পরম তৃপ্ত খুশিতে ক্ষুদি বলল, 'গরিবের ভিটেমাটিটা একবার দেখবেননি বাবু?' প্রিয়ঙ্কর ভিটেমাটি বাগান দেখতে গেল।

কাজ ফেলে কাস্তে হাতে ছুটে এল দাসু। অষ্টমীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তিরিক্ষি মেজাজে জিগ্যেস করল, 'শুনচি কালকেরেই নাকি তোকে চলে যেতে হবে পিসি?'

'হুঁ।'

'সোয়ামীর ভিটেয় একবারটি যাবিনে?'

'না।'

'না কেনে? ব্যাটাবেটিদের তো দেখতে যাবি।

'খপর পাঠ্যেচি। উরা এসবে।'

'ও গাঁয়ের বিষ্টু সিদিন হাটে বলতেছ্যাল, বংসী পিসে নাকি বুকে কাঁশ রোগে শয্যা নিয়েছে। এলি যদি একবার দেখতে যাবিনি?'

স্বামীর অসুস্থতার সংবাদে অষ্টমীর চোখমুখে কোনও ভাবান্তর প্রতিক্রিয়া হল না। বলল, 'দেকবার জন্যি সোহাগী বউ তো আচে।'

'সে আর আচে কই? ক্ষয় রোগের ভয়ে পেইলে গ্যাছে? আপদে বিপদে ছেনাল মাগীরা থাকে কখনও। সে যখন ভাগছে তো তোর অ্যাখুন ফের ঘর করতে বাধা কীসে?'

অষ্টমী কিছু জবাব দেওয়ার আগেই ওরা দলবেঁধে হাঁসফাঁস করে ছুটতে ছুটতে কাছে এসে শোরগোল তুলল। বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে জাপ্টে ধরে অঘ্রানী ডুকরে

কেঁদে উঠল, 'মা-আ-আ-রে।'

সঙ্গে পারুও এসেছে। দেখেই মালুম হচ্ছিল, সে ফের পোয়াতি। খালাশ হয়েছে এখনও দু'বছর পেরোয়নি। অতটুকুন মেয়ে এত ধকল সহ্য করতে পারবে কেন। অষ্টমী জানে, তবু পারতেই হবে। নইলে তার মতই সংসার হারাতে হবে যে। বড় অত্যাচার অবিচার। এসব অন্যায় তো জন্ম থেকেই সে দেখে আসছে। মোড়ল পঞ্চায়েত-রাজেও এতটুকুন হেরফের উপকার হয়নি।

'ক'মাস রে পারু?' অষ্টমী জিগ্যেস করল।

'চার।'

'সজাগ থাকবি—বাতাস না-নাগে। খাতি ।ারিস?'

'পোর্থম দিকি গা গুলোত। অ্যাখুন এট্টু পারি।'

'পেথমবার তো কষ্ট হয়নি। ইবারও বাবার থানে মানত রাকিস।'

'রেকেচি।'

'আশু কী পুবের মতন নেশা ভাঙ করে?'

'তা আর লয়! অ্যাখুনতো পার্টি করতি নেগেছে। মাতবব্র নোক হয়্যেচে।'

'দেকিস কপাল পুড়োসনি। পোক্ত নজর রাকিস। গড়াই তো তোর সম্পক্কের মামা হয়। উকে সব্বাই গন্যিমান্যি করে। উল্টাসিধা দেকলে আগে থাকতি গড়াইকে বেবাক ঝানাবি।'

বংশীর বিধবা বোন আহ্লাদী এল। অষ্টমীর কোলে-পিঠে মানুষ আহ্লাদী ভীষণ ন্যাওটা ছিল। মেয়েটা বড় অভাগী। জন্ম মৃত্যু বিয়ে বড় বিচিত্র ব্যাপার-স্যাপার। সন্তান জন্ম দেবার আগেই সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়ে সোয়ামীটার অপমৃত্যু হল। ঝড়ে নৌকা ডুবল তো আহ্লাদীও ডুবল। শাশুড়ির নজরে আঁটকুঁড়ি ব্যাটাখাকি বউ। সেই দোষে সোয়ামীর ভিটেছাড়া আহ্লাদী এখন বাপের বাড়ি।

ধুপ করে অষ্টমীর পাশে বসল আহ্লাদী। জড়িয়ে ধরে উঁচু শব্দ সুরে মরাকান্না জুড়ল, 'তুমার দয়ামায়া নেই গো বোদি। সিই যে গেলি তো একবারটি মনে পড়লুনি! চিটি দিয়ে খপরাখপর লিবে তো।'

অষ্টমী এতক্ষণ অঘ্রানীকেই শুধু আদর করছিল। এবার আহ্লাদীর চুলেও হাত বোলাল। চিবুকে হাত ঠেকিয়ে শব্দ করে চুমু খেয়ে অজুহাত দেখাল,'ফুরসত পেনুন কুথা। কত কাজ। সব তো মোর উপরে নিভ্ভর।'

হাতের কাজ সেরে কুড়ানীও কাছে এসে বসেছে। অষ্টমীর পরা কাপড়খানায় হাত বুলিয়ে শুধল, 'কে দিয়েচে? দারুণ সোন্দর গো।'

'কে আবার দিবে? দাবাবু। কী যে ভালবাসেন। দেবতা নোক গো।'

পা ছড়িয়ে আয়েস করে বসল অষ্টমী। গল্প জমিয়ে তুলল। যত সব গর্বকথা। কর্মক্ষেত্রের নাড়িনক্ষত্রের হিসবেনিকেশ ফিরিস্তি। অষ্টমী বলে যাচ্ছিল, 'দু'জনিই তো আপিস ঝায়। বাচ্ছাটা তো মোকেই মা বলে ঝানে। বুকের দুধ খাতি চাইত। কিন্তুন পাবে কোত্থুনে! কান্না থামাতি তাই দিতি হতো। কান্না তো থামতো।'

শুনে সবাই হাসিতে লুটোপুটি। বিস্ময়ের চোখ কপালে তুলে কুড়ানী জিগ্যেস করল, 'বৌদিমণি ঝানতি পারতোনি?'

'ঝানে তো।'

'কিস্যু বলতোনি?'

'বলবে কী। ঝ্যাত ঝক্কি মাতায় লিয়েচি ইটাই তো বড় কতা।'

'ভাল নোক বলতি হবে।'

'তা খারাপ বলবুনি। তবু ঝ্যান ক্যামনতর। দাবাবুর উপরে বড্ড অবিচের করেন। সোয়ামী বলি কতা। একদুম মান্যি করেন না। সব সময় তিরিক্ষি মেজাদ। খালি বকাঝকা গালমন্দ হ্যানস্থা। ভাবখানা ইরকম—ঝ্যান বৌদিমণিই সোয়ামী। মাটির মানুষ দাবাবু। কী যে সহ্যগুণ তা আর কত কী শোনাব।'

'একদুম কিস্যু বলতোনি?'

'তবে আর বলচি কী। দাবাবুর জন্যি মায়া হয়। আপিস থিকি ফিরলি এই অষ্টকে আগে এগ্যে ঝেতে হবে। অপিস যাবার মুখেও এই অষ্টই ভরসা। পান খাওয়া অভ্যেস। গুণে দু'গন্ডা পান সেজ্যে দি। এগুনে আরও বেশি খেতেন। মুই জুলুম কর্যে কম্যেচি। ঝা কিছু দরকার হবে তাতেই অষ্ট আর অষ্ট। এই অষ্ট বিনে গতি লাই।'

'বৌদিমণি দুষ দ্যাকে না?'

"ধূর। ই কী মোদের মতন ছোটনোকদের ঘর? একদিন বিছানায় শুয়্যে মাতা ব্যাতায় দাবাবু কষ্ট পাচ্চিলেন। জবাই মুরগির মতন কী যে ছটফটানি। বৌদিমণি ত্যাখুন টিবিতে বায়োস্কোপ দেকতিচেন। খপরটা দিনুন। বলেন কিনা, শেষটুকুন না দেখ্যে যাবুনি। তাকে মলম আচে দ্যাকগে। এট্টু লাগ্যে দেনা লক্ষ্মীটি।'

'দিলে?'

'দিনুন। ঈ আর আচ্চয্যির কতা কী! ইরচ্যে কত বেশি আচ্চয্যির ব্যাভার আচে। সীসব বলতি গেলি রাত কাবার হয়্যে ঝাবে।'

শুনে সকলে হতবাক। যত প্রশ্ন ঝটিতি তত উত্তর। খামতি নেই। অষ্টমী যেন নাতি নাতনিদের নিয়ে ঠাকুমার ঝুলি খুলে বসেছে। বলার ভঙ্গিমায় শুনতে ভালই লাগছিল সকলের। তারা যেন এক স্বপ্নের জগতে পৌঁছে যাচ্ছিল।

'ভালই আচো তাহলি?' দীর্ঘশ্বাস উড়িয়ে জানতে চাইল আহ্লাদী।

'তা আর বল্‌তি, যত্নআত্তিতে বেশ আচি। টিবিতে বায়োস্কোপ দেকতি পাই। মেশিনের ফিতেয় মোর কত কতা ধরা আচে। গাড়িতে সোন্দর সোন্দর জায়গায় বেড়াতি ঝাই। খোকাবাবুকে কোলে করি রঙ বিরঙের ফটোক তোলা আচে। মেশিনের ঠান্ডা জল খাই। ঝরনার মতন কলে চ্যান করি। সাবুন তেল আলতা সিঁন্দুর পাউডার—মোর ঝন্যি সবকিচুর পিথক ব্যাভস্থা। ঝুটা গয়না কাঁচের চুড়ি বিজলী পাখা—আরও কত কী যে। বৌদিমণি কত কিচু আনি দেয়। তাই থিকি বাচ্যে তোদের জন্যি কিচু কিচু এন্যেচি। দোবখন।'

আরাম সুখের গল্প শুনতে শুনতে কুড়ানী এক স্বপ্নিল অলৌকিক জগতে পৌঁছে যাচ্ছিল। অষ্টমীর ওপর হিংসা হচ্ছিল। ভাবছিল, ভাগ্য বটে।

অষ্টমীর আটসাঁট ভরাটে শরীর দেখছিল কুড়ানী। গায়ে গতরে দেখতে গঞ্জের ফিসারিজবাবুর বিলিতি কুকুরটার মতো লাগছিল। গায়ের রংটাও যেন আগের চেয়ে ফর্সা হয়েছে মনে হচ্ছে। সুখে থাকলে যেমনটি আলো বের হয় ঠিক তেমনটি। মনের চাপা কথাটা বলেই ফেলল, 'কী সোন্দর শরীল হয়েচে তোমার। ঝাও দেকা দে এসোগে। ঠাকুরজামাই লিশ্চিত ছাড়বেনি। শয্যা থিকিন অসুক পেইলে ঝাবে।'

'কে থাকচে। যাচ্চেইবা কে?' গাল ফুলিয়ে অহংকার দেখাল অষ্টমী।

'কেনে?'

'থাগবার কী আর উপায় আচে। অষ্টর উপ্‌রে কত বিশ্শেস। বাজার র‍্যাশন করতি, দুধ আনতি, বিজলী বাতির টাকা জমা দিতি হয়। সংসারের সব কাজেতিই হাত নাগানো চাই। অষ্ট নাহলি, সকাল সন্ধ্যি সাত রাজ্যির ঝামেলি সামলাবে কে। অষ্ট ছাড়া এক মুহূর্ত চলবিনি।'

'সে নাহয় বুঝলুম। কিন্তু মাইনে দেয় কত শুনি?

হঠাৎ দাসু এসে পিছন থেকে রাগের প্রশ্ন জুড়ল। দাসুর উপস্থিতিতে জমাট আসরটা কেঁপে তছনছ হয়ে গেল। সকলে ভয়ে নিশ্চুপ তটস্থ। রুক্ষ মেজাজের অভিভাবকের মতো দাসুকে আগে অষ্টমীও ভয় করত। এখন পায়ের তলায় সে মাটি খুঁজে পেয়েছে। ভাবতে অবাক লাগল, প্রাপ্য তার অথচ হিসেব কষছে দাসু!

নির্ভয়ে জবাব দিল অষ্টমী, 'খাওয়া-পরা থিকি সব কিচুই ঘরের নোকের মতন পাচ্ছি। কিচু হেরফের লয়। পানের জর্দাটা পর্যন্ত দাবাবু আনি দেন। সিবার গা গরম হলি চিকিচ্ছার জন্যি বড় ডাক্তার নি এস্‌লেন। ঝা ঝা দরকার সব দায়িত্বই তো লিয়েচেন। টাকাটাই তো বড় কতা হলুনি।'

'উসব নতুন কিচ্ছু নয়। সব কাজের মনিষ্যিরাই পেয়ে থাকে। তারপরেও বড় টাকার মাইনে পায়। এ তো ল্যাহ্য পাওনা। তোর বেলায় সেটা কত?'

'ষষ্ঠীদা ঝানে।'

'সে তো সাপে কেটে এখুন ওপরে। আজকাল শ্রমের মূল্য অনেক তা জানিস? ঘামরক্তে খাটছিস তো ল্যাহ্য পাওনা বুঝে নিবিনে?'

ষষ্ঠীদার মৃত্যুসংবাদ শুনে অষ্টমীর চোখের পাতা ভারী হয়ে এল। গল্পের আসরটা একেবারেই মাটি। ঘরময় যেন শ্মশান নিস্তব্ধতা ছেয়ে ফেলল। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে দাসুও আর কোনও তর্কে গেল না।

ঘুরে ফিরে জমি বাগান বসতবাটি দেখাচ্ছিল ক্ষুদি। মাটির বাড়ি। উঠোনের ওপর ধানের টলা। তুলসীমঞ্চের কুলুঙ্গিতে প্রদীপ। বাঁশের ডগায় আকাশদীপ। অলস গাভীন গরু শুয়ে আছে। হাঁস মুরগি চরছে। জাল শুকোচ্ছে একখানা। রাংচিতার বেড়ায় ঘেরা বাড়ির চৌহদ্দী। লংকা বেগুন ঢেঁড়শ বাগান। ঝিঙে শশার মাচান। জবা টগর কাঞ্চন ফুলের গাছ। পদ্মপুকুরের মাঝে খুঁটিতে বসানো ভড়। একটা মাছরাঙা বসে আছে। ঘাটের ধারে পড়ে থাকা কয়েকটা ঘুনি। পুকুরের চারদিকে ডাঙা জমিতে সবেদা আম জাম তাল নারকেল অর্জুন গাছের সারি। খেজুর গাছ জড়িয়ে একটা পিপুল গাছ দাঁড়িয়ে। ভ্যারান্ডা আকন্দ ঝাপিটুপি কাঁটামনসার ঝোপঝাড়। জোয়ান খয়ড়া আরও কত কী যে গাছ।

'বাগান দেখছেন বাবু?' প্রিয়ঙ্করের পাশে এসে দাসু জিগ্যেস করল।

'হ্যাঁ।

'গরিবের ভিটেমাটির আর দেখার কী আছে। শহুরে ধনী মানুষ গাঁয়ের গাছটাছ দেখ্যে হয়তো একটু আনন্দ পেতে পারেন। গরিবের কষ্টটা কী আর বুঝবেন?'

'গরিব হলেও মানুষরতন তো এখানেই আছে। আর কষ্ট? কমবেশি সব মানুষেরই তা থাকে। দু' কামরা ঘরে কী যে কষ্টে আছি তা যদি দেখতে! চারদিকে বিষাক্ত বায়ু। বিষয় আশয়ে ক্ষুদিরাম ঢের ধনী। বেশ ভাল লাগছে জায়গাটা।'

'শুনলুম সমুদ্রের ধারে কাটাবেন বলে মনস্ত করে এসেছেন। নয়তো থাকতেন।'
'পরে এসে দু'দিন থেকে যাব।' প্রিয়ঙ্কর ব্যস্ততা দেখিয়ে বিদায় চাইল, 'এবার যেতে হবে যে। নইলে অন্ধকার হয়ে যাবে।

'চলুন পথ দেখিয়ে দি।'

আলের ওপর দিয়ে সমুদ্র আবাসে যাওয়ার সহজ পথ দেখাল দাসু। পথ চলতে মনের গুহ্য কথাটা পাড়ল, 'বলছিনু কী অষ্ট পিসির ল্যাহ্য পাওনাটা কবে পরিশোধ করবেন?

'ষষ্ঠীপদ তোমার পিসির প্রাপ্য টাকা ওর নামে জমা রাখতে বলেছিল। তবু আমি সঙ্গে নিয়ে এসেছি। চাইলে দিয়ে যাব।'

'এখানে অভাব কিসে যে ওর রক্তজল খাঁটুনির টাকা নেব। ভবিষ্যতের জন্য ওর নামেই জমা থাক না কেনে। তা কত টাকা হয়েছে অ্যাদ্দিনে?'

'তিরিশ করে যোল মাসে চারশো আশি টাকা।'

'অ্যাদ্দিন বড্ড কম টাকায় খাটিয়ে নিছেন বাবু। তার জন্য ষষ্ঠীদার কথা খেলাপি কিছু বলবুনি। কিন্তু বছর ঘুরে যাওয়ায় অ্যাখুন পার্মানেন্ট নোক তো বটে। তিরিশটাকে ইবার থেকে পঞ্চাশ টাকা করতে হবে। মানেন তো ভাল নৈলে পিসি আর ফিরবেনি।'

প্রিয়ঙ্কর রীতিমতো হতবাক। বিন্দুমাত্র আবেদন নয়—এ যেন কোনও শ্রমিক নেতার দাবি আদায়ের হুমকি।

অনেক ভেবেচিন্তে জবাব দিল প্রিয়ঙ্কর, 'এসব কী অষ্টমীর মনের কথা? তাহলে সামনাসামনি বলতে লজ্জা কিসের?'

'মূখ্যু মেয়েমানুষ ইসব হিসেবপত্তরের কী বোঝে? গার্জেনদের সাথে কথা বলে ফয়সালা করাই ভাল।'

প্রিয়ঙ্কর তিক্ততা বাড়াতে চাইল না। অষ্টমীর মতামত যাচাই করতে ইচ্ছে হল। সেই সঙ্গে অপছন্দ দাসুকে এড়িয়ে যেতে বলল, 'বেশ তাই হবে। কাল তো আসছি, থেকো। ভেবেচিন্তে ঠিক করা যাবে।'

পরদিন অবেলায় পুকুরে স্নান করছিল কুড়ানী। অষ্টমীর দেওয়া লিরিল সাবান দিয়ে সারা শরীর ঘষামাজা করেছে। দু'পায়ের ছাঁটিতে শব্দ তুলে সাঁতার কাটছে, এমন সময় পোড়ো জমির দিকে থেকে সহজ আলপথে প্রিয়ঙ্করকে আসতে দেখল। সাঁতারে ক্ষান্ত দিয়ে ঘাটের কাছে কোমর জলে দাঁড়িয়ে পড়ল। জামাবিহীন গায়ে ভেজা কাপড়ে সাপ্টে থাকা তার স্তনদ্বয় দৃষ্টি কেড়ে নিতে ঘাটের কাছে থমকে দাঁড়াল প্রিয়ঙ্কর। চোখে চোখ রেখে দুষ্টু হেসে কুড়ানী বলল, 'অষ্ট যাবেনি বাবু।'

এক রাত্রে এমন কী ঘটনা ঘটল যে অষ্টমী যাবে না! প্রিয়ঙ্কর প্রমাদ গুনলো। দাসু নিশ্চিত গোল বাধিয়েছে। ঠিক এই ভয়েই শোণিমা আসতে দিতে চায়নি। এখন ফিরে গিয়ে কী কৈফিয়ত দেবে তাকে। প্রিয়ঙ্কর অসহায় বোধ করল। মনে মনে স্থির করল, দাসুর দাবিমতে পঞ্চাশ টাকা মাইনেতে রাজি হলে নিশ্চয়ই যাবে। এত সুখস্বাচ্ছন্দ্য, টাকা আর কোথায় পাবে।

কাল সন্ধ্যা থেকে হঠাৎ বংশীর গলা দিয়ে ঘন ঘন রক্ত ঝরছে। শরীরে তাপের মাত্রা বেড়েছে। খবর পেয়ে রাতেই ছুটে গেছে অষ্টমী। সেখানেই আছে। পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল ক্ষুদি।

আম জাম কাঁঠাল গাছের ছায়ায় ঘেরা বংশীর ভিটে। জীর্ণ ভাঙাচোরা জোড়াতাপ্পি দেওয়া কয়েকখানা মেটে চালাঘর। পাশে ছাইগাদায় মানকচু ঝোপ। হরিতকী পেঁপে কামরাঙা সবেদা গাছ। জামরুল গাছে দুটো কাঠবিড়ালী লাফিয়ে বেড়াচ্ছে। বাতাবী লেবু গাছে অজস্র কাঁচা ফল ঝুলছে। লাল পিঁপড়ের বাসা ঝুলছে অনেকগুলি।

একটা চালাঘরের ভেতর থেকে ডেকে নিয়ে গেল অষ্টমী। ম্লান বিষণ্ণ কান্নায় ফোলা চোখে তার ঘুমের ঢুলুনি। বোধ হয় সারারাত ঘুমোয়নি। পরনে এখানকার কমদামি কোরা লালপাড় শাড়ি। পায়ে আলতা। কপালে চড়া সিঁদুরের স্বস্তিক। সারা শরীরে শোণিমার দেওয়া কিছুই নেই। শুধু চেয়ে নেওয়া শাঁখা জোড়া দেখা যাচ্ছে।

দিনের বেলাতেও ঘরময় অন্ধকার ছেয়ে আছে। টিমটিমে কুপি জ্বলছে একটা। তারই অল্প আলো ছড়িয়ে আছে। যত্রতত্র ইঁদুর আরশোলা মাকড়সা। দুর্গন্ধভরা ছেঁড়া ময়লা বিছানা বালিশ। মেঝেতে মাদুর বিছানো বিছানা। চিৎ হয়ে শোয়া বংশী। নিরুত্তাপ যন্ত্রণাবিহীন নিস্পন্দ ভাবলেশহীন। যেন একটা মৃতদেহ।

আদুর গায়ে শুয়ে আছে বংশী। হাঁটুর ওপর পর্যন্ত একখন্ড ছেঁড়া ময়লা কাপড়। হাড়গিলে চেহারা। এক্স-রে প্লেটের ছবির মতো বুকের পাঁজরগুলি সুস্পষ্ট। বুকের ওপর হাত দুখানা গোটানো। রোদে পোড়া রুক্ষ শুষ্ক চামড়া। পাংশুটে গোঁফদাড়ি। কড়িকাঠের দিকে শূন্যে তাকানো কোটরগত হলদে চোখ। মণি দুটো যেন পাথর। মাথার কাছে নারকেলের খোলায় কিছুটা কালচেটে শুকনো রক্ত।

'দুষ নিবেন না দাবাবু।' অষ্টমী বলল, 'বৌদিমণিকে বুঝ্যে বলবিন। নিজির চোকে দেকতি পারচেন তো। ইভাবে ফেলি ঝাব ক্যামন করি?'

সময় দ্রুত গড়িয়ে যাচ্ছিল। এবেলা বাস ধরতে না-পারলে ওপারে শেষ এক্সপ্রেস বাসটা হাতছাড়া হয়ে যাবে। তা ছাড়া, পাকা সড়ক পর্যন্ত কষ্টকর পথটুকু এবার একা হাঁটতে হবে। দিনের শেষ উজ্জ্বল আলোতে বেরিয়ে পড়া সঙ্গত মনে করল প্রিয়ঙ্কর। পাঁচখানা একশো টাকার নোট অষ্টমীর হাতে দিয়ে বলল, 'আপাতত রাখো। ফিরে গিয়ে আরও কিছু পাঠাব।'

সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল অষ্টমী। তারপর আঁচলের গাঁট থেকে একখানা কুড়ি টাকার নোট এগিয়ে দিয়ে বলল, 'বৌদিমণির কাছি ঋণী ছিনুন। শাখা সোয়ামীর টাকায় পরতি হয় যে।'

বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে পথে নামল প্রিয়ঙ্কর। একটু আগে হেলে পড়া পশ্চিমের সূর্য সমুদ্রে ডুব দিয়েছে। দিনের আলো ম্লান ফিকে হয়ে আসছে। ক্ষেতজমির মাটিতে এখনও কিছুটা উষ্ণতা। কানের কাছে সাড়া জাগানো শোঁ শোঁ শব্দ ভাসছে। হঠাৎ ঢালু জমির নির্জন প্রান্তরে ধুলোর ঘূর্ণি ওঠে। ওপরের দিকে কুন্ডলী

পাকিয়ে শুকনো পাতা ওড়ে কয়েকটা। গাঁয়ের কুকুরটা এতক্ষণ জিভ দুলিয়ে কুঁই কুঁই শব্দে পিছু পিছু আসছিল। শব্দটা বন্ধ হয়ে যেতে পিছন ফিরে দেখতে পেল কুকুরটা ফিরে যাচ্ছে।

দ্রুত অন্ধকার নেমে আসছে। পাকা সড়ক এখনও অনেক দূরে। গা ছম ছম করছিল। মাটির রাস্তা আলপথ মেঠোপথ শূন্য মাঠ পেরিয়ে সাঁকোর মুখে থমকে দাঁড়াল প্রিয়ঙ্কর। ঝাঁকড়ানো কদমগাছের নিচে আবছা অন্ধকারে কে যেন একজন স্ত্রীলোক দাঁড়িয়ে আছে। ছায়ামূর্তিটা কাছে এগিয়ে আসতে বিস্ময়ের পর বিস্ময়।

মেঠো বাতাসে কুড়ানীর চুলগুলি এলোমেলো উড়ছে। আঁচল লুটিয়ে পড়েছে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে আছে। বেড়ালের মতো জ্বল জ্বল করছে চোখ দুটো। বুকের ওপর দিয়ে কাঁধে আঁচল ফেলে কুড়ানী বলল, 'মোকে নে চলেন গো দাবাবু। অষ্টমী পেইঠ্যে দিল।'

'কোথায়?'

'অষ্টর থানে। বড় অত্যাচার গো ইখানে।'

'ক্ষুদিরাম জানে?'

'শুনে কিছুই বললুনি। ঝানতুম তো কিছু বলবেনি। কব্বে থিকিই তো মরতি কইচিল।'

'মরতে বলছিল কেন?'

'বাহানা ছলকতার কী অভাব আচে। মোর নাকি চরিত্তির খারাপ। দাসুর সঙ্গি ফস্টিনস্টি করি। আসল মুই থাকতি এগ্যের বউটাকে আনতি পারছেনি যে। সে মাগী নাকি ফির এইস্‌তে চাইচে।'

'সে কি!'

'হ্যাঁ গো দাবাবু। ইসব ছোটনোকদের ঘরে আকছার হয়। নৈলে বাবুদের ঘরে কাজের নোক মিলবে কোথুনে।'

ঠিক একই কথা বলেছিল অষ্টমী। একটু আগে বিস্তীর্ণ শূন্য চরাচরে নিঃসঙ্গ হাঁটতে হাঁটতে প্রিয়ঙ্করের মনে হয়েছিল, এখানে মানুষ মাটি আকাশ—সবই বেআব্রু। কুড়ানীর হাত ধরে নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে সাঁকো পার হতে গিয়ে ভাবনায় পড়ল। স্বামীর কাছ থেকে কী পাবে বলে শেষ পর্যন্ত অষ্টমী থেকে গেল। আর সবকিছু ছেড়েছুঁড়ে কেন ছুটে এসেছে কুড়ানী। কী পাবে বলে, কোন স্বপ্নের জগতে যেতে চাইছে সে।

*ছবি ঃ সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়*

# মরণাশৌচ

দূর থেকে দেখে আকাশের মনে হল, ওর বড়দা সঞ্জীবন বুক স্টলের ভিড়ে একখানা বইয়ের পাতায় মগ্ন হয়ে আছে। সঞ্জীবন কল্যাণীতে অধ্যাপনা করে। থাকে বড় জাগুলিয়ায় পৈত্রিক বাড়িতে। বিধবা মা আর বিবাহিত দুই ভাইকে নিয়ে একান্নবর্তী পরিবার। সর্বকনিষ্ঠ আকাশ কলকাতায় ব্যাঙ্কে চাকরি করে। বিয়ের আগে ডেইলি প্যাসেঞ্জারি করত। এখন বেহালায় ফ্লাট নিয়ে আছে। প্রথম দিকে উইক এন্ডে অবশ্যই বাড়িতে যেত। সন্তান হওয়ার পর সেই অভ্যাসটা মাসে একবার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। টুকুন স্কুলে ভর্তি হওয়ায় এবং প্রমোশন পেয়ে কর্মক্ষেত্রে দায়িত্ব বাড়ায় এখন আর তেমন সময় সুযোগ হয় না যাওয়ার। এই যেমন নানারকম ঝামেলা ও ব্যস্ততায় গত আটমাসে একবারটি যাওয়া সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

আকাশের ভাবতে অবাক লাগল, বড়দা অতদূর সেই বড় জাগুলিয়া থেকে কলকাতায় বইমেলায় এসেছে! অনেকদিন পর সঞ্জীবনকে দেখতে পেয়ে উৎফুল্ল দ্রুত এগিয়ে কাছে গেল। পিছন থেকে হাত ধরে উচ্ছল হল, বড়দা তুই! পরক্ষণেই রীতিমতো অপ্রস্তুত। নিমেষে হতাশা সঙ্কোচ এড়িয়ে সপ্রতিভ বলল, স্যরি। ডোন্ট মাইন্ড। আমার বড়দাকে দেখতে অনেকটা আপনার মতো।

রক্ত-সম্পর্কে আমিও কিন্তু তোমার এক দাদা। হাতের বইটি স্টলে ফেরত দিয়ে সে আশ্চর্যরকম বিষণ্ণ হাসল। আকাশের কৌতূহলি চোখে চোখ রেখে জানাল, আমি তোমার মেজকাকার বড় ছেলে অনির্বাণ সেন। দস্তুরে আর্কিটেক্ট ইঞ্জিনিয়ার সুবাদে সল্টলেকে থাকি। তুমি না চিনলেও তোমাদের সবাইকেই আমি মোটামুটি চিনি জানি।

সত্যি! আকাশ খুশি ঝলমল হল।

বিশ্বাস হচ্ছে না? অনির্বাণ দুর্বোধ্য হাসি ছড়াল। আকাশের কাঁধে স্নেহের হাত রেখে বুক স্টলের বাইরে এসে ফাঁকায় দাঁড়াল। তারপর আরও বিস্ময়কর বোমা ফাটাল, তোমার নামতো আকাশ। ব্যাঙ্কে চাকরি কর। বেহালার দিকে থাক। ঠিক কিনা?

হতভম্ব আকাশ নির্বাক মাথা নেড়ে যথার্থতা স্বীকার করল।

আরও শুনবে? অনির্বাণ সগর্ব হাসি মুখে জিগ্যেস করল, হালের বিখ্যাত কবি সর্বজিৎ সেনের নাম শুনেছ?

শুনেছি মানে? আবেগ-আপ্লুত আকাশ জানাল, ওর কবিতা আমাকে রীতিমতো আন্দোলিত করে। হতাশা কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করে।

এহেন সর্বজিৎ সেন কিন্তু আমাদের বংশেরই ছেলে।

তাই!

কিছুকাল আগে একজন মন্ত্রীর দুর্নীতির বিরুদ্ধে যে আই এ এস অফিসার নির্ভীক প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছিল সেই কর্ণ সেনও আমাদেরই একজন।

অর্থাৎ কিনা সম্পর্কে আমরা দাদা ভাই!

ঠিক তাই।

এরা দু'জন ছাড়াও আর কেউ?

অনেক আছে। অনির্বাণ ওর সঞ্চিত খবরের পাতা খুলে ধরল, অর্জুন পুরস্কার পাওয়া ফুটবলার নবেন্দু, অতি অল্প বয়সের সাংসদ মৈনাক সেন, ইদানীং বাইপাস সার্জারিতে বিখ্যাত ডাঃ শোভন সেন, শুভঙ্কর হত্যা মামলায় আলোড়ন সৃষ্টিকারী আইনজীবী প্রতীক সেন ইত্যাদিরা আমাদের বংশের এক একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক।

আশ্চর্য! বিস্ময়াভিভূত আকাশ বলল, ঘটনাচক্রে এদের দু'একজনের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ বাক্যালাপ হয়েছে। তখন কি জানতাম যে ওরা আমার নিকট আত্মীয়।

জানতে না, কারণ জানতে আগ্রহী নয় তাই। অনির্বাণ দ্বিধাহীন বলল, আমিতো জ্যাঠা কাকা সব্বাইয়ের পরিবারের মোটামুটি খবর রাখি। এই যেমন জানি, তোমার সেজদা সুখেন্দু এককালে প্রথম শ্রেণীর তাত্ত্বিক নকশাল নেতা ছিল। সঞ্জীবনদা 'স্বাধীনতা আন্দোলনে পতিতাদের ভূমিকার' ওপর থিসিস লিখে ডক্টরেট হয়েছেন। আরও কত শুনতে চাও?

আমার অপরাধ নেবেন না। বিব্রত আকাশ আত্মপক্ষ সমর্থনে বলল, আসলে আমিতো কলেজ জীবন থেকেই প্রায় একরকম বাড়ি ছাড়া। কোন কাকার ক'জন সন্তান তা পর্যন্ত জানি না।

জাগুলিয়া থাকলেও সম্ভবত জানতে না। অনির্বাণ কারণ ব্যাখ্যা করল, আমাদের আত্মীয় স্বজন আপনজনদের সঙ্গে প্রথম বিচ্ছেদ তো দেশ ভাগের সময়। জ্যাঠা বাবা কাকারা সাকুল্যে সাত ভাই তবু এপারে এসে পাশাপাশি কাছাকাছি বসবাস শুরু করেছিলেন। ফলশ্রুতি, বড় জাগুলিয়ার অখ্যাত জনপদের নাম হয়েছিল সেনপাড়া। পরবর্তীকালে অবশ্য জীবিকার জন্য অনেকেই দ্বিতীয়বার বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন। দেশের নানা জায়গায় স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গেলেন।

কারণ আরও ছিল। আকাশ সরল মনে মন্তব্য করল, জ্ঞান হয়ে অবধি দেখেছি বিচ্ছিন্ন হওয়ার আগেও কিন্তু বাবা কাকাদের মধ্যে তেমন বনিবনা ছিল না। অনেকেই পরস্পর শত্রু মনোভাবাপন্ন ছিলেন। কারও কোন ক্রিয়াকর্মে পর্যন্ত অন্যদের যাতায়াত যোগদান বন্ধ ছিল। ওঁদের এই বিচ্ছিন্নতার কারণ কিন্তু আজও আমার অজানা।

কফি খাবে? আলোচনাটা অন্যদিকে মোড় নিচ্ছে দেখে অনির্বাণ প্রস্তাব রাখল, কফি কর্ণারে গিয়ে বসি চলো। কিছুক্ষণ প্রাণমন খুলে গল্প করা যাবে।

আকাশ আপত্তি করল না।

বেআব্রু কফিকর্ণারে এখন অনির্বাণ আর আকাশ দু'জনে মুখোমুখি বসে। সামনে ধূমায়িত কফি আর পাকৌড়া। পুরনো প্রসঙ্গে আকাশ ফের মুখ খুলল, বাবা কাকাদের মধ্যে যেকারণেই বিচ্ছিন্নতা বৈরিতা থাকুক না কেন নতুন প্রজন্মের আমরা তো সম্পূর্ণ নির্দোষী। অথচ আশ্চর্য দেখুন, ওঁদের দোষত্রুটির জন্য আমরা এবং আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের সকলকে বংশানুক্রমিক ফলভোগ করে যেতে হবে। আজীবন।

হক কথা। মুগ্ধ অনির্বাণ সহমত জানিয়ে বলল, দারুণ দামী কথা বলেছ তুমি। একটা নির্মম ফলভোগের ঘটনা বলছি শোন। পুরুলিয়া থেকে শোভন আর আসাম থেকে চন্দ্রা কলকাতায় ডাক্তারি পড়তে এসেছিল। পরস্পর প্রেমে পড়ল। গোপনে রেজিস্ট্রি বিয়ে পর্যন্ত করল। কিন্তু, শেষ পযন্ত আনুষ্ঠানিক বিয়ে আর হল না। কেন জান? পরে বলছি।

অনির্বাণ সিগারেটের প্যাকেট থেকে নিজে একটা নিয়ে আকাশের দিকে হাত বাড়াল, খাও নিশ্চয়ই?

খাই, তবে এখন খাব না।

কেন? কারণটা অনুমান করে অনির্বাণ ঘনিষ্ঠ হতে চাইল, একটু আগেও তো আমাকে চিনতে না। তাছাড়া, যথেষ্ট বয়েস হয়েছে তোমার। বী ফ্রি।

আকাশ অগত্যা সহজ হল। নিল। অনির্বাণের লাইটারের ফুয়েল থেকে আগুনও ধরালো। তারপর উত্তর শোনার প্রত্যাশায় নিষ্পলক তাকালো।

যা বলছিলাম। ধোঁয়ার রিং ছেড়ে অনির্বাণ বলল, প্রেমে পড়ার সময় কেউতো আর বাপ ঠাকুর্দার পরিচয় জানতে চায় না। আনুষ্ঠানিক বিয়ের ব্যাপারে উদ্‌যোগী হতেই ওরা প্রথম জেনেছিল যে, সম্পর্কে ওরা জ্যাঠা কাকার সন্তান। অর্থাৎ কিনা ভাইবোন। দু'জনের বাবার মধ্যে আবার অহিনকুল সম্পর্ক।

তারপর কি হল? আকাশ নড়েচড়ে বসল।

আইনসিদ্ধ বিয়ে তো হয়েই গিয়েছিল। অনির্বাণ সিগারেটের শেষাংশটুকু মাটিতে ফেলে পায়ের জুতোয় চাপা দিল। একমুঠো দীর্ঘশ্বাস উড়িয়ে বলল, চিরদিনের জন্য

ওরা দু'জনে ওদের বাবা মা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। এখন দু'টি ছেলেমেয়ে ওদের। যতদূর জানি, তোমার তো একটিই ছেলে। নাকি দ্বিতীয় কোন সন্তান হয়েছে?

না। আকাশ সলজ্জ হাসল, একটিই যথেষ্ট।

নো নো। তর্জনী তুলে অনির্বাণ প্রতিবাদ জানাল, বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা আছে তা আমিও মানি। তাই বলে 'ছোট পরিবার সুখী পরিবার' স্লোগানে বিশ্বাসী নই। এক সন্তানে সীমাবদ্ধ থাকাতেও ঘোরতর বিরোধী। এইতো হালের ঘটনা। দক্ষিণ কলকাতার কোনও একটা স্কুলবাস অ্যাকসিডেন্টে জলজ্যান্ত বিশটি ছাত্র মারা গেল। সবার বয়স চোদ্দ পনেরোর মধ্যে। জানি না, কতজন বাবা মা সেদিন চিরদিনের জন্য নিঃসন্তান হয়ে গেলেন। তাছাড়া, সবাই যদি একমাত্র সন্তানই যথেষ্ট মনে করেন তাহলে তো ভবিষ্যতে জ্যাঠা কাকা মামা মাসি পিসি ইত্যাদি সম্পর্কগুলিই বিলুপ্ত হয়ে যাবে। জানি না, ফি বছর তোমার ছেলেটিকে ভাই ফোঁটা দেয় কে। একটা বিষয় লক্ষ্য করবে, আজকাল আর একান্নবর্তী পরিবার থাকছে না। তাহলে, এককভাবে বেড়ে ওঠা নিঃসঙ্গ বিষণ্ণ সন্তানদের হৃদয়ে উদারতা বিস্তৃতি সহনশীলতা আসবে কোত্থেকে? আগামীদিনে ওদের কাছ থেকে একাত্মতা সম্প্রীতি শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান সমষ্টিগত একতা বিশ্বভ্রাতৃত্ব ইত্যাদি বৃহত্তর মানবিক দিকগুলি আশা করা কি মূর্খামি হবে না? তোমার কি মনে হয়?

আকাশ সাধারণত সিরিয়াস আলোচনার ধারে কাছে থাকে না। সেই ছোটবেলা থেকেই কোনও কিছুই তেমন তলিয়ে দেখতে ভাবতে অভ্যস্ত নয়। এতক্ষণ স্কুল কলেজ-ক্লাসের অভ্যাসে মন দিয়ে শোনার ভান করে তাকিয়েছিল। অনির্বাণ নির্বাক হতে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। কিন্তু প্রশ্ন শুনে বিব্রত নড়েচড়ে বসল। নির্ভাবনায় বেমালুম বলল, আপনার ভাবনা চিন্তা যথার্থ। পরক্ষণেই নতুন করে ভারী ওজনের ভাষণ থেকে নিষ্কৃতি পেতে মণিবন্ধের ঘড়ির দিকে তাকাল। ব্যস্ততা দেখিয়ে বলল, আপনার মুখ থেকে মহার্ঘ কথা শুনে দারুণ ভাল লাগছিল। কিন্তু, এবার আমাকে উঠতে হবে যে।

অবশ্যই। সরল বিশ্বাসে অনির্বাণ উঠে দাঁড়াল। অতঃপর পরস্পর ফোন নম্বর আর ঠিকানা বিনিময় করল। মেলার ফটকের বাইরে আলাদা পথ ধরার আগে দু'জনে ভবিষ্যতে যোগাযোগ রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হল।

রাত এখন দশটা। আকাশ এতক্ষণ খাবার টেবিলে তন্দ্রাকে আজকের সাক্ষাৎকারের বিবরণ দিচ্ছিল। এমন সময় ফোন বেজে উঠতে দু'জনেই ভীত সন্ত্রস্ত আতঙ্কিত হল।

কাছেই ছোট্ট গোল টেবিলের ওপর রাখা ফোন। আকাশ ঈষৎ ঝুঁকে হাত বাড়াল।

অসময়ে এত রাত্রে ফোন! তন্দ্রা ম্লান বলল, তাহলে কি মা-র কিছু হল?

হ্যালো। উৎকণ্ঠিত আকাশ নিরুত্তেজ উচ্চারণ করল।

আকাশ? অপর প্রান্ত থেকে হিমেল কণ্ঠ ভেসে এল, আমি অনির্বাণ। তোমাদের রাতের খাওয়া শেষ হয়ে গেছে?

খাবার টেবিল থেকেই বলছি। আকাশ মনে মনে বিরক্ত হলেও আন্তরিকতা দেখাল, আজকেই ফোন! সত্যিই ভাগ্যবান আমি।

ব্যাপারটা আসলে খুবই জরুরী। কিছুক্ষণ পরে আবার রিং করব। ততক্ষণে তোমরা খাওয়া শেষ করে নাও।

খাওয়া শেষ হয়ে যাওয়ায় আকাশ বলতে চাইল, জরুরী যখন বলেই ফেলুন। কিন্তু, তা আর বলা হল না। তার আগেই অনির্বাণ রিসিভার রেখে দিয়েছে।

কি এমন জরুরী ব্যাপার হতে পারে? আকাশ দুশ্চিন্তায় আত্মমগ্ন হল।

কি দরকার ছিল ঠিকানা ফোন নম্বর দেওয়ার? তন্দ্রা মেজাজ দেখাল, এবার থেকে প্রায়ই এমন জ্বালাতন করবে। কবে হয়তো দেখবে, এসে হাজিরও হবে। তারপর চোখ টাটাবে। শত্রুতা শুরু করবে। যাকে বলে জ্ঞাতি-শত্রু।

আঃ। তন্দ্রা আরও কিসব বলতে যাচ্ছিল, আকাশ থামিয়ে দিয়ে বলল, আগেভাগে এতসব ভাবছ কেন? দেখাই যাক না কি বলতে চান উঁনি।

প্রতীক্ষায় বসে থাকা প্রত্যাশিত ফোন বেজে উঠল বিশ মিনিট পরে। ওপার থেকে অনির্বাণ বলল, একটা দুঃসংবাদ আছে। অশৌচের অনেক নিয়মকানুন। তাই তোমাদের খাওয়া শেষ হওয়ার আগে জানাতে চাইনি।

সেই দুঃসংবাদটা কি? আকাশ জানতে চাইল।

সোনাকাকা ফোন করেছিলেন। ওঁর ছোটছেলে শান্তনু আজ দুপুরে মারা গেছে। যেহেতু মোটামুটি সকলের খবরাখবর আমি রাখি তাই দুঃসংবাদটা সবাইকে পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব আমার ওপর বর্তেছে।

সোনাকাকা এখন কোথায় থাকেন কি করেন সেসব আকাশ কিছুই জানে না। জানতে ইচ্ছাও হল না। শান্তনুকে তো কোনদিন দেখেইনি। তবু সৌজন্যমূলক জিগ্যেস করল, বয়স কত ছিল? কি হয়েছিল?

মাত্র পঁয়ত্রিশ। ব্লাড ক্যান্সারে ভুগছিল। ছ'বছরের একটি ছেলে আছে।

কি করত?

আর্ট কলেজ থেকে পাশ করার পর বেশ কিছুকাল কলেজ স্ট্রীটের একটি পাবলিশিং কনসার্ণের সঙ্গে যুক্ত ছিল। তারপর একটি নতুন দৈনিক পত্রিকায় চাকরি করছিল। বেশ নামটামও শোনা যাচ্ছিল। বেঁচে থাকলে ভবিষ্যতে নামী কোনও

পত্রিকায় চান্স পেয়ে যেত। ভাবছি, এখন ওর বউবাচ্চার কি হাল হবে।

সোনাকাকার আর্থিক অবস্থা কেমন?

টাকার কুমির। শোভাবাজারে গেঞ্জির কল। মানিকতলায় বিশাল কাপড়ের দোকান। বাগবাজারে নিজস্ব বাড়ি। হলে কি হবে, হৃদয়হীন মানুষ। প্রেমে পড়ে গরীব লো কাস্টের একটি অতি সাধারণ মেয়েকে বিয়ে করার অপরাধে শান্তনুকে ত্যাজ্যপুত্র করছিলেন। সেই থেকে শ্বশুর বাড়িতেই থাকত। চিকিৎসা বলতে যা কিছু ওরাই করিয়েছেন। সোনাকাকা একবারটি দেখতে পর্যন্ত যাননি। কাকিমা লুকিয়ে চুরিয়ে যেতেন।

অন্য ভাইয়েরা?

চার দাদা যথেষ্ট প্রতিষ্ঠিত। সবাই ওকে ঘৃণার চোখে দেখত। ওরাও ইনহিউম্যান আচরণ করেছে। দুই দিদি কিছুটা সাহায্য করত শুনেছি।

এখন বাপ দাদারা সবাই মিলে নিশ্চয়ই অশৌচ পালন করবে? ধৈর্য হারিয়ে আকাশ শ্লেষাত্মক প্রশ্ন জুড়ল।

তাতো করতেই হবে। তোমাকেও করতে হবে। রক্ত সম্পর্কের দিক থেকে এটাই নিয়মরীতি। বড় জাগুলিয়ায় তুমিই জানিও। রাখছি।

নিয়মরীতি! রিসিভারটা রেখে আকাশ মুখভঙ্গি বিকৃত করে বলল, হয়তো লোক দেখাতে ঘটা করে এখন শ্রাদ্ধানুষ্ঠান ভোজন টোজনও করাবে।

তাহলে তো কাল থেকে আমাদের নিরামিষ। সব শুনে হতাশায় ম্লান তন্দ্রা বলল, অর্থাৎ এবার আমার শিব চতুর্দশীর উপোস বন্ধ। আগামী রবিবার তুমি নেমন্তন্নে যেতে পারছ না। কিন্তু, আমাদের রিন্টুসোনার বার্থডে পার্টির কি হবে? প্রায় সবাইকে যে ইনভাইট করা হয়ে গেছে।

সবকিছুই ঠিকঠাক হবে। ক্ষুব্ধ আকাশ চিৎকার করে উঠল, কোনও কিছুই বন্ধ হবে না। যত্তসব। একে অন্যকে চেনে না, জানে না। কারও সঙ্গে যোগাযোগ নেই। আপদে বিপদে কারও দেখা মেলে না। আনন্দ অনুষ্ঠানে নেমন্তন্ন আসে না। অথচ আশ্চর্য! অশৌচ পালনের জন্য দুঃসংবাদটা ঠিক পৌঁছে দেয়া চাই-ই-চাই। এসব বুজরুকি নিয়মরীতি আমি আগেও মানিনি, এবারও মানব না।

তা কখনও হয় নাকি! অবাক তন্দ্রা বোঝাল, বিয়ের আগে তুমি কি করেছ জানিনা। সংসারের মঙ্গলের দিকে তাকিয়ে এখন এসব মেনে চলা উচিত।

বিয়ের পরেও এরকম কিছু দুঃসংবাদ এসে পৌঁচেছে। তোমাকে জানতে দেইনি।

না জানলে দোষ থাকে না। তন্দ্রা জোর খাটাতে চেষ্টা করল, এবার আমি যখন জেনেছি নিয়মরীতি মানতেই হবে।

এসব ভণ্ডামি আমার দ্বারা সম্ভব নয়। উত্তেজনায় একটা সিগারেট ধরালো আকাশ।

তুমি একে ভণ্ডামি বলছ? তন্দ্রা সুর নরম করল, পিতৃপুরুষেরা কি তাহলে ভণ্ডামি করে গেছেন? রাগের মাথায় তুমি যা তা বলছ। কেন তুমি এমন উত্তেজিত হচ্ছো?

পিতৃপুরুষদের রেফারেন্স টেনে এনো না প্লীজ। আকাশ ক্ষোভের কারণ ব্যাখ্যা করল, যারা গুরুজনদের বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধাভক্তি করে না তারা যদি গুরুদশার পোশাকে কফি হাউসে আড্ডা দেয় কিংবা খেলার মাঠ, সিনেমা হলে যায় তাদেরকে ভণ্ড বলব না? এই যে সোনাকাকা। তিনি যদি ত্যাজ্যপুত্র শান্তনুর জন্য অশৌচ পালন করেন তাহলে কি বলব?

কিছু বলতে হবে না। তন্দ্রা অবাঞ্ছিত তর্ক বিতর্ক এড়াতে বলল, অনেক রাত হয়েছে। ঠাণ্ডা মাথায় এবার শোবে চল।

বিছানায় বেশ কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থাকার পর তন্দ্রা অস্ফুট জিগ্যেস করল, ঘুমোলে নাকি?

না। ঘুরে শুয়ে ঘনিষ্ঠ হয়ে আকাশ বলল, বলবে কিছু?

হ্যাঁ। তন্দ্রা বিনম্র প্রস্তাব শোনাল, কাল পরশু রিন্টু আর তোমারতো ছুটির দিন। অনেকদিন হল জাগুলিয়ায় যাওয়া হয় না। কাল সকালে চা জলখাবার খেয়ে বেরিয়ে গেলে কেমন হয়? মা দাদা বউদিদের সিদ্ধান্তটা জানা যেত।

ওঁদের সিদ্ধান্ত আমার জানা আছে। আকাশ পুরনো একটি ঘটনার সংক্ষিপ্তসার শোনাল, তখনও আমার বিয়ে হয়নি। বাংলাদেশে ভিটেমাটি আঁকড়ে থাকা বংশগত সম্পর্কের বয়স্ক কোনও একজনের মৃত্যু সংবাদ এসেছিল আটদিন পরে। মেজদা মৃদু শব্দ তুলেছিল, আর তো মাত্র পাঁচ দিন বাকি। দরকার কি এমন অশৌচ পালন করে? শুনে মা-র সেকি চোটপাট গালমন্দ। তারপর মজার ব্যাপার কি হল জান?

কি?

পরের দিন সেজদার শ্বশুর বাড়ি থেকে গট আপ জরুরি খবর এলো, ওর শাশুড়ি ঠাকুরণ নাকি মরণমুখি। ব্যস, সেজদা বউদি লোটাকম্বল গুছিয়ে চলে গেল। নীতিনিষ্ঠ বড়দা বউদির তত্ত্বাবধানে বাড়িতে অশৌচ পালন চললেও মেজদা আর আমি রোজ হোটেল রেস্তোরাঁয় নিয়মভঙ্গ চালিয়ে গেলাম। বেচারি মেজবউদির জন্য কষ্ট হতো। কিন্তু, সেনপাড়ার আত্মীয়স্বজনদের নজর এড়িয়ে ব্যতিক্রম কিছু করার উপায় ছিল না। কাজেই, ওসব ভাবনাচিন্তা ভুলে ঘুমিয়ে পড়।

সকালে ঘুম থেকে উঠে আকাশ ওর সিদ্ধান্ত বহাল রেখে বলল, মন চাইলে তুমি নিয়মরীতি মানতে পার। রিন্টুসোনাকে তোমার সঙ্গে জড়িও না।

তা হয় কখনও! তন্দ্রা যুক্তি দেখাল, সম্পর্কটা তোমাদের রক্তের দিক থেকে।

তাহলে অন্য রক্তের তোমাকে কেন এসব নিয়মরীতি মানতে হবে? তন্দ্রার মন্তব্য লুফে নিয়ে আকাশ আবার যুক্তি জুড়ল, বিয়ে হয়েছে বলেই বা দিদিরা কেন ছাড় পেয়ে যাবে?

অতশত জানিনা বুঝি না। বিরক্ত তন্দ্রা রুক্ষ মেজাজ দেখাল, এবার এই অবস্থায় আমি শিব চতুর্দ্দশির উপোস করছি না।

তন্দ্রার ব্যক্তিগত ব্যাপারে আকাশ বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। সম্পর্ক সূত্রে নিয়মরীতি পালনের উদ্দেশে ঝটিতি জাগুলিয়ায় দুঃসংবাদ পৌঁছে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছে। নির্দিষ্ট দিনে যথারীতি রিন্টুর জন্মদিন পালন করেছে। দৈনন্দিন স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় কোনও পরিবর্তনই আনেনি। কিন্তু আচমকা আজ অফিসে সুখেন্দু এসে হাজির। সঙ্গে হবিষ্যির জিনিসপত্র বোঝাই পলিথিনের থলে। ভয়ানক বিপদে পড়ার মতো চোখমুখ। বিরক্তির সঙ্গে বলল, বড়দা তোকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে বলেছে।

যত্তসব। আকাশও বিরক্ত হল। সঞ্জীবনকে পিতৃতুল্য মনে করে বলেই ওর ইচ্ছা নির্দেশতুল্য। এড়িয়ে যাওয়ার জন্য মিথ্যা অজুহাতের মানসিকতা না থাকলেও বলল, কিন্তু আমি যে সোনাকাকার ঠিকানাটাই জানি না।

আমার সঙ্গে আছে। সুখেন্দু পকেট থেকে ঁগঙ্গা লেখা নিমন্ত্রণপত্রটি দেখিয়ে বলল, কাল সকালের ডাকে পৌঁচেছে। হয়তো তোর ঠিকানাতেও যাবে।

আকাশ বার কয়েক নিমন্ত্রণপত্রটি পড়ল। অবাক হয়ে বলল, শ্রাদ্ধশান্তির অনুষ্ঠান হবে শ্বশুরবাড়িতে আর নিয়মভঙ্গ সোনাকাকার ওখানে!

হ্যাঁ, সবই তাজ্জব ব্যাপার স্যাপার। সুখেন্দু আরও একটি বিস্ময়কর সংবাদ শোনাল, সোনাকাকা ছোট্ট চিরকুট-চিঠিতে জানিয়েছেন, জ্ঞাতিদের নিয়মভঙ্গের অনুষ্ঠানে আমরা সকলে ওঁর বাড়িতে গেলে খুবই খুশি হবেন।

লেখা উচিত ছিল, আনন্দ পাবেন। আকাশ মুখ বিকৃত করে বলল, শ্রাদ্ধের নেমন্তন্নে কেন যাই না জানিস? আনন্দ-অনুষ্ঠানের ভোজসভার পরিবেশের সঙ্গে তফাত দেখি না বলে।

আমাকে তো তুই অন্তত যথেষ্ট জানিস বুঝিস। সুখেন্দু নিজের অসহায়তা জানাল, কোনও মৃত্যুকে কেন্দ্র করে সৌজন্যমূলক শোকটোক দেখানো আমার দারুণ অপছন্দ। অথচ, আজ এগুলি পৌঁছে দিতে গিয়ে আমাকে তেমনটিই অভিনয় করতে হবে।

এটাই নাকি নিয়মরীতি। সম্পর্কে দাদা হলেও আবাল্য আচরণে বন্ধুর মতো সুখেন্দুর প্রতি সহমর্মিতা দেখিয়ে আকাশ বলল, আমি আলাদা থাকায় বেশ মজায় আছি। আজ তোকে ভালমন্দ আমিষ খাইয়ে তবে ছাড়ব।

খাবার টেবিলে বসে আকাশ স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল, শ্রাদ্ধের দিন ওর বিয়ের তারিখ পড়েছে। কাজেই সুখেন্দু যেন সঞ্জীবনকে যাহোক করে ম্যানেজ করে নেয়। সুখেন্দু ওকে নিশ্চিন্ত থাকতে বলে গেছে। আজ সেই নির্দিষ্ট দিনে আকাশ অফিস যায়নি। এবারও গতকাল রিন্টুকে ওর মামার বাড়িতে রেখে এসেছে।

আজকের এই দিনটিতে আকাশ তন্দ্রা সাতসকালে কোনও মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে। নয়তো বেলায় বেরিয়ে নিউমার্কেটে কিছু কেনাকাটা করে। হোটেল রেস্তোরাঁয় খায়। সিনেমা অথবা থিয়েটার দেখে। অথবা, সুমুখ দরজায় তালা ঝুলিয়ে ভেতরে আত্মগোপন করে রোমান্টিকতায় কাটায়। এবারও তেমনটিভাবে কাটাবে মনস্থ করেছে। সেইমতো সকালে আনন্দ-উচ্ছ্বসিত আকাশ নিজের হাতে চা বানিয়ে তন্দ্রাকে খাইয়েছে। টেপ ডেকে ওর পছন্দের ক্যাসেট বাজিয়ে শুনিয়েছে। তারপর বাজার থেকে দু'জনের প্রিয় মাছ মাংস সবজি ইত্যাদি কিনে এনেছে।

তন্দ্রার আচরণ আজ অষ্টাদশীর মতো উচ্ছল। ভ্রমরের মতো গুনগুনিয়ে শোবার ঘর বিছানা সাজিয়েছে পরিপাটি রমণীয়। রকমারি রান্না করেছে ক্লান্তিহীন হাসিমুখে। দীর্ঘ সময় নিয়ে স্নান করেছে। দিনের বেলাতেই পরেছে স্বচ্ছ গোলাপি জৌলুসদার নাইটি। পায়েতে মল বাজছে রুম ঝুম রুম ঝুম। শ্যাম্পু করা একঢাল রেশমি চুল আর শরীর থেকে ছড়াচ্ছে স্নিগ্ধ পারফিউমের সুবাস।

আজ সারা দিন রাত আশ্চর্যরকম আবেগ উন্মাদনায় বিভোর হয়ে থাকার স্বপ্নালু নানা পরিকল্পনা দু'জনের। আকাশ এখন বর্ণালি সিল্কের লুঙ্গি পরে খাবার টেবিলে। সমুখে সাজানো স্যালাড তপসে-ফ্রাই কাজুবাদাম দু'টি গেলাস আর এক বোতল বিলিতি পানীয়। শুধুমাত্র আজকের জন্য এক প্যাকেট ডানহিল সিগারেট। তন্দ্রা লোভনীয় খাবারগুলি একে একে সাজিয়ে চলেছে। বিস্তর আয়োজন। বাগদা চিংড়ির ঝাল, চিতল-পেটির ঝোল, তেল-কই, চিলি-চিকেন ইত্যাদি।

পানীয় ভরা দু'টি গেলাসের ঠোকাঠুকি আর কোরাস-কণ্ঠে 'চিয়ার্স' ধ্বনি-মুহূর্তে ফোন বেজে উঠল। এর আগে মোট সাতবার ফোনে শুভাকাঙ্ক্ষীদের প্রীতি শুভেচ্ছা বার্তা এসেছে। তেমনি আরও একটি শুভেচ্ছা-বার্তা প্রত্যাশায় আকাশ রিসিভার তুলে 'হ্যালো, আকাশ সেন বলছি' উচ্চারণ করতেই যেন অকস্মাৎ বজ্রপাত। স্তম্ভিত চোখমুখে উদ্বেগের কালো মেঘ নামল।

কোথায় আছে এখন? আকাশ জানতে চাইল।

অজানা আশঙ্কায় তন্দ্রা হাতের গেলাসটা টেবিলের ওপর রাখল।

হঠাৎ কেন যে সেদিন পরিচয় হল! রিসিভার রেখে আকাশ অস্ফুট স্বগত উচ্চারণ করল। তারপর তন্দ্রার জিজ্ঞাসু চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, থানা থেকে ফোন। অনির্বাণদা বাস এ্যাকসিডেণ্টে মারা গেছেন। সঙ্গে ধূপ মিষ্টি আর ফুলের মালা ছিল। হয়তো শ্রাদ্ধ বাড়িতে যাচ্ছিলেন।

থানা থেকে তোমার ফোন নম্বর জানল কেমন করে? অবাক তন্দ্রা জিগ্যেস করল।

সেটাইতো আশ্চর্যের। আকাশ আরও অবাক করে জানাল, হাসপাতালের বেডেও অনির্বাণদা-র জ্ঞান ছিল। রক্ত দেয়ার দরকার ছিল। প্রচুর রক্ত। কেন জানিনা, সেদিন আলাপের পর থেকে ওঁকে খুবই আপনজন মনে হচ্ছিল। আমাকেও উঁনি নিশ্চয়ই ভালবাসতে শুরু করেছিলেন। তা না হলে ফোনে আমাকে কেন ডাকতে বলেছিলেন!

উত্তেজনায় আচমকা আকাশ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমাকে এক্ষুণি একবার পি জি হাসপাতালে যেতে হবে। নিউজটা কনফার্মড্ হলে ওখান থেকে সল্টলেকের ঠিকানায় যাব।

সামনের খাবার ফেলে যাবে! আকাশের আচরণে ক্ষুব্ধ তন্দ্রা প্রায় আর্তচিৎকার করে উঠল, যা ঘটবার সেতো ঘটেই গেছে। খেয়েদেয়ে একটু দেরিতে গেলে কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হবে?

সে তুমি বুঝবে না।

সত্যিই বুঝতে পারছি না, কেন তুমি এতটা বাড়াবাড়ি করছো। অবাক তন্দ্রা আশাভঙ্গে আহত হয়ে বলল, হঠাৎই তুমি যেন আশ্চর্যরকম অন্যরকম মানুষ হয়ে গেছ। কিন্তু কেন?

প্লীজ আমাকে ক্ষমা কর। আকাশ সরল স্বীকারোক্তি করল, মানুষমাত্রই কম-বেশি আবেগ-আপ্লুত, হৃদয়মন-তাড়িত।

তন্দ্রা মুখে আর কোনও রা কাড়ল না। নিঃশব্দ অনুসরণে নির্বাক শোকাহত আকাশকে পোশাক পাল্টে অতিদ্রুত বেরিয়ে যেতে দেখল। আজকের বিশেষ দিনটিতে অপ্রত্যাশিতভাবে নিঃসঙ্গ হয়ে হতাশায় বিষণ্ণ হলেও দুঃখউত্তীর্ণ খুশিমনে ভাবল, এবার অন্তত আকাশ অশৌচের নিয়মরীতি মানবেই।

*ছবি ঃ ইন্দ্রনীল ঘোষ*

# চিরাচরিত

ট্রেনটা থেকে যাত্রী বলতে একা সৌগত নামল। পরনে আঁটসাঁট জিনস, গায়ে ব্যাগি। চোখে রোদ-চশমা। গালভরা কাটছাঁট বাহারি দাড়ি। মাথায় রুখুসুখু লম্বা চুল। কাঁধে ঝুলছে ক্যামেরা আর এয়ার ট্রাভেল ব্যাগ।

ফ্লাগ স্টেশনটা শুনশান। শুয়ে থাকা আয়েসী বেড়ালের মতো নিচু নির্জন প্লাটফর্ম। কোনও শেড নেই। ইট সিমেন্টের বেঞ্চ আছে দু'টো। কয়েক হাত অন্তর কয়েকটা ঝাঁকড়া রাধাচূড়া গাছ। একটার নীচে টিউবওয়েল। কাছেই পরিত্যক্ত ভাঙা ওয়াগনের গুদামঘর। ছোট্ট স্টেশন ঘরটার সামনে ঝুলছে একখণ্ড চেরা রেল লাইনের ঘণ্টি।

ফাঁকা প্লাটফর্মে নিঃসঙ্গ দ্বীপের মতো সৌগত। বোবা বাতাসে ভাসছে বুনো পাতা আর মাটির সোঁদা গন্ধ। মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যায় এক ঝাঁক বনটিয়া। ট্যাঁ ট্যাঁ ডাকে সাময়িক টুকরো টুকরো হয় নৈঃশব্দ্য।

সৌগত নিউজ এডিটরের দেওয়া নকশা নির্দেশ নিশানায় নজর বোলায়।

এখান থেকে মিনিট পাঁচেক হাঁটলে কেঠো পোল। শীর্ণ কিশোরী খাল পার হলে সাপ্তাহিক হাটখোলা। ডানদিকে কিছুটা বাঁক নিলে শহরগামী পাকা সড়ক। যেতে হবে শহরের উলটো মুখে সড়কের দৌড়ছুট স্থলে। লোকালে দেড় আর দূরপাল্লার এক্সপ্রেস বাসে আধ ঘণ্টার পথ ময়নামতীর ঘাট। খেয়াঘাট অব্দি বাস যায় না। বাস স্ট্যাণ্ড থেকে তিন কিলোমিটার ইট নুড়ি মাটির রাস্তায় ভরসা বলতে ভ্যান রিকশা। মাথা গুনে ভাড়া। পা ঝুলিয়ে বসা।

নদীর ধারে বাঁধ উঁচু জায়গাটাতে শ্মশান মন্দির। মন্দিরের গা ঘেঁষা নাবাল খেয়া ঘাট। অন্যদিকে চালাঘরের কয়েকটা দোকানপাট। তাড়ি গাঁজা চুল্লুর ঠেক আর পাঁচঘর বেশ্যার কারবার আছে। একটাই চায়ের দোকান। তাতে তেলেভাজা ঘুগনি মুড়ি পাওয়া যায়। পান বিড়ি আর অল্পদামের সিগারেটও মেলে।

খেয়া চলাচলের সময়টুকুতেই যা মানুষজন। বাকি সময় খাঁ খাঁ। রাতের ঘুরঘুট্টি অন্ধকারে আলো বলতে কেরোসিনের লম্ফ। শীতে সাড়ে ছয় গ্রীষ্মে আটটায় শেষ খেয়া। তার আগেই দোকানপাটের ঝাঁপ পড়া শুরু হয়। ক'জন দোকানি শেষ

খেয়ায় ওপারের গাঁয়ে ফিরে যায়। তারপর গা ছমছম। শব্দ বলতে শুধু শেয়াল কুকুরের চিল্লানি। পেঁচাও ডাকে কদাচিৎ।

খেয়ায় নদী পেরিয়ে ওপারে যেতে হবে। তারপর.....

আপাতত এইটুকু পড়ে ক্ষান্ত দেয় সৌগত। একটা সিগারেট ধরায়। ধোঁয়া উড়িয়ে সড়ক সন্ধানে পা বাড়ায়।

কলার কাঁদির মতো ঝুলন্ত যাত্রীদের লোকাল বাস দেখে অবাক হয় সৌগত। দীর্ঘক্ষণ এক্সপ্রেস বাসের জন্য অপেক্ষা করে নিরাশ হয়। শেষমেশ অনেক কষ্টে জোড়াতালি ঝঝ্ঝর একটা লোকাল বাসের মাথায় গাদাগাদি জায়গা পায়। ঢিমেতালের সেই বাসটাতে খেয়াঘাটে পৌঁছাতে বেশ বেলা হয়ে যায়।

এখন ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুর। বৈরাগী আকাশ। বিষণ্ণ নিস্তব্ধতায় কাক ডাকছে কা-খ্‌খা কা-খ্‌খা। ঘুঘুও ডাকছে মাঝে মধ্যে। নদীতে জেলে ডিঙি ভাসছে কয়েকটা। খেয়া নৌকাটা ওপারে গাঁয়ের ঘাটে বাঁধা।

এসময় বেশ কিছুক্ষণ পারাপার বন্ধ থাকে। এই অবসরে ভাত ফুটিয়েছে চায়ের দোকানি ধনঞ্জয়। আজ আর তরকারি না, ডাল সেদ্ধ করে চুনো মাছের ঝাল চচ্চড়ি চাপিয়েছে। এমন সময় প্যাঁক প্যাঁক হর্ন শুনে অবাক হয়ে অচেনা শহুরে বাবুটিকে নামতে দেখে।

দোকানের সুমুখে এসে দাঁড়ায় সৌগত। বাবুটি যে নির্ঘাৎ ওপারে যাবেন নিশ্চিত অনুমান করতে পারে ধনঞ্জয়। চটজলদি উনান থেকে রান্না নামিয়ে কালিঝুলি মাখা চায়ের কেটলিটা ফের আঁচে বসায়। তারপর গায়ে পড়া দরদ দেখায়, আগের খেপের রিকশাটা ধরতি পারেন নাই বুঝি! মুশকিলে পড়লেন যে। ফের খেয়া তো সেই আড়াইটায়।

ঘড়ির কাঁটার দিকে তাকিয়ে সৌগত দেখে, পাক্কা দেড় ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে। মেয়ে মদ্দ ঠাসাঠাসি ভিড় এড়িয়ে একা আসতে যাওয়াটা যে মস্ত ভুল হয়েছে তা বুঝতে পারে। রুমালে শরীরের ঘাম মুছতে মুছতে জিগ্যেস করে, মাটির ভাঁড়ে চা হবে?

এজ্ঞে ওসবের তো চল নাই ইখানে। খাতির করে সুমুখের বাঁশ বাখারির বেঞ্চিতে বসতে বলে ভরসা দেয়, গরম জলে রগড়ে গেলাস ধুই দিব?

তাই দাও। সঙ্গে আনা ড্রাই লাঞ্চ প্যাকেট খুলে বসে সৌগত। ভাবনার মশা ছেকে ধরে; নির্দেশমতো তত্ত্বতালাশ কভার করে আজ কি ফেরা যাবে? অজ পাড়া গাঁয়ে কে কোথায় থাকতে দেবে। বিশেষ করে পঞ্চায়েত প্রধানের বিরুদ্ধে ধর্ষণ খুন গুমের তদন্তে এসেছে শুনলে কেউ কি আর নির্ভয় সুনজরে দেখবে?

কলাই করা তোবড়ানো গেলাসে খাবার জল এগিয়ে দেয় ধনঞ্জয়। ভাল করে ধোয়া কাচের গেলাসে এনামেলের মগ থেকে দুধ ঢালে। টুকরো কাপড়ের ছাঁকনিতে টিনের কৌটো থেকে গুঁড়ো চা নেয়। ছাঁকা চায়ে চিনি নাড়তে নাড়তে জিগ্যেস করে, কলিকেতা থিকি আসতিছেন বাবু?

হ্যাঁ।

গাঁয়ে কুটুমবাড়ি যাচ্ছেন বুঝি? চায়ের গেলাস এগিয়ে দিয়ে জানতে চায়, কাদের ভিটেয়?

সন্দিগ্ধ চোখে জবাব এড়িয়ে যায় সৌগত। চায়ের গেলাসে চুমুক দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করে, হেতালখালি গাঁয়ের খবর জানা আছে কিছু?

নাম শুনেছি। যাওয়া হয় নাই কোনওদিন। কিন্তু সে তো অনেক দূর। বড্ড লেট করি ফেলছেন।

সেটা সৌগতও বুঝতে পারছে, কিন্তু উপায় কী? রিপোর্টারদের জীবনটাই এরকম। ওপরঅলার ইচ্ছা নির্ভর খোরাক জোগানো চাই। আজকাল সরকারি তদন্ত কমিশনের ওপর বিশ্বাস আস্থা নেই মানুষজনের। সংবাদপত্রের নিজস্ব প্রতিবেদনকেই বেশি গুরুত্ব দেয় তারা। গতরে মোটা পার্টির নেতারাও তাই ভয় পায় সমীহ করে। চিফ সঞ্জয়দা বলেছেন তদন্ত রিপোর্টটা যুতসই হলে অঞ্চল প্রধানের বাবা মন্ত্রীও বিপাকে পড়বেন। ধাক্কা সামলাতে সরকার হিমসিম খাবে। ন্যাচারালি পত্রিকা অফিসে তোমার ভাগ্যটাও খুলে যেতে পারে।

সেই আশাতে জড়তা কাটিয়ে বুক বাঁধে সৌগত।

সৌগতের জিম্মায় দোকানটা রেখে গঙ্গাস্নান করতে যায় ধনঞ্জয়।

বুড়ো বটের ছায়ায় অবশ হাঁটু মুড়ে আধ বাঁকা কুঁজো হয়ে বসা বুড়িটাকে খতিয়ে দেখে সৌগত। শিরা জাগা মাংসহীন শরীর। সরু লিকলিকে পায়ের আঙুল অবধি আধ ছেঁড়া ময়লা কাপড়ে ঢাকা। মাথায় এক থোপনা বিধবা চুল। ফোকলা দাঁত, তোবড়ানো গাল কোটরগত চোখ। শুকনো ফাটাফাটা ভাঁজ পড়া চামড়া। ঝুলে পড়া শুখনো বুক পাংশু মুখ।

ধনঞ্জয় ফিরে আসে। দেখতে পেয়ে কঞ্চির লাঠিটায় ভর করে দাঁড়ায় বুড়িটা। হাতে এনামেলের তোবড়ানো গেলাস, থালা। গুটি গুটি পা ফেলে দোকানের সুমুখে এসে বসে। ছানিপড়া চোখ কুঁচকে বিহ্বল তাকিয়ে জিগ্যেস করে, তুমি কে গা? কোন গাঁয়ের?

চিনবে না। আমি খবরের কাগজের লোক।

খপরবাবু? তা কোন মতলবে এয়েচো?

খুক খুক কাশে বুড়িটা। হাঁপানির ধাত আছে বোঝা যায়। বুকে জমা কফ উঠে আসে। থুক ফেলে হাঁপায় বেশ কিছুক্ষণ। তারপর ফের জানতে চায়, কোন গাঁয়ে ঝাতিচ?

চিনবে তুমি? নিরাসক্ত জবাব দেয় সৌগত, হেতালখালি।

চিনবুনি! চমকে দেয় বুড়িটা, মুই ঝে হেতালখালির পদ্মরানি। বাপের নাম সুধন্য সদ্দার। বিন্দুবালা মোর গভ্যধারিণী জননী।

বুড়ি সম্পর্কে উৎসাহী হয়ে ওঠে সৌগত। কিন্তু আলাপ জমাবার সুযোগ পায় না ধনঞ্জয় এসে পড়ায়। বুড়ির এনামেলের থালায় খাবার ঢেলে দিয়ে যায় ধনঞ্জয়। রোজ যেমনটি করে তেমনই এঁটো বাসনকোসন রাখে। দু'মুঠো অন্নের বিনিময়ে ওগুলি ধোয়া বুড়ির কাজ। এছাড়া অনেক ফুটফরমায়েস খাটে যেটুকু গতরে ধরে।

একটা নেড়িকুত্তা হাজির হয়ে বুড়িটার কাছে ঘুরঘুর করে। এক হাতে কঞ্চির লাঠি দেখিয়ে তাড়িয়ে তফাতে রেখে থালার খাবার খায় বুড়িটা। তারপর মাটিতে পোঁতা জালার জলে বাসন ধুতে চলে যায়।

সৌগতের প্রশ্ন উত্তরে ধনঞ্জয় জানায়, হপ্তা দুয়েক আগে কোত্থেকে এসেছে বুড়িটা কে জানে। প্রথমে আপদ মনে হলেও এখন মায়ায় জড়িয়ে গেছে। রাতে দোকানটা ওর হেফাজতে থাকে। শেষ খেয়ায় গাঁয়ে ফেরার আগে মুড়ি খেয়ে শুয়ে পড়ে বুড়িটা। বাইরে থেকে তালা মেরে যায় ধনঞ্জয়।

বিড়ি ফোঁকার পর ধনঞ্জয়ের চোখে ভাত-ঘুম আসে। দেয়ালে ঠেস দিয়ে ঝিমোতে থাকে। বটের ছায়ায় বুড়ির কাছে গিয়ে বসে সৌগত। টি সি এম সোনি ক্যাসেট রেকর্ডারের বোতাম টেপার আগে বলে, খেয়া তো সেই আড়াইটায়। ততক্ষণ তোমার সম্পর্কে কিছু বল শুনি।

কী বয়ান শুনতে চাও তুমি?

তোমার জন্ম জীবন বৃত্তান্ত। শুনতে শুনতে সময় কেটে যাবে।

হেতালখালির সুধন্য সদ্দার স্বদেশি করত। নড়ে চড়ে বসে ফ্যাসফেসে গলায় বলে, ইদেশ থিকিন লালমুকো বিটিশদের তাইড়েছ্যাল ঝা-রা সুধন্য তাদির মধ্যি একজনা। মুই সেই বাপের বেটি পদী। পাটশালায় পড়াত মোর বাপ। মুই ঝ্যাকুন চোদ্দো বছরের কচি কাঁচা বাপ ব্যে দিতি মনস্ত করল। বিস্তর তালাশ কর্য্যেও যুগ্যি পাত্তর মেলে না। শেষমেশ একঝনাকে মনে ধরল। তিন কাল গ্যে এককালে ঠেকা ঘাটের মরা মুই ঝাব বলি পা বাইড়্যেই আচি। তাই মরণকালে নাম ধরচি। বুকের পাটাঅলা দেড় কুড়ি বয়সের সেই তেঝি পালোয়ান গোঁয়ার আকাট পাত্তরের নাম গুরুপদ ঘরামি। বাপের পাটশালায় ছাত্তর ছ্যাল। কিন্তু কচি বয়সে বাপ মা মারা

ঝাতি নেকাপড়া ছাড়ন দেছ্যাল। বাপের চাষীবিত্তি করত। বগায়িৎ চাষীর অধীনে জনমজুর খাটত। কুডুল কোদাল চালাত নজর কাড়ার মতন। আর তেঝি বলদের ন্যাজে মোচড় দি হালচাষের ঝা কেরামতি ঝানত তা কী আর কইব। নামটা ছ্যাল যতার্থ। আর দশজনির মতন নেশা ভাঙ করতুনি। বারমুকোও ছ্যালুনি। সাদাসিধা অভাবী জেবন কাটাত। নেশার মদ্যি ফুরসত পেলি বাঁশের বাঁশির মকশ। উদাসী সুর ভাজত। কেত্তনের দোহার টানত। যাত্তার বাজনদারদের দলি ফুলুটও বাঝাত। মাত্তর শাঁকা সিন্দুর নিভ্‌বর কণ্ঠিবদল হল মোদের। গাঁটছড়া বাঁদার দশ বছরের মদ্যি মুই এক গণ্ডা বিয়েন দিনুন। তবু সোয়ামী সোহাগ করি কইত, তুই পদী এতটুকুন গতরশূন্য টসকাসনি। দিন দিন বাহারী চাঁদবদনী হতিচিস।

বুক উজাড় করা একরাশ দীর্ঘশ্বাস ওড়ায় পদী। যেন নিজেকেই শুধু শোনাতে নিচু স্বরে বলে, বেশিদিন বেঁচ্যে থাকলি কে কইতে পারে শেষ অব্দি ক'গণ্ডা ফসল তুলত সে চাষী।

হয়তো বিশেষ কোনও স্মৃতি পদীবুড়িকে উদাস বিষণ্ণ করে তোলে। কথা থামিয়ে গুম মেরে বসে থাকে। সৌগত নিরাশ হয়ে একটা সিগারেট ধরায়। ধোঁয়া উড়িয়ে ফের ক্যাসেট রেকর্ডারের বোতাম টেপার আগে বলে, দোষ নিও না ঠাকমা। অসময়ে কীসে মরল তোমার সোয়ামী?

নাকের পাটা ফুলে ওঠে পদীবুড়ির। আড়মোড়া ভেঙে বসে। গলার স্বর গভীরতর হয়, দুয দুর্মতির জন্যি। অন্যায় অবিচের দেকলি ল্যাঝ্য কতায় বেয়াত করতুনি ঝে। মু ফোঁড় হক কতা শুইন্যে দিত। ইটভাটার খগা পাল ধানকলের বীরু মণ্ডলরা ছ্যাল অক্তচোষা ডাকাবুকো বেচরিত্তির পাঁজী। ভয়ে গাঁয়ের নোক রা কাড়তুনি। মোর কাট গোঁয়ার সোয়ামীই পোতম মু খুলতি সাহস ধরিছ্যাল। সিবার ফসলের দর বাড়তি জমিদার খাজনা বাড়াতি কইলেন। তা জমিদার খাজনা বাড়াবার হকদার তো বটেই। জন্ম থিকিন শুনা কতা, সরকারি মতে জমিদাররাই গাচ পুকুর জমির মালিক। ভাগচাষের পোজাদের কাজ শুদুন চাষ আবাদি। আদাআদি ভাগাভাগি। মুই বুঝ্যাতি চাইনুন, তুমি তো ভাগচাষীও না। বাপের ঝে তিন বিঘা ভাগচাষের জমি ছ্যাল নিজির চিকিচ্ছের জন্যি গচ্ছিৎ রেক্যে ছাড়াতি পারেনি। সব্যোস্য খুইয়্যে নিজে মোল তুমারেও মারল। দিনরুজি তুমার খাজনা ন্যে মাতাব্যাতা কীসে! মুরুক্কু পদীর সোদা কতা গোরায্যি করলুনি। বলে কিনা, সি আইন আর নাই এ্যাকুন। ফসলের দর বাড়িচে তো কি? চাষের খরচ সোমসারের খরচাপাতিও তো বাড়িচে। খরা বানে ফসল তো কম নষ্ট হয় না।

পাঁচ গাঁয়ের অভাবী চাষীদের মতাবব্বর বনতি গেল মিন্‌সে। খেপান পরামশ্য

দিতি নাগল সক্কলকে, কেউ বাড়তি খাজনা দিবা না। জোট বাঁদো। দরকার হয় মাটে কাজকাম বনদো। চাষের সময় চাষীদের দাদন দ্যে ফসলের সময় কম দরে ধান খরিদের মতলবি ধানকল মালিকরা ঘোঁট পাকানি উসকানি দিতি নাগল। ফের ধানকলে চাগরি দিবার নোভ দেকালো। ব্যস্ ভস্সা প্যে জমিদারের কাচারি সিরিস্তায় খাজনা সুদের দর কষাকষি পেলয়ঙ্কর গণ্ডগোল।

তা জমিদারের ট্যাকের ঝোর আচে। তার পাইক লাটিয়ালের সঙ্গি যুঝদি গেলি ফারবে কেন! কিচু নোকের কোমরে দড়ি হাতে হাতকড়া পড়ল। ভয়ডরে উলটাপানা অনেক চাষী সটকি গেল।

ইদিকে ভুট এসলো। ভুটের কাজিয়ায় তো জ্ঞাতিগুষ্টি কুটুম পড়শিদের মদ্যিও ভেদভাগ হারাহারি। পিথিমিতে সাথ্যপর নোকই বেশি। চোর চূড়ামণির পাটি কাঁড়ি কাঁড়ি চাঁদি ছইড়্যে পনেরো আনা ঝাঁকের নোককে দলে টানল। গুরুপদ রইল একরত্তি সজ্জনদের ফালিতে।

আদতে ল্যাঝ্য কতাবার্ত্তায় ঝে ঝাঁজ তিতকুঁটা সোয়াদ—তাতি আমল দিত না গুরুপদ। তো শত্তুর বাড়বিনি তো কী!

মোর মা মোলো। বাপ গেরুয়া রঙ ছোপ কাপড় পরি বোরেগী হল। ভুটে ঝে খাঁজ খোঁড়ল ধরল তা আর জুড়লুনি দেকে তীত্থ করতি গেল। একানে হয়ি পড়নুন মোরা। আকেরে নাকাল নাজেহাল বেইজ্জতির একশেষ। ধোপা নাপিত বনদো। পেরায় একঘরে হাল। গাঁয়ে টেকা দায় হয়্যে দাঁড়াল।

আষাঢ় শাবুণে চাষীর ঘরে অভাব হাহাকার থাকে। গুরুপদ তো পরনিভ্ভর দিনরুজি মজুর। একঘরে মানুষটাকে কাজকাম দিতি ডর পাতি নাগল অনেকে। ফি রোজ কাজ পায় না। বেগতিক দেখ্যে বুকে খেদ ধরি হাজা খাস জমিতে হাল ধরল। ভাদ্দরের মাজ বরাবর অব্দি চাষ আবাদের সময়। অতচ আকাশে তেমুন জল দ্যাকুন নাই। তাতিই কষ্টেসিষ্টের ফলে বীজ ধানের ঝা লকলক চারা গজাল! তাইতি দশজনির নজর নাগায় কাল হল।

আন্ধার থাকতি মাটে ঝেত মরদটা। বেলায় জমির তড়ে ঢ্যাঙা কদম গাচের ছায়ায় আকের গুড় দ্যে মুড়ি খেয়্যে ফের কাজে নাগত। দুকুর গইড়্যে গ্যে চ্যান খাওয়া করত। বিকিলের দিকি ফের মাটে ঝেত। সিদিনও বেরুলো। রেতে বীজ চারার বোঝ ন্যে ঘরে ফেরার কতা, ফিরলুনি। খাঁড়ির তড়ে কালঘুমে পড়িছ্যাল অত বড় লাসটা। পাঁকাল সারা শরীলে চাপ চাপ অক্ত। খুপরিটা থ্যাতলানু। খুনেরা ওরই কুদাল দ্যে গুমখুন করিছ্যাল।

ধন্যি আশ্চয্যি গাঁয়ের নোকেরা। নোক দ্যাকানো জমাদার চৌকিদার পুলিশের

সুমুকে মুয়ে কুলুপ এঁট্যে কেন্নো হয়ি রইল। উলটি কিনা মনগড়া ঝুটা কুচ্ছিৎ অপবাদ চাউর করল। মোর সোয়ামী নাকি সরকারি খাতের জল চুরি করতি গেচ্‌ল।

ভাল মানুযটা তো সগ্য সুকে চলি গেল। মুই পড়নুন মহাবিপাকে। পাঁচ পাঁচটা জঠরের জ্বালা যন্তন্না। খোরাকি মিলবে কোত্থুনে?

ইদিকে খরালির আকাল হাহাকার। ঝিনিসপত্তরের আগুন দরদাম। ঘটিবাটি বিককির করি কদ্দিন আর চলে? কিন্তুন রাত পুইলেই ঝে পেট চুঁই চুঁই। পেটে ধরা শত্‌তুরদের হা অন্ন হা অন্ন চিল চিল্লানি। মহা মুশকিল। তাহলি কি পেরানঘাতিনী হব?

নিরন্ন নোকেদের গতরটাই ঝা শেষ ভস্‌সা। অবস্থার গতিকে গতর খাটাতি ছুটনুন। পোতম খগা পালের ইট ভাটায়। ফের বীরু মণ্ডলের ধানকলে। কেষ্ট নস্করের চাল ডালের আড়তে। পাটের পাটোয়ারী পাঁচু অদিকারীর থানে। কিন্তুন কোতাও হপ্তা অব্দি তিষ্টোতি পারনুননি। পারব কেমনি? বেওয়া হলিও পদীর ঝে ত্যাকুনও নজর কাড়া শরীল। গতরের চাইতি সিদিকিই ঝ্যাত নোভানি ছোঁচামি। শরম ভরম ভুলি সিঝে কি নকনক নোলাঝরা মতিচ্ছন্ন আদেকলাপনা!

রাহুর দশায় পড়া হাভাতে অভাগির ত্যাকুন ভস্‌সা কী?

ছ'মাস এগুনে বিয়োন দিতিগ্যে ভবানী রায়ের কুলবতী সোনার পিতিমা বউটা বেসময়ে গত হয়েচে। আদ্যিক্যেতা দেক্যে বছর না ঘুরলি ফের ছাতনা তলায় যাবিনি বলি মনস্ত করেছে ভবানী। নিজে পেসারের ধাতে ধরা বেতো রুগী। দেড়গণ্ডা কাচ্চা বাচ্চার ঘর সোমসার সামাল দিতিগ্যে প্যাঁচে পড়া দুগ্গতি বিড়ম্বনা। ভবানীর গরজেই অগতির গতি হল পদী। ভাবনুন, বিধাতা পুরুষ বুঝি মু তুলি চাইল।

কিন্তুন মুই ঝে আটকপালি। কপালে গেরো থাকলি ঝা হয়। রিষ্টি অত সহঝি ছাড় দ্যায় কখুনো। নৈলে খরালির পর ফের বিরেমছাড়া সব্বোনাশা ঝড় বাদলা এসতে ঝাবে কেন!

আতিবিতি খাল বিল নদী নালা খেতজমি টইটম্বুর, তাই ক'দিন নাগারে টিপটিপ বিষ্টি হচ্ছিল।। পুন্নিমের মাঝরেতে বড়খুকির ডর ডাকে ঘুম ভাঙতি আকাশ থিকিন হালুম হুলুম হাঁকডাক কানে সেঁদুলো। নীর জলের গোঁ গোঙানি শুনতি বুঝনুন, বান্দ ভাঙিছে নিশ্চয়। কেরাস তেলের লম্ফ হাতে ঝাপ খুলতি দেকি, হুড়মুড় ক্ষ্যাপা বেনো জলের সোত্ বইচে ঝমঝম বিষ্টি ঝরিচে। হাঁস গাই বাচুর শ্যাল কুকুর বেড়াল ভাসিচে। তোড়ে গাছ চালাঘর পড়তি নাগল মড়মড়। ছরকট দুগ্গতি দেকি ব্যাটাবিটিদের ন্যে চালায় উটনুন। বাকি রাত ভগমান ভসসায় ছেঁড়া ক্যাতা জইড়্যে বসি রইনুন।

ভুরে আকাশ পাতলা হল। কোলের শত্তুরগুলাকে এগুনে পার করনুন। ফের লটবহর পোটলা পুঁটলি মাতায় ন্যে দশজনির মতন আস্তান নিনুন কোতায়? দিনের ব্যালায়ও যেতা গা ছমছম করে সেই হীরুবাগের ফ্যালনা সাপখোপের ভূতুরে ভাঙা বাড়িতে। সিকান থিক্কি মোদের চালাঘর ভূইয়ে পড়ি জলে ভাসার খপর পেনুন।

জল সরল দু'হপ্তা পরে। তদ্দিনি কোঁকে ধরা শত্তুররা ভেদবমি ন্যাবা কালাজ্বরে বুক কোল ধু ধু করি বেবাক পাইল্যে গেল। ব্যাটাবিটি ভাতার খাকি মুই একানে পেরানে বাঁচি রইনুন। ভবানীর ভিটেতি নাচার মোর পাকাপাকি আস্তান হল। আঁচলে উটল চাবির গোছা।

নেকাপড়া ঝানা মানীনোক ভবানীর পিতরি পুরুষেরা ছ্যাল জমিদার। তাদির যক্ষির ধন দালান ইমারত নাটমন্দির বাগানবাড়ি বিষয় আশয় ধানগোলা জোতজমি আগলাতি বন্দুক রাখত ভবানী। গোলঘর হাল বলদ কিষাণ মনিষ চাকর গারোয়ান—কি ছ্যালনি! ঠাকুদ্দার নামি দাতব্য চিকিচ্ছার হাসপাতাল বাপের নামি ইস্কুলের পেসিডেন নিজে। ইউনোন বুডের মেম্বর গাঁয়ের মোড়ল মাতব্বরও বটে। মামলাবাজ হলিও নামগান পূজাআচ্চা দান ধ্যান করত। বাঁদ বাঁদতি সড়ক গড়তি জলকল বসাতি ট্যাকা দিত।

নাটমন্দিরে ভাগবত রামায়ণ তরজা যাত্রা কবিগান হত। ফের এস ডি ও ম্যাজিস্টর পুলিশ সাহেব উকিল মোক্তারদের জন্যি বাগানবাড়িতে মজলিস বসলি ছিনাল মাগীও এসত।

হলিওবা ঘসামাজা কালাপনা ভবানীর গিঁট গিঁট গড়ন, ঝুটা দাঁতপাটি। কাটা কাটা চোকের নম্বা ধোবদুরস্ত নোকটার ভাবগতিক মন্দ লাগত না। মাজিমধ্যি এক আদটুকুন নেশা টেশার ধাত ছ্যাল এই ঝা। তা ধনী নোকদের অগাদ টাকার জন্যি ওরকম মতি মরজি মেজাদ থাকতিই পারে। তাতি দুষ ধরতেনি। মুইও ধরতুন না।

দেড় গণ্ডা ছ্যানাপোনার ঘর গেরস্থালি সামাল দেয়া কি কম ঝক্কি ঝামিলি! হেঁসেলঘর নয়তো ঝেন যজ্ঞিবাড়ি। ধান সেদ্ধ ভানার কাজ ভাঁড়ার ঘর তদারকি। অসুক বিসুকে সেবাযত্তন্ন আত্তি। কাপড় কাচি শুকোতি দেয়া, ঠাকুর ঘরে চন্দন বাটা পান সাজা—ভূতগত খাটুনি। গতর খোয়ানো ধকলে হয়রানির একশেষ। তবু মোর কোনও খেদ ছ্যালুনি। বরং সদয় নোকটার একানে বেজার মু দিকলি দরদ হত। ভাবতুন, হতি পারে কেলো কার্তিক, কিন্তুন বেসময়ে বউ খোয়ানো সোমত্ত মদ্দ তো বটে।

ত্যাকুন কি আর ঝানতুম ঝে, মোকে আস্তান দেয়ার পিছনে ওই নোকটারও ইষ্টি আছে। আসলিতে নোকটার মিনমিনা ভাবটা ভেক ছাড়া আর কিছু না। মাস

গড়াতি খোল খুলি পড়ল ভবানীর। বেনজ্জ বেহায়া উসকুস ন্যাকাপনা করতি নাগল। জ্বর হওয়ার অজুহাতে পত্য বাল্লি আর কোবরেজের ঠেঙে আনা মকরধ্বজ খাইয়্যে দিতি বলত। মাতা ধরলি টিপি দাও। গা গতরে ব্যাতা ছটপটানিতে টেপো সেঁকতাপ কর। নিত্যি নতুন বায়না।

একদিন হেঁসেলের বেরাম্মন ঠাকুর এলুনি তো কুটনা কুটা রান্নায় হাত নাগাতি হল। কাটের উনান আঁচে গা গতর জ্বলতি নাগছিল। শরীলে চটচটি ঘামের বোটকা গনদো। অবেলায় খিড়কির ঘাট বাঁদানো পুকুর থিকিন ফের চ্যান করি ফিরতিচি। উদোম গায় আঁচল ঢাকা। অগুছালু ভিজা চুল। হু হু বাতাসে শরীল শিরশির করতি নাগছে। ক্যাঁটাল গাছের নিচি চমকি উটি। নজ্জায় পড়ি আদ হাত ঘোমটা টানতি গ্যে আরেক নজ্জা বেইর্যে পড়ার অবস্তা। গাছের আড়াল থিকিন চ্যান করা দেকতিছ্যাল ভবানী। ধরা পড়তি এতটুকুন শরম দেকা গেলুনি!

পরদিন ছ্যাল বাদুলে। সকাল থিকিন নাগারে অনাছিষ্টি বিষ্টি। অমাবস্যির ঘুরঘুট্টি রাত। বাতাসে অঘ্রুণের পাটপচা গনদো। ঘরে কেরাচ তেলের টিমটিমা আলো। চোকে ঘুম এস্ছিলুনি। চোখ মুয়ে জল দিতি ফের একবার চানঘরে ঝাব বলি আগলটা ভেজানো। চুপি চুপি মোর ঘরে এস্লো কেলোমুঅলা ভবানী। আগলের হুড়কা আঁটি দাঁড়াল। নিঃশ্বেসে হাঁপানি খটমটে চাউনি। মোর বুকের ভিত্রে সি কি ধুকপুকানি। শয়তানটার ইষ্টি আঁচ করতি বাকি রইলুনি। মুই নিরস্ত করতি চাইনুন। কিন্তুন পোড়াকপাল ঝে। মেয়েদের ঝ্যাতই গতর দাপট থাক না আফিংখোর গেঁজেল মোদো ঢ্যামনার দবদবামি টিট করার মুরোদ ধরে কখুনো?

পরপর তিন রাত্তির কোন আনতি বিনতি শুনল না ক্ষ্যাপা নিদ্দয় দিগম্বরটা।

মুই থানায় এজাহার দিতি পারতুন, কিন্তুন খটকা লাগল। আইনির চোকে গাঁয়ের মানী মোড়ল পায়াভারী মাতব্বরদের নিপট হওয়ার নজির নমুনা কি নক্ক করা যায়? বিচের ব্যাভস্তাতো রাজা উজির কেষ্টবিষ্টু আর দণ্ডমুণ্ডের কত্তাদের জন্যি। গরিব দুকীদের ঝাতনার বয়ানে কে আর আস্তা রাকে। খোলা চোকের আইন থাকলি কি আর নচ্চার ওঁচা নোকগুলা বুক ফুইল্যে কয়েদখানার বাইরি থাকতি পারত। না কি হেতালখালির পারু জবা নক্কী মনসা মানদাকে পেরাণঘাতিনী হতি হয়।

নাপাক মুই কিন্তুন পেরাণঘাতিনী হনুননি। কেন ঝান? ত্যাকুন ঝে মজাহাজা জমিতে ফের লাঙল বীজ পড়িচে। অক্তে চাষবিত্তিতো খসাই কেমনে! তাই কোঁকে জমিদার বীজ ধরি এক নিশুতি রেতে কাপড়ের পুঁটলি বাঁদনুন। খিড়কি পেইর্যে বাগান দ্যে দইপাঁক পত ধরি জন্মভূমি গাঁকে পেন্নাম করি দেশান্তরী হনুন।

বুক উজাড় করা দীর্ঘশ্বাস উড়িয়ে বিরতিবিহীন বর্ণনা থামায় পদীবুড়ি। সূর্য দিক পরিবর্তন করায় ডালপালা পাতার ফাঁকে একচিলতে রোদ্দুর এসে মুখে পড়েছে। বিব্রত বিষণ্ণ দেখায় পদীবুড়িকে।

ক্রমশ পর্যায়ের ধারাবাহিক পড়া দেখাশোনার মতো অস্বস্তি অনুভব করে সৌগত। ভেবে অবাক হয়, কে বলবে হাঁপানির ধাত ধরা বুড়িটার বুকে কফ কাশি জমে আছে।

ওপারের খেয়া নৌকাটাকে ছাড়তে দেখে সৌগত। এপারেও যাত্রী আসা শুরু হয়েছে। ভাত ঘুম থেকে উঠে ধনঞ্জয় প্রস্তুত। নির্বাক বিস্ময় চোখ মুখে ধনঞ্জয় এদিকেই তাকিয়ে আছে।

খেয়া নৌকোটাকে ক্রমশ এগিয়ে আসতে দেখে সৌগত ঝটিতি সিদ্ধান্তে আসে, গুলি মারো নিউজ এডিটরের অর্ডার। অজুহাত একটা কিছু বানিয়ে দেখানো যাবে। চাকরি তো যাবে না। শেষটুকু না শুনে কিছুতেই হেতালখালি যাওয়া নেই।

যথেষ্ট আন্তরিক হয়ে ওঠে সৌগত। যত্ন করে পদীবুড়িকে তুলে ধরে। ছায়া ঘেরা নির্জন নিরালা মন্দিরের চাতালে বসায়। ধনঞ্জয়ের দোকানে চা খেতে যায়।

নিজে খেয়ে পদীবুড়ির জন্য চা বিস্কুট নিয়ে আসে সৌগত। খেয়া চালু হওয়ায় যাত্রীদের ভিড় বাড়ছে। ওপারের খেয়ার যাত্রী নামায় ব্যস্ত ধনঞ্জয় সৌগতের আচরণে অবাক হলেও কিছু জিগ্যেস করার ফুরসত পায় না। কপালে শুধু রেখা ফুটে ওঠে।

ক্যাসেটের পিঠ উলটে সৌগত প্রস্তুত। কাঁপা কাঁপা হাতে চায়ে ডুবিয়ে বিস্কুট খায় পাদীবুড়ি। তারপর চায়ে ফুঁ দেয়। গেলাস নাড়ে। চুমুক দেয়। দীর্ঘক্ষণ ধরে চা খায়। শেষে গেলাসের তলানিতে পড়ে থাকা ভেজা বিস্কুট আঙুল ঢুকিয়ে মুখে তুলে নেয়।

পান খাবে ঠাক্‌মা?

সুপুরি ছাড়া।

গেলাসটা ফিরিয়ে দিয়ে পান নিয়ে আসে সৌগত।

বীজটাই আসল গো বাছা। পানটা মুখে পুরে পদীবুড়ি বলে, এই ঝ্যামুন তুমি। ব্যাভোহারেই টের পাচ্ছি ভাল জাতের। ভগবান তোমার মঙ্গল করবে।

সৌগত বিব্রত বোধ করে।

খেয়া তো এস্‌লো। সৌগতকে চুপচাপ বসে থাকতে দেখে পদী বুড়ি শুধায়, ওপারে ঝাবেনি?

না ঠাক্‌মা।

কেনে?

তোমার মুখ থেকে বাকি কথা শুনব বলে। টেপ রেকর্ডারের বোতাম টেপে সৌগত।

গঞ্জের ইধার উধার সাত ঘাট ঘোরা মহাভারত শুনতি গেলি মাস কাবার হয়ি যাবে গো খপরবাবু। তার চাইতি সতেরো বছর পরের বেত্তান্ত শুনো।

শেষমেশ মুই বিবিগঞ্জের রেল নাইনির ধারি বস্তিতে ঘাঁটি গাঁড়নুন। নাইনের ওপারে নাবাল জমি। নিকটেই ইস্টিশান। বিস্তর মাল গুদাম। বগি থিকিন মাল খালাসের জন্যি টিরাকের নাইন নাগত। ডেরাইভার কুলি কামিন খালাসিদের ভিড় নেগেই থাকত। তাবুর ছাউনির নিচি ছাতু নংকা ভাত রুটির হোটেল ছ্যাল। ঝুপড়ির চায়ের দুকানের পিছনে ধেনো গাঁজা তাড়ির আড্ডায় তাস জুয়ার আসর বসত। সিকানে আকছার বদমাইস নোকেদের গতায়াত ছ্যাল। অবরে সবরে কাজিয়া কোন্দল বোম পটকা গোলাগুলি চলত। রেতের বেলায় তো রীতিমতন চোর বাটপারদের সগ্গ রাইজ্য। নজরদার পুলিশ থাকলি কী হবে! বাঘ গরুতি গলাগলি পীতির বন্দোবস্ত। নুকাছুপা বেশ্যামাগী ধরতি আসি পুলিশও মাগনা ফুর্তি মারি ঝেত।

ইস্টিশনের পশ্চিমের ইস্‌কুলে পড়তি ঝেত বিমলি। ত্যাকুন তুঙ্গি বয়েস। ডবগা সিয়ানা। গায় গতরে দেকতি শুনতি নজর কাড়ার মতন। না বললি ধরার উপায় ছ্যালুনি ঝে মোর কোঁকে ধরা কেলোকার্তিক ভবানীর বিটি।

বিমলির সোন্দর যৈবন দেকে বস্তীর ঝেউড়ীরা চোক টাটাত। ত্যাঁদড় নুচ্চা বকা বাচাল ব্যাটারা ছোঁক ছোঁক করত। ইশারা সিটি দ্যে পিচ্‌নে নাগত। আকাট বিটিটাকে ফুস্‌লি ব্যে করার নোভ দেকাত। বিমলি আমল দিতুনি।

কিন্তুন ঝেকানি বাঘের ভয় সিকানি সনদে হয়। ইস্‌কুলের মাস্টারের পয্যন্ত কুনজর। বেহাল গতিক সামাল দিতি বিমলির ইস্‌কুলে নেকাপড়া ছাড়ন দিতি হল। ঘরে বসি ক্যাঁতা সিলাইয়ের কাজ শিকাতে নাগনুন। মুই কিন্তুন কুলটা হইছিনুননি। গুল ঘুঁটে বাইন্যে বস্তায় ভরি ফিরি করতি ঝেতুন।

সারা দুকুর ঘরে একানে থাকত বিমলি। সেই খোলা সময়ের তক্কে তক্কে থাকত নেতাই। নেতাই রিকশা চালাত। বাপ বলাই দিন রোজের মিস্‌তিরি। ঘরে নয় জন পুষ্যি। বলাই ছ্যাল বারমুকো। তার জন্যি রোজ রেতে মাগ ভাতার ব্যাটায় খিস্তাখিস্তি কাজিয়া মারপিট নেগেই থাকত।

হাবামি আর কাকে বলে? বয়সের দুষে নেতাইয়ের খপ্পরে পড়ি গেল বিমলি বিটি। একবারটি পরক করি দেকলুনি, নেতাইয়ের এত হাতখোলা ফুটুনির ট্যাকা আসে কোত্থুনে? নিশ্চয় আড়ালে গলদ কাজ কারবার করে।

কোন শলা পরামশ্যিই কানে ধরলুনি জিদ্দিবাজ বিমলি। উঠতি বয়সে মন মজলি

ঝা জিদ আর চোকের দশা হয় আর কি। দশজনির পরামশ্যে মুই ত্যাকুন দু'জনির ব্যে দিতি মনস্ত করনুন। শাঁকা সিন্দুর নিভ্ভর হলিও কিচু ট্যাকা তো হাতে চাইই। তাই একটুকুন সময় নাগছ্যাল।

আচমকা আক্কেল গুডুম। পুলিশের হাতে নেতাই ধরা পড়ল। রিকশার সিটির নিচি থিকিন চোলাই মদ বেরুল। উপ্‌রে বসে সওয়ারী বিমলি। চোরাচালানের সাউকারের গোলায় মাল দিতি যাতিছ্যাল জোড়ে।

পোতম পুলিশ চোকিতে ন্যে গেল দু'জনকে। ফের এক রাত্তির থানায় হাজতবাস। পরদিন একা নেতাইকে কোটে হাজির করতি তার সাজা হল। ঘানি টানতি কয়েদখানায় গেল নেতাই। থানার ছোট বড় বাবুরা মিলিঝুলি আইনের দণ্ড রদ করল বিমলির। খালাস প্যে বিমলি ফিরল বটে কিন্তুন কোঁকে ধরি ন্যে এস্‌ল পাহারাদারদের বীজ।

তারপর ঢিটিক্কার নংকাকাণ্ড খপর তো সেসময়কার সক্কলেরি ঝানা।

বিমলির ফটোক দ্যে কাগজে ফলাও নেকানেকি হল। চটকলের মজুর বিপিনের পার্টির নোকেরা ঝাণ্ডা ডাণ্ডার ডর লাইগ্যে দুকানপাটের ঝাঁপ ফেলল। আপিস ইসকুল গাড়ি ঘোড়া বন্দো করল। থানায় ধন্না হল।

ক'দিন নাগাড়ে চিল্লামিল্লি মিটিন হতি সরকার বাহাদুরের টনক নড়ল। ধেড়ে মন্তীরটা নড়ি চড়ি বসতি থানার বেবাক বাবুরা বদলি হয়ি গেল।

বিপিনরা ত্যাকুনকার মতন চুপ মারল বটে। কিন্তুন ভুটের সময় ফের বিমলির জন্যি দরদ উত্‌লি উটল। গঞ্জের পাঁচিলে পাঁচিলে পুলিশ আর বিমলির বাহারী ছক নকশা আঁকন হল বিস্তর। মিটিনে মিটিনে হাজিরির জন্যি বিমলির ডাক পড়তি নাগল। কত খাতির কদর। গাড়ি পাইট্যে নে ঝেত। সব্বোত্তর ক্ষ্যামতা দকলের এক রা মাগন, থানায় বিমলির ইজ্জত হরণের জবাব চাই। দুষির বিচের সাজা দিতি হবে। অপদাথ্থ পার্টিকে পরাস্ত কর। এট্টা ভুটও না।

তা বাপু সিবারকার ভুটে তো নোকেরা যুগ্যি জবাব দেছ্যাল। বিপিনের পার্টির নোকেরাই গুনতিতে বেশি জিতল। রাজা মন্তীর বেবাক পাল্টি গেল। কিন্তুন কোন পদাথ্থ এস্‌ল? সেই পুলিশ পল্টনরাই তো বহাল রইল। কোতাও কিস্যু হেরফের হলুনি।

রাম কোতায় ঝে রামরাজত্তি এস্‌বে!

তো ওই পুলিশি দাপুটের দরুনি পাঁচ বছরের নাথ্‌নি ঝিমলি আর বিটি বিমলিকে ন্যে গঞ্জ ছাড়ি শহুরে পাইল্যে এসতি বিপিনই পার্টি সুবাদে বন্দোবস্ত করি দেছ্যাল।

শহুরে আস্তানা বস্তির খুপরিটা ছ্যাল ঝিলের তড়ে। ঝিলের ওধারে রেল নাইন। ইপার উপার দু'দিকে বড়নোকেদের আকাশ ছুঁই পেল্লাই পেল্লাই বাহারী বাড়ি।

নিকটেই ইস্‌কুল হাসপাতাল বাজার। সাফসুফ পাকা সড়ক। রেতে ঝিলিমিলি বিজলি বাতি। থেটার বায়োস্কোপ ঘর। খোকাখুকিদের জন্যি খেলার মাট। আরও কত কী ঝে!

ইদিকি শাল বাঁশ খুঁটির খুপরি ঝুপরি চালাঘর। কঞ্চি ছেঁড়া চট পলিথিন তেরপল ঢাকা। ক'জনার আবার মেটে দেয়াল টুটাফুটা টিন টালির চালঅলা ঘরও ছ্যাল। খাটা পাইখানা পাঁকে ঠাসা ড্রেন। কাচা কয়লার ধুয়া মশা মাচি বদগন্‌দো। কুকুর মুরগি বেড়াল ইঁদুর। বাসিন্দে বলতি কশাই মেতর ধাঙড় মিস্‌তিরি ডেরাইভার দিন মজুর—কারা ছ্যালুনি? চোরা চালানি পাকি ধরা অক্ত বিক্‌কির করা নোকজন থাকত ক'জনা। রেতে ভদ্দরনোকদের শরীল দিতি ঝেত কয় মাগী। চুলাই মদ জুয়া সাট্টার আকড়াও ছ্যাল। নিকটেই পার্টি অপিস পুলিশ চোকি থাকলিও চোর বাটপাড় লুচ্চা গুণ্ডাদের হয়রানির খামতি ছ্যালুনি।

মোর সেই সাবিকি কারবার—গুল ঘুঁটে বাইন্যে ফিরি করা। কিন্তুন অম্বলে কাহিল হতি বস্তির হোমপ্যাত দেকাতি অ্যানিমি ধরলিন। তাবিচ কবচে কাম হবিনি কইলেন। গতর নরম হতি নাগল। ঘরে বসি কাগজের ঠোঙা বানাত বিমলি। বস্তির মাতব্বর বাঁকা গুণ্ডোকে ধরি হাতপাতালে মাসির কাজ ধরল।

ফি রোজ কাজ মিলতুনি বিমলির। সিকানেও নাইন থাকা চাই। বাঁকার দলের হাবুর উপর ভস্‌সা। হাবু হাসপাতালের মাসিদের মাতব্বর। এক মাসিকে দ্যে পাঁচ রুগির কাজ করাত হাবু। মাসিরা পেত একজনার ট্যাকাই। তাতিও কমিশন চাই।

তো ওই মাসির কাজ ধরাই বিমলির কাল হল। রেতে ডিব্‌টি পড়ত। ফিরতি বেলা হয়ি ঝেত। একদিন রেতের ডিব্‌টি করি আর ফিরলুনি তো চিরদিনির জন্যি নিপাত্তা। পরে বাঁকা কইছ্যাল, হাবু নাকি বিমলিকে ব্যে করার নোভ দেক্যে ফুস্‌লি কালীঘাট ন্যে গেছল। এক হপ্তা মজা মারি বিক্‌কির করি দেছে। মুই হাবুর কাছে নে ঝাতি কইচিনু। বাঁকা ডর নাইগ্যে মানা করল।

এই পর্যন্ত বলে ফের নির্বাক বিষণ্ণ উদাস হয়ে পড়ে পদীবুড়ি। চৈত্রের আকাশের মতো বৃষ্টিহীন চোখের পাতার ঝাপ ফেলে। বিবর্ণ পাতা ঠোঁট কাঁপে।

টেপ রেকর্ডার অফ করে বিরতি টানে সৌগত। টান টান উত্তেজনায় কব্জি ঘড়িতে সময় দেখে। এরপর দিনের আলো নিস্তেজ হয়ে আসবে। তাই ক্যামেরাটা বের করে ক্লিক ক্লিক ফটো তোলে কয়েকটা। বুড়ির দু'টো স্ন্যাপ নেয় ক্লোজ আপে। তারপর একটা সিগারেট ধরাতে গিয়ে থমকে যায়। ধনঞ্জয়ের দোকানে তাজা তেলেভাজা হচ্ছে। বাতাসে খুশবু ভেসে আসায় জিভে জল আসে।

তেলেভাজা খাবে ঠাক্‌মা? সৌগত জিগ্যেস করে।

না বাপ। অম্বলে বুক পেট জ্বলি পুড়ি ঝাবে।

পদীবুড়ির মুখ থেকে খপরবাবুর বদলে বাপ শুনে বিব্রতবোধ করে সৌগত। আত্মময় উদাসী হওয়ার আগেই নিজেকে চেষ্টাকৃত সামলে নেয়। তেলেভাজা খাওয়ার দুরন্ত ইচ্ছায় লাগাম টেনে ধরে।

ঝিমলির কী গতি হল ঠাক্‌মা? টেপ রেকর্ডার অন করে উৎকণ্ঠিত কান পাতে সৌগত।

ঝ্যাদ্দিন কচি কাঁচা ছ্যাল কোনও ঝামিলি হয়নি। কিন্তুন গোরীমুকী ডাগর ডুগুর হতি হালগতিক খারাপ হতি নাগল।

খোঁচা ন্যাংচা কেলো নাণ্টা আর ফাটাফেলুরা পাটির ঝাণ্ডা ডাণ্ডা ধরা বেখাপ বদখত বদমাইশ। চাল চুলা ছিলুনি। রোয়াক আর বস্তির কিলাবে তাস জুয়া ক্যারাম খেলত। গেলাস গেলাস চা গিলত। বায়োস্কোপের গান আর সিটি দ্যে মেয়েদের পেছন নাগত। সিগ্রেট বিড়ি মদ গাঁজা হিরুইন—কোন নিশা বাত্‌ ছিলুনি। মাস কাবারী কামাই করা চাগরি কারবার করত মনে হতুনি। কিন্তুন কোত্থুনে ঝে এ্যাত ট্যাকা পাত বুজতুননি। পাঁচ ব্যাটাই ঝিমলির দিকি নালচ নজর দিত। এক একজনা একানে মোকে খাতির যত্তন্ন দেকাত। ধানাই পানাই করত। ঠারে ঠুরে নাথ্‌নি জামাই হতি চাইত। ঝেন সক্কলেই যুগ্যি পাত্তর।

তো নাথ্‌নি তো মোর দৌপতি হতি পারবিনি। বাকি চারজনারে ঘাটাই চটাই কোন ভস্‌সাতি? হাপিত্যেশী পাঁচজনার মতলবেই জল ঢালি দিনুন আগু থাকতি। ব্যস আর পালাই কোতা। এমনিতি ঝিমলির জন্যি নিজিদের মধ্যি লণ্ডভণ্ড আঁকশা আঁকশি। সক্কলে খারিচ হতি এককাট্টা হয়ি মদ গিলি হাজির একদিন। কি ঝে হম্বিতম্বি তড়পানি। কানে ছ্যাঁকা নাগা মু ছোটানি। নুটিশ দ্যে গেল। ঝিমলিকে অন্য থানে ব্যে দিলি নংকাকাণ্ড হবে। মোর ধড়ে মাতা থাকবিনি।

ইসব কতা পাঁচকান করা সমীচীন মনে করনুন না। কিন্তু মন উচাটন ডরে ঘুমুতি পারতুননি। বিপাকে পড়ি আড়ালে বিশ্বেস যুগ্যি ক'জনার কাছে নুটিশ বেত্তান্ত পাড়নুন। তারা ভস্‌সা তো দিলুইনি উল্টি সাতপাঁচে না থাকতি চাওয়া ব্যাভোহার করতি নাগল।

সিদিন বিপিনের বিপক্ক পাটির ছোঁনা বল্টু টোটা ওরা ধুরে কোতায় ফুর্তি করতি গেচল। রাত্তিরে ঝে ফেরার কতা না তা গু খেকোর ব্যাটারা ঝানত নিশ্চয়। নৈলি অমন কুকম্মটা সিদিনই করল কেন। সোমত্ত ছুঁড়ি ঝিমলি। চোত বোশেকের ভ্যাপসা গরমে তিষ্টোতি পারছিলুনি। রেতে শুতি ঝাবার এগুনে বস্তির ট্যাপকল থিক্কিন ফের চ্যান করল। তারপর কোমরের কষি আলগা করি আদুর গায় নড়বড় তক্তপোষের

উপ্‌রে ছেঁড়া মাদুর পাতি ঘুম্যে পড়ল।

মুই মেঝেয় আঁচল পাতি চোক বুজি শুই ছ্যানুন। ঘুম এসতিছিলুনি। বেঘোর ঘুমের নিশুতি রাতদুপুরে দুমদাম নাতির ঘায়ে ঝাপ ভাঙি পড়ল। মোরা ধড়মড় করি উটিবসছিনু। কেরাচ তেলের লম্ফর আলোয় দেকি, সুমুকে দাঁইড়্যে পাঁচ মাতাল। হাতে পিস্তোল গুপ্তি ভাঙা বোতল। চোকগুলি হোঁদড়ের মতন।

কুটিল কুমতি আঁচ পাতি মুই ঝিমলিকে আড়াল আগলাতি গেনুন। পালের গোদা খোঁচা তা হতি দিলুনি। মুই পা ধরি বিন্‌তি করনুন। বুনোগুলা শুদুন হাড় পাঁজরা কাঁকালে নাতি ঘুষিতি ক্ষান্ত দিলুনি। ফের মোর কাপড় দ্যে হাত মু ঠ্যাং বাঁদল।

ঝিমলি দাপাদাপি ধস্তাধস্তি করি পাঁকাল মাছের মতন পিছলুতে গ্যে পারলুনি। ওর মুয়ে বিষ পোকার কামড় বস্যে হাতের জাঁতাকলে চাপি মাটিতে চিতিয়ে ফেলল। শাড়ি শায়া ছিঁড়ল। মোর চোকের সামনি। ফরফর পাঁচ পশুতে দড়কচা নাথ্‌নিটার উপরে নিদ্দয় কাজ করল। অক্তে মাটি ভাসি গেল। গ্যাঁজলা মুয়ে বেদম ছুঁড়িটা বেহুঁশ হয়ি পড়ল। মোর দাঁতকপাটি নাগল।

ফের কী হল ঝান? চিরাচরিত ঝা হয়। কোমর তলপেট তার নিচি টনটনানি যন্তন্না ন্যে হাসপাতাল গেল ঝিমলি।

ইদিকি বন্দ মিটিন শোরগোল। কাগজে ফলাও নেকানেকি। ক'দিন চাঁই চাঁই পাটি পুলিশবাবুদের গতায়াত। পুলিশি গাড়িতে সাদাসিদা নোক ধরাধরি। বস্তির বেবাক ছাপোষারা ভয়ডরে খোন্দলে সেঁদিয়ে গেল। মানী ভদ্দোরনোকেদের মুয়ে কুলুপ। বিপিন পাটির মাতব্বররা গা বাঁচাতি রা কাড়লুনি। হাত পা গুইট্যে অকেজো মৌনী হয়ি রইল। গা ঢাকা দেয়া পাঁচ পশুর হদিশ মিললুনি। পাটির এক সতীলক্ষী নিশ্চিন্তে নুকনো পাঁচ কাপুরুষের হয়ি নিদ্দোষ সাটিফিকিট দেল। আর মোদের খুঁত ধরি মিটিনে নানান আকতা কুকুতার গাওনা গাইল।

হাসপাতাল থিকিন গবরমিণ্টের উপ্‌কার আকড়ায় গেল ঝিমলি। নোক দেকানো তদন্ত পাটি বসল। কিন্তুন হাকিমের এজলাসে খাঁচায় দাঁইড়্যে দশজনার সুমুকে সাক্ষী সাবুদ দেবে কার ধড়ে এ্যামুন মাতা আচে? একজন ছ্যাল। কিন্তুন একদিন শুননুন, সেই ঝিমলি আকড়ার চ্যানঘরে মনোস্তাপে গলায় ফাঁস লাগ্যে পেরাণঘাতিনী হয়েচে। আর সাক্ষী সাবুদ রইলুনি। সব ধামাচাপা পড়ি গেল। গোমুক্কু গরিব ছোটনোক হলিও ইসব ছলছুতা কুটকচালি মগজে ধরতি না পারার কতা না।

নাথ্‌নির মরণ খপর শুনি মুই কিন্তুন এট্টুকুন বিলাপ করনুনি। ঝাড়া হাত পায় নিশ্চিন্ত হনুন, বেঁচ্যে থাকলি ঝিমলি হয়তো বাতাস নাগা বীজ ধরি পোয়াতি হত।

ফের এক আটকপালি জন্মাত। নয়তো কী? ধরিত্তির কোনও ভুলচুক নাই। বীজটাই আস্‌লি। বিটিশদের রাজত্তিতে এই পদীর জন্ম। কুলবতী পদীতো লালমুকো লুটেরাদের বীজ ধরেনি। বেওয়া পদী বেবুশ্যে ছ্যালুনি। কিন্তুন স্বরাজ দ্যাশে এই অভাগী আর তার বিটিকে কীসের জন্যি কাদের বীজ ধরতি হইছ্যাল? ক্ষ্যামতা দকলে নতুন পাটির রাজত্তিতে ঝিমলির বেলায় হেরফের হল কিচু? আজ অব্দি গা গঞ্জ শহুরে তো কত নোক দেকনুন। কিন্তুন মানুষ কুলে জন্ম ন্যে তাদের মদ্দ্যি মানুষ ক'জনা? বিষ বাতাস নাগা বীজের দুষকাটাতি পারবা খপরবাবু?

কোনও উত্তর খুঁজে পায় না সৌগত। খতানো তত্ত্বতালাশ ফাঁপা কচকচানি লেখালেখি অনর্থক মনে হয়। নদীর ওপর দিয়ে ছুটে আসা আচমকা বাতাসে চুল এলেমেলো হয়ে যায়। শিরশিরানি অনুভূতি আক্ষেপ অভিমান দূর হটিয়ে সিদ্ধান্তে আসে, ধরিত্রীর কাছে ফিরে যাবে আবার। জন্ম থেকে আজ ইস্তক না-দেখা বাবা সম্পর্কে দুঃখিনী মা-কে কোনওদিন আর বিব্রত করা প্রশ্ন নয়।

*ছবি ঃ ইন্দ্রনীল ঘোষ*

# গতিপ্রকৃতি

সত্য সাঁপুই সাতপাঁচ রোগে অনেকদিন থেকেই ভুগছিল। হালে একরকম প্রায় বিছানা ধরা। সত্তর ছুঁই ছুঁই বয়স হয়েছে। যাই যাই করেও গত হচ্ছিল না। হঠাৎই সেদিন চোখ ওল্টানো অসাড় দেহটাকে চিত হয়ে হাঁ করা মুখে পড়ে থাকতে দেখে মরা মানুষ মনে হয়েছিল।

গোটা বাড়ির লোকেদের গাঁ-ঘর কাঁপানো সে যে কি মড়া-কান্না!

নেতাই তবু বাপের হাঁ করা মুখে গঙ্গাজল ঢালেনি। বিশ্বাসই হচ্ছিল না যে, বাপ আর বেঁচে নেই। নেতাইয়ের মনে হল, সবে তো সন্ধ্যে। কেঁদে বুক ভাসানোর জন্য গোটা রাত পড়ে আছে। যাচাই না করে আগাম কেন দুঃখ করা?

মাথা বেশ ঠাণ্ডা রেখে নেতাই পাঁজর বের করা বাপের বুকে মুখ নামাল। ছাল ছাড়ানো মুরগীর মতো বুকটা উঁচু হয়ে আছে। কান পেতে যেন চিন চিন ধুকপুকানি টের পাচ্ছিল। তাহলে কি খাঁচা ছেড়ে প্রাণটা এখনও পালায়নি?

কষ্টের জান সহজে যায় না।

হতে পারে সে এখন সংসারে নিষ্প্রয়োজনের বোঝা, কিন্তু বাপ বলে কথা। ছোট বয়সে মা হারিয়েছে নেতাই। বয়স থাকতে বউ মরতে বাপ তো ফের বিয়ে করতে পারত! গাঁ ঘরে আকছার তা হচ্ছে। সত্য শুধু নেতাইয়ের মুখ চেয়ে তা করেনি। নেতাইকে মায়ের অভাব টের পেতে দেয়নি। সবসময় বুকে চোখে আগলে রেখেছে। তবেই না আজ তিন ছেলেমেয়ে, বউ আর বাপকে নিয়ে সুখের সংসার গ'ড়তে পেরেছে!

জন্মদাতা হল গিয়ে মাথার ওপর ছাদ, ছাতা, গাছের মতন। তা সে ফুটোফাটা ন্যাড়া হোক না কেন! আকাশের মতো একটা কিছুর তলায় থাকতো মনে হয়।

তো বাপকে বাঁচাবার জন্য যে-কোন বেটারই শেষ অবধি চেষ্টা চালানো উচিত। সেটাই তো মানুষের ধম্ম। নেতাই পুণ্য করবে বলে বাপের বুক থেকে মুখ তুলল। বড় বেটা জগু সত্যর ন্যাওটা নাতি। নেতাইয়ের নিকটেই থ মেরে দাঁড়িয়ে। মুখে সাড়াশব্দ নেই। দু'চোখ দিয়ে শুধু জল গড়িয়ে পড়ছে।

'কাঁদিস না বাপ'। নেতাই উঠে দাঁড়িয়ে জগুর কাঁধে হাত রাখল, 'মনে হচ্ছে

এখনও প্রাণ আছে। চটজলদি ছুটে যা দেখি। হীরু ডাক্তারকে একবারটি ধরে নিয়ে আয়।'

টাকার খাঁই আছে বলে অনেকেই হীরু ডাকাত বললে কি হবে, লোকটার গুণও আছে। জল ঝড় শীত রাতবিরেতে যখনই ডাক পড়ে, ঠিক সাড়া দেয়। নিজে প্রায়ই হাঁপানি রোগে কষ্ট পায়। তবু যে কোন রোগীর কষ্টে দরদ আছে। যেখানে রিকশা যাওয়ার মতো রাস্তা নেই, সেখানে সাইকেল ভরসায় যেতে কসুর করে না। সবচেয়ে বড় গুণ নিজের বোধগম্য রোগ না হলে অযথা সময় নষ্ট করে না। রোগীকে কলকাতার হাসপাতালে নিয়ে যেতে বলে।

হীরু ডাক্তার এসেই সত্যর চোখের পাতা দু'টো নামিয়ে দিল। হাঁ করা মুখ বন্ধ করল। তারপর নাড়ি দেখে উঁচু ঢিবির মতো বুকটাতে দু' হাতে ঘন ঘন চাপ দিল।

সত্য তা হলে মরেনি! এতক্ষণ মরেছে মনে করে যারা বুক ফাটিয়ে কাঁদছিল তারা বেবাক অবাক। সত্যর দেহটা নড়ছে চড়ছে। বুক পেট উঠছে নামছে। কিন্তু চোখ মেলছিল না সত্য।

হীরু ডাক্তার বেশ গম্ভীর। চোখ মুখে দুশ্চিন্তার লক্ষণ স্পষ্ট।

সত্যর বুক পরীক্ষা করল হীরু ডাক্তার। তারপর যন্ত্র দিয়ে রক্তচাপের গতিপ্রকৃতি পরখ করল। চিনি নুন আর এক গেলাস গরম জল আনতে বলে সঙ্গে আনা ডাক্তারী বাক্স খুলে বসল।

ইনজেকশন দেওয়ার পর হীরু ডাক্তার নিজের হাতে সত্যর মুখে কয়েক চামচ নুন চিনি মেশানো জল ঢেলে প্রথম কথা বলল, 'তোমরা কেউ একজন কিছুক্ষণ অন্তর এভাবে জল খাওয়াও। প্রেসার ভয়ানক লো। মনে হচ্ছে হার্ট ব্লকড্ কেস। এক্ষুণি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া দরকার। দেরি করলেই বিপদ।'

নেতাই মনে মনে ভাবল, বিপদের আর বাকিটা কি আছে! নামেই চন্দননগর। নগরের কোন সুযোগ সুবিধাই নেই। জায়গাটা এখনও পঞ্চায়েতের অধীনে। হাসপাতাল কোথায় পাবে? সেই তো ছুটতে হবে কলকাতাতে। ট্যাক্সি ধরে আনতে হবে বাটামোড় থেকে। সে বেটারাও আর এক ডাকাত! সুযোগ বুঝে মিটারে যেতে চাইবে না। কন্ট্রাক্টে ভাড়া হাঁকবে তিন গুণ।

হীরু ডাক্তারের জন্য রিকশা দাঁড়িয়ে আছে। ফিরবে বলে তৈরী হয়ে হতভম্ব নেতাইয়ের দিকে তাকাল, 'সময় নষ্ট করছো কেন? কাউকে ট্যাক্সি ধরে আনতে পাঠাও। আমাকে ছাড়ো।'

হাত বাড়িয়ে ডাক্তারী বাক্সটা নিল নেতাই। বাইরে পা বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আপনার কত?'

'চেম্বারে বিশ, ডাক পেয়ে বাড়ি এলে চল্লিশ। এ তো আমার বাঁধা রেট। রাতে এসেছি তাই আরও দশ বেশি দেবে। ইনজেকশন পুশের জন্য দশ। তা হলে মোট দাঁড়াল গিয়ে ষাট টাকা।'

'আর রিকশা?'

'এমনিতেই একপিঠের ভাড়া তিন টাকা। বলেই নিয়েছে, অন্ধকার খারাপ রাস্তা। কিছু বেশি লাগবে। অনেকটা সময় দাঁড়িয়ে আছে। সব মিলিয়ে দশটা টাকা ওর হাতে ধরিয়ে দাও।'

মাসের শেষ। হিসেবের বাইরে খরচ। সঙ্গে যা ছিল, রিকশাঅলাকে দশটা টাকা দিয়ে নেতাই দেখল হাতে পঞ্চাশ আছে। ঘরভর্তি লোকজনের সামনে গোপন জায়গা থেকে ঘাটতি টাকা আনতে যাওয়ায় ঝামেলা অনেক।

কম টাকাটাই হাতে ধরিয়ে দিয়ে নেতাই বলল, 'দশ কম আছে। কাল আপনার চেম্বারে পেয়ে যাবেন।'

'আবার ধারটার কেন?' হীরু ডাক্তারের গলায় অসন্তোষ ফুটে উঠল।

'এখন একটু অসুবিধা আছে।' কারণটা নেতাই গোপন রাখল না। মা কালীর নামে দিব্যি কেটে ঋণশোধের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলল, 'বিশ্বাস করে দেখুন।'

'বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্ন আসছে কেন।' বিরক্ত মুখে হীরু ডাক্তার রিকশায় উঠে বসল। পাঁচখানা দশ টাকার নোট দু'বার গুনে পকেটে ভরে বলল, 'এই ধর যদি আজ রাত্তিরেই তোমার বাপ মরে? তা হলে কি কাল আর ওই বাকি টাকাটা পাঠাবার মতো পরিস্থিতি থাকবে? শোকতাপ পার হয়ে গেলে যদিও বা দিতে যাও, আমি নিতে পারব?'

হীরু ডাক্তারকে নিয়ে রিকশা চলে গেল। নেতাই বোবা গাল পাড়ল, নিতে পারবে না আবার! ডাকাত আর ডাক্তারের কোন তফাত নেই। হৃদয় মন বলে কিছু আছে নাকি ওদের! শালারা যে বালবাচ্চা বউ নিয়ে কেমনতর ঘরসংসার করে কে জানে!

সত্য চোখ মেলে তাকিয়েছে। অস্পষ্ট বিড়বিড় কথাও বলছিল।

নেতাই কিছুটা আশ্বস্ত হল।

জগু ছেলেটা বেশ চৌকস হয়ে উঠেছে। দু'চারজন বন্ধু জুটিয়ে ট্যাক্সি নিয়ে হাজির। অনেকে মিলে ধরাধরি করে সত্যকে ট্যাক্সিতে তুলল। নীরু বালিশ এগিয়ে দিল। কে যেন একজন মনে করিয়ে দিতে জগু এসে গেলাসের নুন চিনি মেশানো জলটুকু হাবুর স্কুলের ওয়াটার বটলে ভরে নিয়ে গেল।

ঘর এখন ফাঁকা। ট্যাক্সি ঘিরে পাড়া প্রতিবেশীর ভিড়। যারা সঙ্গে যাচ্ছে, তাদেরকে

উদ্দেশ করে নানা উপদেশ পরামর্শ নির্দেশের বন্যা বয়ে যাচ্ছিল।

'ছাড়তে দেরি করছো কেন?' ভিড়ের ভেতর থেকে কে একজন ধমকে উঠল। 'ছাড়বে কি। বাবা কোথায় বাবা?' পিছনের সীটে পা ভাঁজ করে শোয়ানো সত্যর মাথার কাছ থেকে জগু চিৎকার করল।

সামনের সীটে জগুর তিন বন্ধু ঠাসাঠাসি করে বসেছে। একজন হাঁক ছাড়ল, 'নেতাইকাকু এত দেরি করছ কেন? জলদি কর।'

নেতাই নিজের গোপন, বউ-এর গোপন আর লক্ষ্মীর ভাণ্ডার কুড়িয়ে কাছিয়ে সাকুল্যে শ' পাঁচেক টাকা নিয়ে বের হল। সত্যর ভাঁজ করা পায়ের কাছে কোনরকমে পাছা ঠেকিয়ে বসল।

নাবাল ভাঙাচোরা রাস্তা পেরিয়ে বজবজ সড়কে উঠবে ট্যাক্সি। সন্তর্পণে বাঁক নেওয়ার সময় ইমারতি মালগুদামের সামনে পঞ্চুকাকুকে দেখতে পেল নেতাই। সেখানে গাড়ি থামাতে বলল।

পঞ্চু কাছে এসে ঝুঁকে পড়ে বলল, 'মাল আসবে বলে গুদাম ছেড়ে যেতে পারছিলাম না। ধানুকে পঠিয়ে সব খবর শুনেছি। তোর জন্যই দাঁড়িয়ে আছি। হাসপাতালে গেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। চিন্তা করিস না।'

'আমার সঙ্গতি তো কারও অজানা নেই।' নেতাই মুখ বের করে ধরা গলায় বলল, 'ঘর শূন্য করে সর্বস্ব নিয়ে যাচ্ছি। কতটা কি লাগবে তা তো বুঝতে পারছি না। মদন পিশো আশুকাকাকেও একটু আঁচ দিয়ে রেখো। দরকারে তোমরাই তো আমার ভরসা।'

'সে হবেখন। খামোকা আর দেরি করিস না।' পঞ্চু দুগ্গা দুগ্গা বলে রওনা করিয়ে দেওয়ার আগে নেতাইয়ের মাথায় ঢুকিয়ে দিল, 'চাকরি সুবাদে সরকারী হাসপাতালে তোর বাপের তো কোন খরচখরচাই লাগবে না।'

ছোটবেলা থেকেই নেতাইয়ের ধারণা, সরকারী হাসপাতালের অযত্ন আর হেলাফেলা চিকিৎসার জন্যই মাকে অকালে মরতে হয়েছে। পরবর্তীকালে যে ক'বার অসুস্থ আত্মীয়বান্ধবদের দেখতে সরকারী হাসপাতালে যেতে হয়েছে তাতে ছেলেবেলাকার বিশ্বাসটা আরও প্রকট হয়েছে। জগু নীরু হাবুকে জন্ম দেওয়ার সময় পারুকে তাই শিশুমঙ্গল হাসপাতালে কার্ড করানো হয়েছিল। তখন অবশ্য এখনকার এই সরকারী চাকরিও করত না।

সারাটা পথ হাজার রকম অঙ্ক কষল নেতাই। শেষমেশ সত্যকে নিয়ে সরকারী হাসপাতালেই তুলল।

রাত এখন সাড়ে দশটা। এমারজেন্সি বিভাগে ঘুম ঘুম ভাব। ডাক্তারের ভাবসাবও

ঢিলাঢালা।

ঠোঁটে সিগারেট ঝুলিয়ে অলস গতিতে ডাক্তার এলো। সত্যর শিয়রের কাছে দাঁড়াল। অন্যমনস্ক প্রশ্ন করল, 'কি কেস? রোগীর প্রব্লেম কি?'

দু'চার কথাতেই জগু উত্তর সারল। তারপর পকেট থেকে হীরু ডাক্তারের ফরোয়ার্ডিংটা এগিয়ে দিল।

কাগজের লেখায় একপলক নজর ফেলে এমারজেন্সি-ডাক্তার আর সত্যকে ছোঁয়া দরকার মনে করল না। ইশারায় ঘরের কোণের খাঁচা দেখাল। টোকেন সংগ্রহ করে আনতে বলল।

খাঁচার লোকটি পাশে বসা সঙ্গীর হাত থেকে ভাগের খৈনি নিয়ে নিজের ওষ্ঠ টেনে ভেতরে ভরল। শিবনেত্র করে কিছুটা রস টেনে নিয়ে থুক ফেলল। তারপর মৌজ-মেজাজে জানতে চাইল, 'কি চাই?'

জগুর বন্ধুদের একজন মুখ কাঁচুমাচু করে বলল, 'ডাক্তারবাবু টোকেন নিতে বলেছেন।'

'দো রুপয়া দিন।'

এমারজেন্সি ডাক্তার নিজের চেয়ারে বসে টোকেনের ওপর কীসব লিখে দিয়ে বলল, 'এবার ক্যাশ কাউন্টারে যান।'

ক্যাশ কাউন্টারের উদ্দেশে ছুটল নেতাই। কিন্তু, কোথায় ক্যাশ কাউন্টার!

বিশাল হল ঘর পেরিয়ে যেতে হবে। দিনে দুপুর অবধি এখানেই আউটডোর রোগীদের জমাট ভিড় থাকে। লাইন লাগায়। হা-পিত্যেশ প্রতীক্ষায় বসে থাকা দরকার হয়। সেজন্য সিমেন্ট-বেঞ্চি আছে অনেকগুলো।

এখনকার ভিড়টা অন্যরকম। রাতের ফুটপাত আর রেল-প্ল্যাটফর্মের মতো। বেঞ্চি মেঝে জুড়ে শুয়ে ঘুমিয়ে বসে থাকা মানুষ। কেউ কেউ রাত জাগতে তাস খেলছে। এরা সকলে সঙ্কটজনক অবস্থার রোগীদের আত্মীয়বান্ধব। উদ্বেগ উত্তেজনায় পোড়া সিগারেটের ঝাঁঝাল গন্ধ ভাসছে বাতাসে। হলঘরটায় ধোঁয়া আর ধোঁয়া।

নেতাই সন্তর্পণে ফাঁকফোকর দিয়ে সকলের স্পর্শ বাঁচিয়ে ক্যাশ কাউন্টারে পৌঁছাল। কিন্তু লোক কই কাউন্টারে! খোলা কাউন্টারে মাথা ঝুঁকিয়ে নেতাই হাঁক মারল, 'ভেতরে কেউ আছেন?'

কাউন্টারে যার ডিউটি, সে লম্বা টেবিলের ওপর বালিশে মাথা রেখে শুয়েছিল। আধশোয়া অবস্থায় মাথা বাড়িয়ে দেখা দিল। আধো ঘুম জড়ানো চোখে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল।

নেতাই কাউন্টারের ফোকর দিয়ে হাত গলিয়ে এমারজেন্সি-ডাক্তারের কাগজগুলি

দিল। বিনিময়ে একখানা ফর্ম পেল। ফর্মের শূন্য স্থান ভরাট করে চাহিদা অনুযায়ী টাকা জমা দেওয়ার সময় জানাল, সে একজন সরকারী কর্মচারী।

'সঙ্গে সাবুদ এনেছেন কিছু?' লোকটি জানতে চাইল।

'আজ্ঞে না। তাড়াহুড়ো করে এসেছি তো।'

'যখন আনবেন, সুযোগ পাবেন।' লোকটি শুয়ে থেকে রসিদ কেটে বলল।

এদিককার ল্যাঠা চুকল বটে, সমস্যা অনেক এখনও।

রোগীকে নিয়ে যেতে হবে সিকি কিলোমিটার দূরে হার্ট ইউনিট ব্লকে। চাকাঅলা টেবিল চাই। সেজন্য সেলামি দেওয়া দরকার। দেওয়াও হল।

হঠাৎই নেতাইয়ের আশঙ্কা হল, বাপ বেঁচে আছে তো? হ্যাঁ আছে। বুক পেট ওঠানামা করছে। নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে অস্পষ্ট।

এদিকে হার্ট ইউনিটের কোলাপসেবল গেট তালা আঁটা, বন্ধ। ভেতরে মেঝেয় যে দু'জন নিশ্চিন্তে নাক ডেকে ঘুমোচ্ছে সম্ভবত ওরাই দারোয়ান লিফটম্যান।

জগুর এক বন্ধু কোলাপসেবল গেট নাড়িয়ে শব্দ তুলে ঘুমন্ত দু'জনকে জাগাল। দারোয়ান হাই তুলে মুখোমুখি এসে দাঁড়াল। এমারজেন্সি থেকে পাওয়া কাগজপত্র দেখার পর গেটের তালা খুলে দিল।

ওয়ার্ডমাস্টারও ঘুমিয়েছিল, লিফটম্যানের ডাকে জেগে উঠেছিল।

নিচেই রোগীর ই সি জি করা হল।

তারপর লিফটে চড়ে দোতলায়। কিন্তু, বেড কোথায়?

করিডোরের মেঝেতে স্ট্রেচার নামিয়ে দিয়ে চাকাঅলা টেবিলের সঙ্গে আসা লোকটি ফিরে গেল। বাপ বেঁচে আছে তো? নেতাই ফের একবার সন্দিগ্ধ চোখে সত্যর দিকে তাকাল।

জগু ওর তিন বন্ধুকে নিয়ে সিস্টারদের ঘরের দিকে প্রায় ছুটে গেল।

একজন সিস্টার চেয়ারে গা এলিয়ে আধো ঘুমে। চারজন শক্ত সবল যুবক এত রাতে ঘরে ঢুকে পড়েছে! হাউস সার্জেন কোথা থেকে ছুটে এলো।

হাউস সার্জেন গভীর মনোযোগ দিয়ে সত্যর কাগজপত্র দেখছিল। ঝড়ের বেগে নেতাই ছুটে এসে বলল, 'শিগগির আসুন ডাক্তারবাবু। পেশেন্টের গতিক ভাল না। গতরে খিঁচ ধরে বুকটা কেমন যেন ঠেলে উঠতে চাইছে।'

হাউস সার্জেন সত্যর ঠেলে ওঠা বুক চেপে ধরল। বারকয়েক আঘাত করল! আবার দু'হাতে চাপ দিল। অবশেষে সত্যর ওলটানো চোখ স্বাভাবিক হল। অস্থায়ী বিপদ সামাল দেওয়া গেল।

নিয়মমতো হরেক কাগজপত্রে সইসাবুদ করতে করতে হাউস সার্জেন বলল,

'আপনি পেশেন্টর কে?'

'আজ্ঞে ছেলে।'

'বাড়িতে ওরকম কবার হয়েছিল?'

'আজ্ঞে একবারই মাত্র।'

'আবারও হতে পারে। হার্ট ব্লকড কেস। ওরকম হলে মারাও যেতে পারে। এক্ষুণি টেম্পোরারি পেসমেকার লাগানো দরকার।'

'কত টাকা লাগবে সেটা কিনতে?'

'তা সাত আটশো হবে। বেশিও লাগতে পারে।'

'অত টাকা কোথায় এখন? অন্য কোন রাস্তা নেই ডাক্তারবাবু।'

'সঙ্গে টাকা থাকলেও যে এত রাতে যন্ত্রটা সহজেই পেতেন তা কিন্তু নয়।'

'তাহলে কি ওটার অভাবেও রোগী মারা যায়?'

'না। অন্য উপায় আছে। আপনি যদি পার্মানেন্ট পেসমেকার লাগাতে রাজী আছেন বলে লিখিত ডিক্লেয়ারেশন দেন তো হাসপাতাল থেকে এখনই টেম্পোরারি পেসমেকার লাগিয়ে দেব।'

'পার্মানেন্টটির দাম কত পড়বে?'

'তা ধরুন, বিশ বাইশ হাজার হবে।'

টাকার অঙ্ক শুনে হৃদকম্প দিয়ে নেতাইয়ের চোখ কপালে উঠল। কোথায় পাবে এত টাকা! নামেই সরকারী চাকুরে। আগে মাস গেলে বেতন মিলত তেরশো। স্কুল পেরুনো পাশ দেওয়া ছিল বলে হালে পিওন থেকে কেরানী হতে পেরেছে। তাতেই বা কি এমন বেশি পায় এখন? কেটেকুটে হাতে আসে মাত্র আঠারশো। মাগ্গি গণ্ডার বাজারে ওই টাকাতেই টেনেটুনে সংসার চালাতে হয়। বাপকে নিয়ে সাকুল্যে ছ'টি পেটের খাইখরচ কি কম? টুকটাক অসুখ বিসুখ তো লেগেই আছে। নীরু আর হাবুর না হয় স্কুলে পড়তে বেতন লাগে না। কিন্তু লেখাপড়ার অন্য খরচাপাতি কম কিসে? তারপর জগুটা যদি এবার আবার সেকেণ্ডারি পাশ করে তো কলেজে পড়তে ঢুকবে। তখন কত টাকা দরকার হবে।

ঠায় দাঁড়িয়ে নেতাই। চুলের ভেতর কপালে ঘাম জমে উঠছিল। মাথা ঠিকঠাক কাজ করছিল না। বাপের জমিজায়গা যা ছিল বেচে-খেয়ে এখন তো এসে দাঁড়িয়েছে একটুকরো ডাঙা একটা ছোট ডোবা আর চালাঘরের ভিটেমাটিটুকুতে। বউয়ের যেটুকু গহনা আছে তার সঙ্গে ঘটিবাটি বিক্রি করলেও তো অত টাকার ধারেকাছে পৌঁছানো যাবে না। তা হলে কি হাসপাতালে এনেও বিনা চিকিৎসায় বাপকে মরতে দেওয়া হবে?

একজন অ্যাটেনডেণ্ট এসে বত্রিশ নম্বর বেডের রোগীর গতিক খারাপ বলে জানাতে হাউস সার্জেন ব্যস্ত হয়ে উঠল। ঘর ছেড়ে যাওয়ার আগে বলল, 'আপনার পেশেণ্টের হালও কিন্তু মোটেই ভাল নয়। তাড়াতাড়ি ভেবে ঠিক করুন, কি করবেন?'

নেতাই ক্রমশ খেই হারিয়ে ফেলছিল। কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারছিল না। বিপদকালে নাকি বুদ্ধি লোপ পায়। অগত্যা জগু আর ওর তিন বন্ধুর কাছে পরামর্শ চাইল।

তিন বন্ধুর একজন বলল,' পেসমেকার নেওয়ার পরও যদি রোগী মারা যায়? তখন আপনার অবস্থাটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, সে দিকটাও আগেভাগে ভেবে দেখা দরকার।'

অপরজন নেতাইয়ের মগজে বিষ বীজ ঢোকাতে চাইল, 'শুনেছি, পেসমেকার যারা বিক্‌কির করে তাদের কাছ থেকে ডাক্তাররা কমিশন পায়। কে জানে, সত্যিই এত টাকার পেসমেকার আদৌ রোগীর লাগবে কিনা! ডাক্তারদের ধান্দাও তো থাকতে পারে!'

তৃতীয়জন অন্যরকম মন্তব্য করল, 'ফালতু এতসব ভেবে লাভ নেই। ডাক্তারদের ওপর বিশ্বাস রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। তা ছাড়া, টাকা তো আর এখনই লাগছে না। শুধু একখানা ডিক্লেয়ারেশন লিখে দিলেই যদি আপাতত রোগীর বিপদ কাটে তো দ্বিধা থাকা উচিত নয়। সত্যি মিথ্যা খতিয়ে দেখার সময় পরে অনেক পাওয়া যাবে। এটা তো সত্যি যে, রোগীর কন্ডিশন সিরিয়াস।'

সবশেষে জগু স্মরণ করিয়ে দিল 'পঞ্চুদাদু তো তোমাকে বলল শুনলাম, সরকারী চাকরির সুবাদে কোন খরচাপাতিই নাকি লাগবে না। ডাক্তারবাবু ফিরলে খোঁজ নিয়ে দেখলে হয় না?'

সেইমতো নেতাই কথাটা পাড়ল।

হাউস সার্জেন বলল, 'আপাতত আপনাকেই পেসমেকার কিনে দিতে হবে। ওদের কাছ থেকে টাকার রসিদ পাবেন। হাসপাতাল থেকে সার্টিফিকেটও পেয়ে যাবেন। তারপর নিয়মমতে ডিমান্ড করলে গোটা টাকাটাই আপনি গভর্নমেন্টের কাছ থেকে আদায় করতে পারবেন। তা হলে আর দেরি করছেন কেন?'

হাউস সার্জেন সইসাবুদের জন্য নেতাইয়ের দিকে দরকারি কাগজপত্র এগিয়ে দিল। জন্মদাতা বলে কথা! জগুর চোখে নিজেকে একজন সুপুত্র দৃষ্টান্ত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নেতাই আর সাতপাঁচ ভেবে সময় নষ্ট করল না। ঝটপট কলম চালালো। এবার সত্যকে ওটিতে নিয়ে যেতে হবে। ধারে কাছে হাসপাতালের

কর্মী খুঁজে পাওয়া গেল না। জগু আর ওর বন্ধুরা মিলেই নিয়ে গেল।

ওটি আর করিডোরের মাঝে কাচঘেরা প্রতীক্ষা-ঘর। রাতের প্রহরী সোফায় ঘুমিয়েছিল। আলো জ্বলে উঠতে ঘুম ভেঙে গেল। বিরক্ত হল। রোগী ওটিতে ঢুকে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে ফের আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ল।

এখন উদ্বেগ আর প্রতীক্ষা শুধু। নেতাই করিডোরে অশান্ত পায়চারি করছিল। হঠাৎ কৌতূহলী হয়ে পাশাপাশি দু'টি ঘরের জানলা দিয়ে উঁকি মারল। এক ঘরে বিরাট টেবিলের ওপর সটান ঘুমিয়ে আছে কে একজন। ঘরের আসবাবপত্র দেখে মনে হল, এটা বোধ হয় ডাক্তারদের রেস্ট রুম। অপর ঘরে হাউস সার্জেনটিকে দেখতে পাওয়া গেল। মশারির ভেতর আধশোওয়া একজনের সঙ্গে গভীর শলাপরামর্শ করছে বলেই মনে হচ্ছিল।

রাত প্রায় সাড়ে তিনটেয় সত্যকে ওটি থেকে বের করে আনা হল। হাসপাতালের কর্মীরাই নির্দিষ্ট বেডে নিয়ে গেল। ফিরে এসে সেজন্য উপযুক্ত বকসিসও নিল। কিন্তু হাউস সার্জেন গেল কোথায়? অনেকক্ষণ উদ্বিগ্ন অপেক্ষা করার পর দেখা মিলল। কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই জানাল, 'নাও হি ইজ আউট অফ ডেঞ্জার।' তারপর নাইট স্টে স্লিপ এগিয়ে দিয়ে বলল, 'নিচে গিয়ে থাকুন। আপনি যে গভর্নমেন্ট-এমপ্লয়ি সে সম্পর্কে কাল সার্টিফিকেট এনে দেবেন।'

হাউস সার্জেন চলে যেতে নেতাইরা একরকম প্রায় ঘেরাও হয়ে পড়ল। সকলেরই এক প্রশ্ন, 'অ্যাটেনডেন্ট লাগবে তো?'

অর্থাৎ কিনা, ওরা এক একজন সেই ব্যক্তি যে এত রাত অবধি নতুন রোগীর আশায় প্রতীক্ষা করছিল। নেতাই অবাক হল।

জটলার বাইরে নিকটেই দাঁড়িয়েছিল একা একজন। সে ইশারায় নেতাইকে কাছে ডেকে নিল। আরও কিছুটা দূরে সরে গিয়ে নিচু গলায় বলল, 'যারা আপনাকে ছেঁকে ধরেছে সব্বার পেশেন্ট ধরা আছে। আমারও। আমরা সবাই সকাল আটটা অবধি বুকড্। দিনের অ্যাটেনডেন্ট আলাদা। এইটুকু সময়ের জন্য ফালতু কেন বাইশ টাকা গচ্চা দেবেন? আপনার পেশেন্ট তো এখন টানা ঘুম মারবে। সাইড বেডে আমি তো থাকছিই। দরকারে লাগলে উতরে দেবখন। যা হোক কিছু বকশিস দিয়ে দেবেন।'

প্রস্তাবটা নেতাইয়ের মনে ধরতে এককথায় রাজী হয়ে গেল। লোকটিকে সুজন মনে করে জিজ্ঞেস করল, 'দিনের বেলার জন্য কাকে পাব?'

'আপনি তো শুনলাম সরকারী লোক। ওয়ার্ডমাস্টারের খাতায় লোক চেয়ে নাম লেখালে তবেই অ্যাটেনডেন্টের জন্য সরকারের কাছ থেকে টাকা আদায় করতে

পারবেন। ব্যাপারটা সহজ না। অনেক ঘাঁতঘোঁত হ্যাপা আছে। সে আমি ব্যবস্থা করে দেবখন। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।'

শেষ প্রহরের ঘুম গাঢ় হয়। সেই সিস্টার টেবিলে মাথা রেখে ঘুমোচ্ছিল। নিচে নেমে যাওয়ার আগে নেতাই জাগাল। ওর তরফে আর কিছু করণীয় আছে কিনা জানতে চাইল।

বিরক্ত মুখে সিস্টার একবার ঘুম-মাতাল চোখ চেয়ে তাকাল। ফের টেবিলে মাথা রেখে বলল, 'এখন যান তো । যা কিছু কাল সকালে দেখা যাবে।'

ভোর হয় হয় সময় ওরা ওপর থেকে নিচে নামল। ঝড় ঝাপটায় সকলেই ক্লান্ত, কিন্তু উত্তেজনা উদ্বেগ মুক্ত। অনেকটা হালকা লাগছিল। বুক ভরে নরম নির্মল বাতাস নিচ্ছিল।

বেখেয়াল পায়ে পায়ে ওরা হাসপাতালের প্রধান ফটকে এসে পড়ল।

বাতাসে বেশ আর্দ্রতা এখন। শীতে শিরশির শরীর। ঘুম ঘুম চোখ।

সড়কে কিছু কিছু ট্যাক্সি যাতয়াত করছে। দিনের দৌড় শুরু করবে বলে গ্যারেজ থেকে টার্মিনাসে কয়েকটা বাসও যেতে দেখা গেল।

সড়কের ধারে খোলা চায়ের দোকানে নজর পড়তে নেতাই কৃতজ্ঞতায় জগুর বন্ধুদের বলল, 'তোমাদের ওপর খুবই ধকল গেল। ভাগ্যিস সঙ্গে ছিলে, নইলে বাপব্যাটায় নাকানিচোবানি খেতাম। একটু চা-টা খাবে চল।'

এই সময় চা একটু সত্যিই দরকার। ওরা কেউই আপত্তি করল না।

বাধা দিয়ে জগু বলল, 'চা খেতে গিয়ে তুমি আর সময় নষ্ট কর না বাবা। ওদিকে সবাই চিন্তায় আছে। মা নিশ্চয়ই রাতে ঘুমোতে পারেনি। এখান থেকে তারাতলা অবধি ট্যাক্সি পেয়ে যাবে। ওখান থেকে তেলের ট্যাঙ্কার বা ট্রাক ফ্রাক কিছু একটা ধরে নিয়ে বরং বাড়ি চলে যাও।'

'আর তোরা?'

'আমরা সকালের ডাক্তার না আসা অবধি থেকে যাচ্ছি। দাদুর খোঁজখবর নিয়ে তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা। তোমাকে তো সার্টিফিকেটের জন্য অফিসেও যেতে হবে একবার।'

নেতাই দেখল, মন্দ বলেনি জগু। দোনামনায় গেল না। মাথা নেড়ে সায় দিল। জগুর এক বন্ধু সড়কের ওপর থেকে ট্যাক্সি ধরে আনল।

নেতাই ট্যাক্সিতে ওঠার আগে জগু বলল, 'চা জলখাবারের জন্য কিছু টাকা রেখে যাও। অ্যাটেনডেন্ট লোকটাকে অন্তত দশ তো দিতে হবে। দাদুর জন্য জলের কুঁজো গেলাস টেলাস কিনতে লাগবে। তারপর কখন কোথায় কত যে লাগে কে

জানে, সর্বত্র হাঁ-মুখোরা ফাঁদ পেতে আছে। একটু বেশি করেই ধরে দিও।'

নেতাই অত হিসাবে গেল না। নিজের জন্য পঞ্চাশ রেখে বাকি সব টাকাটাই জগুর হাতে দিল।

হরিণীর বেগে ট্যাক্সি ছুটছিল। একদিকের কাচ একটু নামিয়ে দিল নেতাই। ভোরের আবছা আলো আর ফুরফুর ঠাণ্ডা হাওয়া ভাল লাগছিল। তন্দ্রালু চোখে সীটে গা এলিয়ে নেতাই ভাবছিল, জগুটা বেশ সমঝদার সেয়ানা হয়ে উঠেছে। হবেই বা না কেন? নিজেও তো অল্প বয়স থেকেই ভালমন্দ বুঝতে শিখেছিল। নিজেকে যথার্থ জন্মদাতা ভেবে নেতাই গর্ব সুখ টের পাচ্ছিল।

সত্য সাঁপুই এখন প্রাণসঙ্কট মুক্ত। পেল্লাই একটা পেসমেকার তার পায়ের সঙ্গে আঁটা। সংযোগটা যাতে বিচ্ছিন্ন হয়ে না পড়ে সেজন্য খাটের সঙ্গে পা দু'টো টানা বাঁধা। একে তো বাঁধা পায়ে অন্ধকার করিডোরের অপরিচ্ছন্ন বিছানায় পড়ে থাকা, তারপর আবার ফ্যান নেই। শরীরের অসাড়তা অস্বাভাবিকতা ক্রমশ যত কেটে যাচ্ছিল, কষ্টটাও বাড়ছিল।

বিকেলে অফিস থেকে বেরিয়ে ভিড় বাস ধরে হাসপতালে আসতে নেতাইয়ের অনেক দেরি হয়ে যায়। জগু কিন্তু ঠিক চারটের সময় গেট খোলার মুখেই ঢুকে পড়ে। সত্যর পায়ের ওপর দিয়ে কয়েকটা কালো পিঁপড়ে হাঁটতে দেখে জগু মেজাজ হারিয়ে ফেলল। ঝটপট পিঁপড়েগুলো হটিয়ে দিল। ভিজিটিং আওয়ার্সে সাধারণত অ্যাটেনডেন্টরা রোগীর ধারে কাছে থাকে না। জগুর রাগটা গিয়ে পড়ল সিস্টারদের ওপর।

আজকাল হাসপাতালগুলিতে আকছার কুকুর বিড়াল ইঁদুর দাপিয়ে বেড়ানোর খবর শোনা যায়, তো সামান্য পিঁপড়ে! যেন কোনও গুরুতর অভিযোগ না, এমন তুচ্ছতাচ্ছিল্য ভাব করল সিস্টার। নিরাসক্ত জবাব দিল, 'খাটের চার পায়ে চারটে বাটি বসিয়ে দিয়ে যাবেন। তাতে জল ঢেলে দিলে আর কোনও পিঁপড়ে আসতে পারবে না।'

তাজ্জব পরামর্শ! জগুর মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে উঠল। গলা চড়িয়ে বলল, 'আমরা বাটি বসিয়ে দিয়ে যাব? ওয়ার্ডবয় আর আপনারা কি ভ্যারাণ্ডা ভাজতে আছেন?' সিস্টার কটমট দৃষ্টিতে শাসন ছুঁড়ে দু'দণ্ড জগুর দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর মেজাজ আয়ত্তে রেখে জবাব দিল, 'আমরা কী করব?'

'তার মানে! তিনদিন হয়ে গেল বারান্দার ওই নোংরা বিছানায় পেশেন্ট পড়ে আছে। রোজই বলা হচ্ছে, বেড খালি হলেই ভেতরে ভাল জায়গায় ট্রান্সফার করা

হবে। অথচ দেখতে পাচ্ছি, বেড খালি। পরে আসা পেশেন্টরা সেখানে চান্স পেয়ে যাচ্ছে। এভাবে ঝুলিয়ে রাখার পেছনে রহস্যটা কি বলতে পারেন?'

'রেফারেন্স। ওপর মহলে কিংবা হাসপাতালে তেমন কেউ জানাশুনো থাকে তো তাঁকে ধরুন।'

'হাসপাতালে ট্রিটমেন্ট হবে তাতেও রেফারেন্স ব্যাকিং? বোকা বানাচ্ছেন?'

'ডাক্তারবাবু যেমনটি বলবেন তাই তো হবে। কিছু বলার থাকে তাঁকেই বলুন। অযথা আমাদের ওপর চোটপাট, চোখ রাঙালে রেজাল্ট খারাপই হবে।'

'ভয় দেখাচ্ছেন?' আগুনে ঘি পড়ার মতো জগু জ্বলে উঠল,' ভেবেছেন, কোথা থেকে কি দু'নম্বরী কাজ কারবার হচ্ছে কিচ্ছুই বুঝি না। ডাক্তারবাবুকেই ধরব। আমার বাবা কিন্তু একজন গভর্নমেণ্ট এমপ্লয়ি। যা খুশি অন্যায় করে অত সহজে ছাড় পাওয়া যাবে না।'

জগু তড়পালে কি হবে! সরকারী সাব অফিসের একজন কেরানির দৌড় দম এক দিনেই প্রায় ফুরিয়ে যাবার জোগাড়। অফিসের হেডক্লার্ক নেতাইয়ের বাবার ফ্রি মেডিকেল ট্রিটমেন্টের জন্য সার্টিফিকেটের ড্রাফটটা যথাসময়েই অফিসারের টেবিলে পাঠিয়েছিল। অফিসার খোঁচা মেরে বসল, 'নেতাই সাঁপুইয়ের লেখা অ্যাপিল কোথায়? সত্য সাঁপুই যে ওর বাবা তা জানব কেমন করে? তা ছাড়া, তিনি যে নেতাইয়ের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল সেটাও সিওর হতে হবে।'

'তা হলে স্যার উপায়?' নেতাই মুষড়ে পড়ল।

অফিসার রাস্তা বাতলাল, 'পঞ্চায়েতের কাছ থেকে সার্টিফিকেট আনলেই হবে।' নেতাই রাজনীতির দলাদলির ধারে-কাছে থাকে না। মিটিং মিছিল চাঁদায় বিমুখ। গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য সুধন্য মণ্ডলের অনেকদিনের রাগ ছিল। ভুল বানান ভরা জটিল বাংলা অক্ষরে দরকারি সার্টিফিকেট দিল বটে, কিন্তু সাতপাঁচ ঝাল ঝেড়ে ছাড়ল।

সাব এরিয়া অফিসটাতে কাজ কম হলে কি হবে, কেতা আছে। সপ্তায় সাত দশখানা চিঠি ছাড়া হলে কি হবে, একজন ডেসপ্যাচ ক্লার্ক বরাদ্দ আছে। এমন সপ্তাহ যায় যে কোনও কিছু টাইপ করার দরকারই হয় না। তবু, টাইপ মেশিন, টাইপিস্ট তো থাকতেই হবে! টাইপিস্ট ছেলেটা ধড়িবাজ। অনেকের অনুমান, ওর হাতের কারসাজিতেই টাইপ মেশিনটা ঘন ঘন বিগড়ে যায়। সরকারী অফিসের বিকল মেশিন সারাতে হলে অনেক নিয়মকানুন পদ্ধতি। চালু হতে ছ' মাসের ধাক্কা।

গাঁটের কড়ি খরচ করে টাইপ করা সার্টিফিকেট নিয়ে নেতাই দেখল, অফিসার উধাও। কী একটা জরুরি কাজ সারতে বেরিয়েছে। ফিরতে অনেক দেরি হল।

অন্যদিনের তুলনায় অনেক দেরিতে হাসপাতালে পৌঁছাল নেতাই। ভিজিটিং আওয়ার্সের শেষ ঘণ্টা পড়ে গেছে। হাঁপাতে হাঁপাতে সার্টিফিকেট এগিয়ে দিতেই সিস্টার ধমকে উঠল, 'এতক্ষণ কোথায় ছিলেন? ডাক্তারবাবু কখন থেকে আপনাকে খুঁজছেন। এক্ষুণি চেম্বারে যান। একটু পরেই রাউণ্ডে বেরিয়ে যাবেন।'

ফের দাঁত খিঁচুনি বকুনির মুখে পড়ল নেতাই। কিন্তু কিসের জন্য এত বকাঝকা শাসন কিছুই বুঝতে পারছিল না। অবাক লাগছিল। কাঁচুমাচু মুখে জিজ্ঞেস করল, 'দোষটা কী করলাম?'

'সিস্টারকে চটিয়েছে কে?' রুক্ষ গলায় ডাক্তার জানতে চাইল।

'আজ্ঞে আমি তো সবে এসেছি। সিস্টারের কাছে যেতেই শুনলাম, আপনি খুঁজছেন।'

'নিশ্চয়ই আপনাদের মধ্যে কেউ একজন আজেবাজে অনেক কথা বলেছে, খোঁজ নিয়ে দেখুন। তার আগে সিস্টারের সঙ্গে আপস করে নিন। দিনকাল কেমন চলছে, জানেন তো। ওদের অ্যাসোসিয়েশন আছে। ঘাটালে আপনারাই মুশকিলে পড়বেন।

'আজ্ঞে আমি এক্ষুণি যাচ্ছি।' সিঁদুরে মেঘ দেখতে পেল নেতাই।

'পেসমেকার কেনার কী করলেন?'

'আজ্ঞে অনেকগুলি টাকার ব্যাপার তো তাই একটু সময় চাই।'

'বেশিদিন দেরি করলে চলবে না। তাড়াতাড়ি করুন। যান।'

জগুর হুমকির জন্য ডাক্তারবাবুর কাছে নেতাইকে অপদস্থ হতে হল ঠিকই। সিস্টারের সামনে হাত কচলে ক্ষমাও চাইতে হল। কিন্তু একটা কাজের কাজও হল। ওইদিন রাতেই হলঘরের বেড পেয়ে গেল সত্য। হলে কি হবে, নতুন জায়গাটা সুখকর না। জেনারেল ওয়ার্ড বলে কথা। বিশাল হলঘর জুড়ে একহাত তফাতে সারিবদ্ধ লোহার খাট পাতা। তলায় তোবড়ানো গামলায় আবর্জনা। পায়ের কাছে আধভাঙা রঙচটা টুল। মাথার দিকে নোংরা দেওয়াল ঘেঁষা মরচে ধরা ছোট্ট মিটসেফ। বিছানার চাদর ময়লা। কুশ্রী, দাগঅলা। ঝুরঝুরে দেওয়াল, কার্নিশে ঝুল। ধুলোয় ঢাকা ফ্যানের আওয়াজ চটচট খড়খড়। ঘরময় ভ্যাপসা দুর্গন্ধ। বিড়াল ইঁদুর টিকটিকি মাকড়সা মশা। মশারি টাঙানোর দড়ি ইতস্তত থামে জড়ানো।

বাপের প্রতি কর্তব্য পালনে খুঁটিনাটি কোনওরকম ত্রুটিবিচ্যুতিও যাতে না ঘটে নেতাই সেদিক সজাগ নজর রাখছিল। পরে না হয় সরকার থেকে আদায় হবে, কিন্তু এখন তো বাইশ বাইশ করে মোট চুয়াল্লিশ টাকা নগদে খরচ! তবু, দিনরাত্রি দু'তরফে অ্যাটেনডেণ্ট রাখতে কসুর করেনি। সত্য ভর্তি হওয়ার পরদিন সকালেই

জগু কাঁচের গেলাস, কুঁজো, টুথব্রাশ, পেস্ট, হরলিকস, গ্লুকোজ কিনে দিয়েছিল। পরে ফের সার্ফ, সাবান, সুগন্ধী তেল, পাউডার, আয়না, চিরুনি, বিস্কুট ইত্যাদিও আনা হয়েছে। রোগী দেখতে আসার সময় ভালমন্দ ফল মিষ্টি তো আসছেই।

বাড়িতে সত্যর এই আদর কদরের কোনও কিছুই ছিল না। হররোজ আমিষ খাবারও জুটত না! উপরন্তু বাড়িতে থাকার সময় শরীরে যেসব রোগগ্লানি ছিল এখানে তাতেও ঠিকমতো ওষুধ পড়ছে। সেইসঙ্গে লোডশেডিং সময়কার জেনারেটারের মতো টেম্পোরারি পেশমেকার তো চলছেই।

ছয় রাত পার হয়ে গেল। সত্য এখন হরলিকস, গ্লুকোজ, ফল, মিষ্টি, ওষুধ আর নিয়মমতো হাসপাতালের খাবার খেয়ে অনেকটা সুস্থ স্বাভাবিক। নেতাইও উদ্বেগমুক্ত। তাই সন্ধ্যা রাউণ্ডের পর ডাক্তারের মুখ থেকে রোগী সম্পর্কে খোঁজ নিতে হাপিত্যেশ প্রতীক্ষা করছিল না। ভিজিটিং আওয়ার্সের পর সোজা বাড়ি চলে যাচ্ছিল। কিন্তু দশ দিনের মাথায় করিডোরে জুনিয়র ডাক্তারের কাছে ধরা পড়ে গেল। জুনিয়র ডাক্তার চোটপাট করে উঠল, 'স্যারের সঙ্গে দেখা না করে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন কেন?'

'আমি তো কোনও অপরাধ করিনি।' নেতাই নির্ভয়ে জবাব দিল, 'পালিয়ে বেড়াব কেন?'

'আলবাত অন্যায় করেছেন।' জুনিয়র ডাক্তার ধমক দিয়ে বলল, 'হাসপাতালের এমারজেন্সি পেশমেকার অ্যাদ্দিন ধরে আটকে রেখেছেন, ফের কথা! আপনার পেশেন্টের পেশমেকার কেনার কি ব্যবস্থা করলেন?'

'গরিব মানুষ আমি।' নেতাই গলার স্বর নরম করল, 'অতগুলি টাকা জোগাড় করা কী সহজসাধ্যি! আমি তো সে জন্য বড় ডাক্তারবাবুর কাছ থেকে ক'দিন সময় চেয়ে নিয়েছি।'

'সেটা কতদিন? বেশ মজায় আছেন দেখছি। আজকেই স্যারের সঙ্গে দেখা না করেন তো মজা মারা টের পাওয়াব।'

ফের বড় ডাক্তারের মুখ থেকে নেতাইকে বেশ কিছু টকঝাল গালমন্দ হজম করতে হল। বড় ডাক্তার অপারেশনের দিনক্ষণ জানাল। পেশমেকারের জন্য একখানি রিকুইজিশন ধরিয়ে দিয়ে বলল, 'দ্যাট কাইণ্ড অব মেশিন ইজ নট সো ইজি অ্যাভেলেবল। এগুলি বিদেশ থেকে আসে।'

'বলেন কী!' নেতাইয়ের টনক নড়ে উঠল, 'এই মহার্ঘ জিনিস আমি কোথায় গেলে পাব? অপারেশনের দিনতো আগেই ঠিক করে বসলেন। তার আগে যদি জোগাড় করতে না পারি?'

'যাতে পান সে ব্যবস্থা করে দেব।' বড় ডাক্তার ঝটপট একটুকরো সাদা কাগজে

এক বিক্রেতার নাম ঠিকানা লিখে ফেলল। চিরকুটটা ধরিয়ে দিয়ে বলল, 'আমার সই করা রিকুইজিশন তো থাকছেই। পারলে ফোনে ওদেরকে বলে দেব। ওদের লোকজন তো হামেশা এখানে ঘোরাঘুরি করে। আপনার সঙ্গে এখানেও যোগাযোগ হয়ে যেতে পারে।'

হলও তাই। ওরা যেন ওঁৎ পেতেই বসেছিল। ডাক্তারের চেম্বার থেকে বের হতেই নেতাই খপ্পরে পড়ে গেল। ওদের অফিসের ঠিকানা খুঁজে বার করা দরকার হল না। হিসেব নিকেশ কথাবার্তা একরকম পাকা হয়ে গেল।

রিকুইজিশন মতে পাঁচ হাজার নশো একচল্লিশ নম্বর মডেলের তিন প্যারামিটার পেশমেকারের দাম পড়বে পঞ্চাশ কম একুশ হাজার টাকা। সেটা বুক কেটে ভেতরে বসাতে আনুষঙ্গিক খরচ হবে আনুমানিক আরও দু'হাজার টাকা। হাসপাতালের ব্যাপার স্যাপারই আলাদা। হাতে বেশ কিছু বাড়তি টাকা রাখা দরকার। নেতাই হিসেব করে দেখল, মোট পঁচিশ হাজার হলে মোটামুটি নিশ্চিন্ত থাকা যায়। কিন্তু, হাতে তো আছে আর তিনদিন সময়। এত অল্প সময়ে অতগুলি টাকা জোগাড় করা কি এতই সহজ? নেতাইয়ের ঘুম, খাওয়া, অফিস যাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। এমনিতেই হাই ব্লাড প্রেসার আছে। সেটা যে আগের তুলনায় বেড়েছে তা টের পাচ্ছিল। টেনশনে মাথা ঝিমঝিম, চোখে অন্ধকার দেখল।

বুকের ভেতর অসোয়াস্তি নিয়ে নেতাই হন্নে হয়ে ঘুরল। কোনও কূলকিনারা খুঁজে পেল না। শেষমেশ দুধেল গাই বেচল। চড়া সুদে বউয়ের গহনা বন্ধক রাখল। বাকিটা অফিসের মিউচুয়াল বেনিফিট ফাণ্ড আর পঞ্চুকাকার কাছ থেকে দেনা করল।

পেশমেকার বসানো নয়তো যেন মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠান। অপারেশনের জন্য দরকারি লম্বা ফর্দ দেখে নেতাইয়ের চোখ চড়কগাছ। কিন্তু বিপদের সময় মাথা ঠাণ্ডা রাখা জরুরি মনে করল। নরম গলায় সিস্টারকে জিগ্যেস করল, 'এতে যা যা লেখা আছে, সবগুলিই কি কিনে দিতে হবে? পেশেণ্ট কিন্তু ফ্রি বেডের। এগুলির কিছুই কি হাসপাতাল থেকে পাওয়া যাবে না?'

এই সিস্টারটি যে শুধু দেখতে শুনতে সুন্দর তাই না, ব্যবহারটাও আকর্ষণীয় ভাল। মিষ্টি হেসে সহজ করে বোঝাল, 'সবরকম ওষুধ তো হাসপাতালে থাকে না ভাই। যেগুলি পাওয়া যাবে তার কোয়ালিটিও ততটা সুবিধার নয়। তাই বলছি কি, জলের মতো কত টাকাই তো খরচ করছেন দেখছি। তাহলে আর সামান্য কিছু টাকা বাঁচানোর জন্য খুঁত রাখতে যাবেন কেন? তাছাড়া, এখন হয়তো একটু কষ্ট হবে, পরে বিল করলে ওষুধের টাকা তো আপনি পেয়েই যাবেন।'

নেতাই মনে মনে ভাবলেও বলল না, সে তো মাত্র তিনশো টাকা। সরকারের ভাণ্ডার থেকে টাকা পাওয়া যে কি ঝক্কি ঝামেলা তা একদিনেই হাড়ে হাড়ে টের পাওয়া গেছে। প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড থেকে নিজের জমানো টাকার অংশ লোন চাইতে হেড কোয়ার্টার গিয়েছিল। এ টেবিল, সে টেবিলে তদ্বির করতে হয়রানির একশেষ। ধৈর্য হারিয়ে এক টেবিলে জানতে চেয়েছিল যে, টাকাটা কতদিনে হাতে পাওয়া যেতে পারে? সেখানেই শোনা কথা, হাজার রকমের নিয়ম-কানুন রীতিনীতি পদ্ধতি মেনে চলতে হয় বলে সময় একটু বেশিই লাগে। সেই বেশি সময়টা অনেকসময় মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। কবে কে একজন নাকি মেয়ের বিয়ের জন্য লোন চেয়েছিল। পেয়েছিল, সেই মেয়ের প্রথম সন্তানের অন্নপ্রাশনের সময়। শুনে নেতাই আর ওপথ মাড়ায়নি।

নির্দিষ্ট দিনক্ষণে বিনাবিপদে সত্যর বুকের ভেতর পঞ্চাশ কম একুশ হাজার টাকার যন্ত্রটা বসানো হল। শুরু হল, যান্ত্রিক জীবন। নেতাই, জগু আর ওর বন্ধুরা ওটির সামনে করিডোরে উদ্বেগ উৎকণ্ঠা নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। একজন ওয়ার্ডবয় বেরিয়ে এসে শুভ সংবাদটা জানিয়ে চিন্তামুক্ত করল। তারপর নিজেদের কেরামতি জাহির করে বলল, 'এসব পেশেণ্টকে কেমবিসের স্ট্রেচারে করে আনতে হয় তা বুঝি জানতেন না? সে যাকগে, আমরা কিন্তু পাল্টি করে ঠিকঠাক চড়িয়ে দিয়েছি। অপারেশন ওকে। একটু বাদে এবার আমরাই ওকে বেডে দিয়ে আসতে যাব। আপনাদের হাত লাগাতে হবে না। তাই বলে কেল্লা ফতে মনে করে ভেগে যাবেন না যেন।'

সত্যকে বেড থেকে ওটির দরজা অবধি জগু ওদেরকেই চাকাঅলা টেবিল টেনে আনতে হয়েছিল। এবার মোট তিনজন ওয়ার্ডবয় মিলে সত্যকে যত্নআত্তি করে বেডে পৌঁছে দিয়ে এলো। তিনজনের একজন করিডোরে হাত ঝেড়ে নেতাইকে বলল, 'এবার যা দেবার দিন।'

প্রকাশ্য করিডোরে এরকম দ্বিধাহীন হাত পাততে দেখে জগু ফোঁস করে উঠল, 'কী আবার দেব?'

ওয়ার্ডবয়টি অবাক চোখে তাকিয়ে বলল, 'নতুন কিছু বলছি কি?'

'হাসপাতালে এই প্রথম আসছে তো তাই জানে না।' নেতাই ঝামেলা এড়াতে বলল, 'দশ দিয়ে দে জগু।'

'না দেব না।' জগু বেঁকে বসল, 'এটা তো ওদেরই কাজ। মাইনে পায় না?'

'তাহলেও দিতে হয়। সবাই দিয়ে থাকে। দিয়ে দে বলছি।'

'যারা দেয়, অন্যায় করে। আমি দেব না।' জগু গোঁ ধরে রইল।

নেতাই নিজের পকেট থেকে একখানা দশ টাকার নোট বের করল। নিতে অস্বীকার করে ওদের মধ্যে একজন বলল, 'এটা কিরকম বিচার হচ্ছে! তিনজনকে কমসে কম তিরিশ তো দেবেন।'

অপর একজন ফুট কাটল, 'ক্ষমতা না থাকে তো কিছুই দেবেন না, সে তবু ভাল।'

বাকিজনের বলার ধরন একটু অন্যরকম, 'সামান্য এই খরচটাকে ফালতু ভাববেন না স্যার। পেশেণ্ট তো এখনও অনেকদিন থাকবে। আমাদেরকে ফের কাজে লাগতে পারে।'

'তখনও তো মাল ছাড়তে হবে।' জগু বেফাঁস বলে ফেলল, 'বড় মজায় আছো।' ওরা তিনজনই বিরক্ত হল। রাগেক্ষোভে চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল। চোখ থেকে আগুন ঠিকরে বের হল। একজন দাঁত কিড়মিড়িয়ে বলল, 'অত চোখ টাটানোর দরকার কী? আমাদের চাকরিতে ঢুকেই দেখুন না কত ধানে কত চাল?'

সেই সকাল থেকে দু'ভাড় চা ছাড়া পেটে দানাপানি কিছুই পড়েনি। এখন ভরদুপুর। ভেতর বাইরের উত্তাপে নেতাই অসুস্থবোধ করছিল। ফের যদি চোখে অন্ধকার দেখে? মাথা ঘুরে পড়ে যায়? নানা আতঙ্ক আশঙ্কায় মুষড়ে পড়ায় বিশ টাকায় বিরোধ মিটিয়ে ফেলল।

কিন্তু, বিরোধের বীজ যে হাসপাতালের সর্বত্র ছড়ানো। পদে পদে অবিচার অবহেলা দুর্ব্যবহারের চূড়ান্ত। সত্য ক্রমশ যত সুস্থ হয়ে উঠছিল দিন কে দিন বিরোধও বাড়ছিল। ওয়ার্ডমাস্টারের খাতায় পেশেন্ট প্রতি একজন অ্যাটেনডেণ্টের নাম লেখা থাকলে কি হবে, ভূতুড়ে নামে ভরা। দিনের বেলায় তবু একরকম, রাতে একজন অ্যাটেনডেণ্ট একাধিক পেশেন্টকে দেখভাল করবে তা হয় কখনও! পেশেণ্টরা যতক্ষণ জেগে থাকে, তবু না হয় সামাল দেওয়া চলে। তারপর?

সত্যর অভিযোগ, রাতের অ্যাটেনডেণ্ট নাকি নেশা করে মেঝেয় ঘুমিয়ে থাকে। হাজার ডাকেও সাড়া দেয় না। প্রয়োজনে জল পাওয়া যায় না। সারারাত হেগে মুতে একসা হয়ে থাকতে হয়।

সময়োচিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার অভাবে সত্যর বেডশোর হল। ড্রেসিং করার লোক ঠিকঠাক আসে না, তো দগদগে ঘা শুকোয় কখনও? আসল আসামী অ্যাটেনডেণ্টের সঙ্গে জগু বিরোধ বাধাতে গিয়েছিল। সেই ঠাণ্ডা মেজাজের ভাল সিস্টার ঠিক সময়ে কাছে ডেকে নিয়ে বুঝিয়েছে, 'ওদেরকে চটিয়ে বিপদ ডেকে আনবেন না। এখানে জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠে ওরাই একমাত্র বলভরসা। হাসপাতালের মাইনে পানেওয়ালারা সব ফালতু। দরকারে টিকি খুঁজে পাওয়া যায় না।'

ফালতুদের বিরুদ্ধেও লড়তে চেয়েছিল জগু। নেতাই বাধা দিয়ে বুঝিয়েছে, 'ওদের পেছনে ঝাণ্ডাডাণ্ডার শক্তি এসে দাঁড়াবে। তোকে মদত দিতে সঙ্গে এসে দাঁড়াবে কে? তার চেয়ে ঠাণ্ডা মাথায় হাত কচলিয়ে কাজ হাসিল করে নেওয়াই ভাল।'

এই ভয়ভীতিতেই মেথরের দাবিও মেনে নিতে হয়েছে। সত্যর নোংরা কাপড়চোপড় কাচাকুচির একমাত্র অধিকার নাকি একা ওর। সস্তায় অন্য কাউকে দিয়ে কাচানো চলবে না। তো কাপড় কাচাতেই দিনে দশ টাকা খরচ।

সত্যর শরীরে এখন বেডশোর ছাড়া আর কোনও গ্লানিই নেই। ওই খুঁতটুকু ছাড়া সম্পূর্ণ সুস্থ। কিন্তু, দিনের পর দিন গড়িয়ে যাচ্ছে ঘা শুকোচ্ছে না কেন?

ডাক্তার বলল, 'সময় লাগবে।'

সিস্টার বলল, 'অমন দগদগে ঘা জীবনেও শুকোবে না।'

তাহলে, কার কথা ঠিক বিশ্বাসযোগ্য? ধন্দে পড়ে নেতাই ফের ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করল। সপ্রতিভ ডাক্তার বলল, 'দু'জনের বক্তব্যই সত্যি। হাসপাতালে যা অযত্ন তাতে এই রোগ থেকে সহজে সেরে ওঠা কঠিন। বেশি অযত্ন হলে ঘা বাড়বে বই কমবে না। আমি বরং ওষুধের নাম লিখে ছুটি দিয়ে দিচ্ছি। বাড়ি নিয়ে গিয়ে লোকাল কাউকে দিয়ে রোজ ড্রেসিং করান। দেখবেন, খুব তাড়াতাড়ি ঘা শুকিয়ে যাবে।'

সত্য নিজেও আর এক মুহূর্ত হাসপাতলে থাকতে চাইছিল না। হররোজ অফিস বাড়ি হাসপাতাল দৌড়ে নেতাইও বেশ কাহিল। কর্জের টাকা তলানিতে এসে ঠেকেছে। সেইসঙ্গে ডাক্তারের পরামর্শটাও মনে ধরার মতো। নেতাই আর সাতপাঁচ ভেবে সময় নষ্ট করল না। আর একপ্রস্থ বকশিস খরচাপাতি করে সত্যকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনল।

সত্য বাড়ি ফিরে এলেও হাসপাতালে যাতায়াত থেকে নেতাই সহজে নিস্তার পেল না। নিয়মমতো সাদা কাগজে সই নিয়ে রাখলে কি হবে, টাকার রসিদ হিসেবে ওই পর্যন্তই যথেষ্ট ছিল না। ওয়ার্ডমাস্টারের অ্যাটেস্টেশন থাকা চাই। ওর আবার রকমফেরের ডিউটি। ধরা মুশকিল। অফিসের কাজের ফাঁকফোকরে সাতদিন ঘুরে তবে যোগাযোগ হল। সইসাবুদও পাওয়া গেল।

এরপর অ্যাপেনডিকস এক রুল দশ নম্বর ফর্ম ভরলেই হল না। ওই ফর্মে কনসার্ণ মেডিকেল অফিসারের সই আর সার্জেন সুপারিনডেণ্টের কাউণ্টার সই দরকার। সেসব হাতে হাতে করাতে গেলে কাজ হবে না। নিয়মমতো লাইন লাগিয়ে দপ্তরে জমা দিতে হবে। সে জন্য একদিন ছুটি নিতে হল।

মাত্র দু'টি সই হয়ে জমা দেওয়া ফর্ম ফেরত পেতে সময় লাগল দেড়মাস। তারপর সেই ফর্মসহ আবেদনপত্র নিজের অফিসে জমা পড়ল। পদ্ধতিমতো হেড কোয়ার্টারে গেল। তিনমাস পরে অ্যাটেনডেনটদের বাবদ খরচের যে টাকাটা মিলল সে তো মোট দেনার সমুদ্রে শিশিরের ছিটেফোঁটা মাত্র। নেতাইদের দেনার সিংহভাগ ছিল পেশমেকারের বিলে। ওই টাকা আদায় করায় হ্যাপা আরও অনেক বেশি।

তিনমাস আগে নেতাই যথাযথ মাধ্যমে বিভাগীয় অধিকর্তার উদ্দেশ্যে যে আবেদনপত্রটি পেশ করেছে সেটি হেডক্লার্কের পাকা হাতের মুসাবিদা। বিস্তারিত ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ শেষে জানানো হয়েছে যে, সে সামান্য বেতনভুক একজন করণিক মাত্র। বাবা সত্য সাঁপুইয়ের দেহে বসানো জীবনদায়ী দামি যন্ত্রটি ক্রয় করার মতো আর্থিক সঙ্গতি ছিল না। বাধ্য হয়ে ওই বাবদ টাকাটা নানা উপায়ে কর্জ করতে হয়েছে। এছাড়াও আনুষঙ্গিক নানা খরচাখরচের চাপে পড়ে ছা-পোষা জীবন এখন দুঃসহ হয়ে উঠেছে। সে নিজেও টুকটাক অসুখে ভুগতে শুরু করেছে। অতএব, অনতিবিলম্বে উল্লিখিত টাকা মঞ্জুর করা হলে দারিদ্র্য-জ্বালা থেকে কিছুটা রেহাই পাওয়া সম্ভব।

বক্তব্যের সত্যতা যাচাই করার জন্য যেসব প্রয়োজনীয় প্রমাণপত্র জুড়ে দেওয়া আবশ্যিক নেতাই সেগুলিতে কোনও ত্রুটি রাখেনি। যেমন, ডাক্তারের দেয়া রিকুইজিশান। পেশমেকারটি যে বাজারদর অনুযায়ী ন্যায্য মূল্যে খরিদ করা হয়েছে, সে সম্পর্কে ডাক্তারের সার্টিফিকেট। সত্য সাঁপুই যে ওর একমাত্র সন্তান একা নেতাইয়ের উপার্জনের ওপর নির্ভরশীল, সে সম্পর্কে পঞ্চায়েতের কাছ থেকে সংগ্রহ করা সমর্থনসূচক পত্র। পেশমেকার ক্রয়ের মূল টাকার রসিদ। হাসপাতাল থেকে প্রাপ্ত সত্যর ছাড়পত্র। সেইসঙ্গে স্বঘোষিত নেতাইয়ের একটি অঙ্গীকারপত্র। তাতে লিখে দেয়া হয়েছে যে, সত্য সাঁপুইয়ের দেহে প্রোথিত পেশমেকারটি ক্রয় করতে যে বিপুল পরিমাণ টাকা ব্যয় হয়েছে তার কণিকা—অংশও আত্মীয়-বান্ধব, অন্য কোনও ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে দান বা অনুদান হিসেবে গ্রহণ করা হয়নি।

প্রায় সাড়ে চার মাসের মাথায় নেতাইকে হেড কোয়ার্টার থেকে জানানো হল যে, মহাকরণের হেল্‌থ অ্যাণ্ড ফ্যামেলি ওয়েলফেয়ার মতে, আরও দু'টি সার্টিফিকেট পেশ করা প্রয়োজন। প্রথমটি হল, স্থানীয় কোনও জনপ্রতিনিধি লিখে দেবেন যে সত্য সাঁপুইয়ের বর্তমান আয় উপার্জন কত। অপরটি, সত্যর বুকে পেশমেকার বসানোর কালে সংশ্লিষ্ট ডাক্তার লিখিতভাবে জানাবে যে, উল্লিখিত যন্ত্রটির গুণগত মান এখন কেমন আছে। যন্ত্রটি এখন কেমন চলছে।

হাসপাতালের ব্যস্ত ডাক্তার আর পঞ্চায়েতের পায়াভারী বাবুকে ধরা কি অতই সহজ? তবু, একমাস দৌড়ঝাঁপ করে নেতাই সেসব জোগাড় করে জমা দিল। কিন্তু সরকারী অফিসের লাল ফিতের বাঁধনটাই যা টাইট। আর সবকিছুই ঝিমন্ত ঢিলাঢালা। ফেরত আসা ফাইল টেবিলের পর টেবিল থপ থপ পার হয়ে মহাকরণের খোঁচামারা স্থানে গিয়ে পৌঁছাল আরও একমাস পরে।

এদিকে বিনা সুদের পাওনাদাররা বিশ্বাসই করতে চায় না যে, নেতাই টাকাটা এখনও পায়নি। অফিসের মিউচুয়াল বেনিফিট ফাণ্ডের বাৎসরিক হিসেব নিকেশের দিন এগিয়ে আসছে। তার আগেই দেনার টাকাটা পরিশোধযোগ্য। চারদিক থেকে পাওনাদারদের তাগাদায় বেইজ্জতির একশেষ। তারপর মরার ওপর খাঁড়ার ঘা হল, জগুর পাশ করা। কলেজে ভর্তি, বই কিনতে গাছ মাছ বিক্রি করেও দেনা এড়ানো গেল না।

আরও তিন মাস পার হয়ে গেল, কিন্তু মহাকরণ থেকে ফাইলটা ফিরে আসছে না কেন? নেতাইয়ের ঘুম উধাও হয়ে গেল। খাওয়ায় অরুচি দেখা দিল। শরীর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়তে লাগল।

প্রতীক্ষায় থেকে হতাশ দিশাহারা নেতাই একদিন অফিসের সহকর্মী ইউনিয়ন নেতা ভজনকে ধরল। সাহায্য চেয়ে বলল, 'তোদের সংগঠন তো শুনেছি রাজ্যময় একসূত্রে গাঁথা। মহাকরণেও নিশ্চয়ই কেউ না কেউ তোর জানাশোনা আছে। যদি দু'কলম লিখে দিস তো তার সঙ্গে যোগাযোগ করে দেখতে পারি। যদি তাতে কোনও হিল্লে হয় তো ভাল।'

ভজন যেন এমন একটি জুতসই সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিল। বুক চিতিয়ে বাঁকা হেসে বলল, 'সেই তো আমার কাছে হাত পাততেই হল। খামোকা অ্যাদ্দিন কেন এড়িয়ে যাচ্ছিলি? এবার নিশ্চয়ই নিজের স্বার্থে আমাদের সমিতির সদস্য হবি। মিটিং মিছিলে যাবি?'

ভজন ঝালঝাড়া আরও দু'দশ কথা শোনাল। নেতাই ভাবল, হাতি কাদায় পড়লে এমনটি হয়েই থাকে। গায়ে মাখতে নেই। তাই মুখে রা কাড়ল না। তাতে কাজের কাজও হল। ভজন মহাকরণের এক খুদে নেতার উদ্দেশ্যে দু'ছত্রের একখানা চিরকুট লিখে দিল।

নেতাই আহ্লাদে আটখানা হয়ে ভাবল, এবার নেতা টু নেতা। দেখি, কোন শালা ফালতু ভেবে ফাইল আটকায়!

শক্ত কোমর নিয়ে নেতাই অফিস চলাকালীন পর পর তিনদিন মহাকরণ গেল। নেতাটিকে সিটে না পেয়ে হতাশ মনে ফিরে এলো। ব্যক্তিগত প্রয়োজনে রোজ

এভাবে ছাড়তে অরাজি অফিসার সাফ কথা শোনাল, 'এবার থেকে হাফডে ক্যাজুয়াল লিভ নিয়ে যাবেন।'

চতুর্থ দিনে নেতাই আর অফিসমুখো হল না। যথারীতি বাড়ি থেকে বেরিয়ে সোজা মহাকরণ গেল। কিন্তু কোথায় সেই নেতা? দীর্ঘক্ষণ হাপিত্যেশ বসে থেকে নেতাই ভাবল, নেতাদের নাকি অ্যারাইভাল ডিপার্চারের নিয়মকানুন মানতে হয় না। কাজ না করলেও চলে। অথচ আশ্চর্য, যে কোনও দপ্তরেই যাওয়া যাক দেখা যাবে মর্যাদাসম্পন্ন দায়িত্বপূর্ণ চেয়ার আঁকড়ে বসে আছে ওই নেতারাই। মানুষের ভোগান্তির একশেষ। তার চেয়ে কাজ না-করা এইসব নেতাদের নিয়ে 'ডাইরেকটরেট অব লিডার্স' নামে আলাদা একটা বিভাগ খুললেই তো ল্যাঠা চুকে যায়!

নেতাটি এলো নির্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হওয়ার দেড়ঘণ্টা পরে। চিরকুট পড়ে নেতাইকে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে নিয়ে গেল। যা কিছু বলার ছিল বলে দিয়ে নেতাইকে অপেক্ষা করতে বলল। জরুরি মিটিংয়ে যাওয়ার নাম করে নিজে ব্যস্ত উধাও হয়ে গেল। পাহাড় স্তূপের ভেতর থেকে দরকারি ফাইলটা খুঁজে বের করা কি অতই সহজ? পাক্কা দেড়ঘণ্টা ঘাটাঘাটি ওলোটপালটের পর হদিশ পাওয়া গেল। পিওনের হাত থেকে একরকম ছিনিয়ে নিয়ে নেতাই পাতা ওল্টালো। অবাক হয়ে দেখল, এখন পর্যন্ত নোটশিটে কলমের একটি আঁচড়ও পড়েনি!

নেতা যখন হাতের মুঠোয় তো কিসের ভয় ভাবনা! অভিযোগ জানাতে নেতাই সোজা অফিসারের সুমুখে গিয়ে দাঁড়াল। বিস্তারিত শুনে অফিসারটি বলল, 'আমরা এখন নামেই ওপরঅলা। আপনি ঠিক লোককেই ধরেছেন। ওর বলাতেই এবার জলদি কাজ পেয়ে যাবেন। খামোকা আর মাথা গরম করে পাওয়া ধন হারাতে যাবেন না যেন। আর আমাকে যে নালিশ জানাতে এসেছিলেন সেটা টের পেতে দেবেন না। জানতে পারলে জটিলতা বাড়বে।'

তিনদিন পরেই ফাইলটা নেতাইয়ের হেড কোয়ার্টারে ফিরে এলো। আবেদন মঞ্জুর করা যেতে পারে লেখা থাকলেও খোঁচা মারা অভ্যাসটা এড়াতে পারেনি। মন্তব্য করা হয়েছে, ফিনান্স ডিপার্টমেণ্ট ঘুরে আসার পর পেশমেকারের টাকা অনুমোদন সংক্রান্ত আদেশনামা প্রকাশের পূর্বে শ্রীনেতাই সাঁপুইয়ের কাছ থেকে আর একটি অঙ্গীকারপত্র আবশ্যিক। যন্ত্রটি ক্রয়-বাবদ যে টাকা খরচ হয়েছে তার কণিকা অংশও যে ভবিষ্যতে শ্রীসাঁপুই দ্বিতীয় কোনও ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে দান বা অনুদান হিসেবে গ্রহণ করবে না, তা লিখিয়ে নেওয়া দরকার।

নোটশিটের মন্তব্য মতে আরও দু'মাস পরে সেক্রেটারিয়েট থেকে আদেশনামা বের হল। সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তরে তার প্রতিলিপি গেল। নেতাইয়েরটি হাতে এলো

প্রায় একমাস পরে।

নেতাই এখন অভাব অনটনে বিপর্যস্ত। মাস মাইনের দিন বিতরণের সময় অফিস মিউচুয়াল ফাণ্ডের সম্পাদক হাতে পেয়ে মোটা অঙ্কের কিস্তি কেটে নেয়। ফলে, মুদি দোকান থেকে দুধের খাটাল অবধি দেনা হি দেনা। গহনা বন্ধকী দোকানে মন কষাকষি। অবিশ্বাস সন্দেহর বিষে পঞ্চুকাকার সঙ্গে মুখ দেখাদেখি বন্ধ। পারিবারিক জীবনে চূড়ান্ত অশান্তি।

আদেশনামা হাতে পেয়ে শরীর মন স্বাস্থ্যে ভেঙে পড়া নেতাই কিছুটা চাঙ্গা হয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি বিল তৈরি হয়ে যাতে পে অ্যাণ্ড অ্যাকাউন্টস অফিসে যায় সেজন্য তদ্বির শুরু করল। চাকরিতে নতুন আসা অ্যাকাউণ্টস-এর বিল সেকশনের অল্পবয়সী ছেলেটি এখনও যথেষ্ট সহৃদয় সহানুভূতিশীল। মাস মাইনের বিল তৈরির ব্যস্ততার মধ্যেও বাড়তি খেটে পেশমেকারের বিলটিও তৈরি করে ফেলল।

একমাস পরে পে অ্যাণ্ড অ্যাকাউন্টস অফিস থেকে পেশমেকারের বিলটি ফেরত এল। সঙ্গে ফেরত-কারণ মন্তব্য, মাস মাইনের বিল ফর্মে পেশমেকারের টাকার বিল সঠিক নয়। এগুলি বাতিল করে টি আর আটচল্লিশ নম্বর ফর্মে ফের বিল করে পাঠানো হোক।

এই ফর্ম পাওয়া যায় কোথায়? তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কোনও হদিশ পাওয়া গেল না। অতএব মুশকিল আসান হিসেবে ডাক নেতাইকে।

আকণ্ঠ দেনার অন্ধকারে ডুবে আছে নেতাই। জরুরি ডাক পেয়ে যেন এক ঝিলিক আলো দেখতে পেল। কফ কাশি জ্বরে কাবু হয়ে ছুটিতে ছিল। বিছানায় শুয়ে ভাবল, এতদিন পর চেকটা বোধ হয় এলো। অতএব, অসুখ তুমি দূর হটো। খুশিতে ডগমগ নেতাই গা ঝাড়া দিয়ে উঠল।

পরদিন নেতাই হেড কোয়ার্টারে ছুটল। কিন্তু, পৌঁছে যা শুনল তাতে মুষড়ে পড়ল। ক্লান্ত গা গড়িয়ে দেদার ঘাম ঝরলেও দু'দণ্ড জিরোবার ফুরসত পেল না। বিল সেকশনের সেই সহজ সরলমনা ছেলেটি নেতাইয়ের চোখের সামনে গাইডবুকের পাতা মেলে ধরে আছে। টি আর আটচল্লিশ নম্বর ফর্মের নমুনা দেখিয়ে বলল, 'এক্ষুণি—বাইরে থেকে কয়েকখানা ফর্ম টাইপ করিয়ে আনুন। হাতে হাজার কাজ জমে আছে। তবু, আপনারটা আগে করে দেব।'

পাঁচতলা থেকে পথে নামল নেতাই। মোড়ের খুপরি ঘর থেকে আর্জেণ্ট খরচে ক'খানা ফর্ম টাইপ করিয়ে আনল। লেখালেখি সইসাবুদ করে ছেলেটির হাতে দিল। ক্ষুণ্ণ মনে বলল, 'ভালরকম চেক করে নিন। ফের কোনও কারণে ফেরত আসবে না তো?'

'কি করে বলব?' ছেলেটির মনেও যথেষ্ট আশঙ্কা। মিনমিন গলায় বলল, 'এর আগেও তো পে বিলের ফর্মে এরকম বিল করে পাঠিয়েছি। কই, সেগুলি ফেরত আসেনি তো! আসলে আপনার কপালটাই হয়তো মন্দ।'

সত্যিই তাই। ফের এক মাসের মাথায় পে অ্যাণ্ড অ্যাকাউন্টস অফিস থেকে জানানো হল, বিলের সঙ্গে পেশমেকারের মূল রসিদটা পাঠানো হয়নি কেন? সেটি দরকার। কেন পাঠানো হয়নি, দোষটা কার? কোথায় আছে সেই রসিদ? ব্যস, চালু হয়ে গেল নোটশিটে টেবিল থেকে টেবিলে নানা মন্তব্যের আঁচড়, টানাপোড়েন। নেতাই জানতে পারল দু'মাস গড়িয়ে যাওয়ার পর। হেড কোয়ার্টারে খোঁজ নিতে ছুটল। এখন কোথায় আছে সেই নোটশিটটা? বিকেলের ভাঙা হাটে কোনও হদিশ পাওয়া গেল না। আতঙ্ক উত্তেজনা উদ্বেগ নিয়ে বাড়ি ফিরে এলো।

পরদিন ছুটি নিয়ে নেতাই ফের গেল। মেমো নম্বর ধরে গোড়া থেকে খোঁজা শুরু করল। তিন তলায় অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসারের দপ্তরে নোটশিটটার পাত্তা পাওয়া গেল। যে করণিকের টেবিলে এসে ফাইলটা ঠাণ্ডা মেরে থমকে আছে, সে আবার একজন মাঝারি দরের নেতা। তাকে কখন সিটে পাওয়া যাবে বলা মুশকিল। বাধ্য হয়ে নেতাই অফিসারের দ্বারস্থ হল। মেমো নম্বর বিষয়ে নামধাম নোট করে নিয়ে অফিসারটি বলল, 'দু'দিন পর খোঁজ নেবেন।'

হাতে ছুটি থাকে আর কত? ক্যাজুয়াল, আর্নড, মেডিকেল বেবাক ছুটি খরচ হয়ে আর মাত্র একটিই পাওনা ছিল। দু'দিন পর সেই শেষ ছুটিটা খরচ করে নেতাই ফের গেল। তদ্বির করার পর মাত্র একখানা নোটশিটের ফাইলটা গড়াতে শুরু করল। কিন্তু রেফারেন্স সেকশন হয়ে সেক্রেটারিয়েটের রিসিভিং-এ গিয়ে থমকে দাঁড়াল। শেষ পর্যন্ত ফাইলটি যার হাতে গিয়ে পড়বে নেতাই সেই করণিককে ধরল।

বিস্তারিত শুনে করণিকটি সহানুভূতি দেখিয়ে বলল, 'রিসিভিং থেকে নানা হাত ঘুরে আমার টেবিলে আসতে ধরুন আরও সাতদিন। অ্যাসিট্যান্ট সেক্রেটারি এখন আবার ছুটিতে আছেন। তিনি কাজে যোগ দিলে পুরনো আদেশনামা বাতিল করে ফের নতুন একটি বের করতে হবে। তাহলেই আর পেশমেকারের রসিদটা দেওয়া দরকার হবে না। সেটি এখানেই আছে, থাকবেও।'

'তাতে কতদিন সময় লাগবে?'

'তা ধরুন আরও দু'মাসের ধাক্কা।'

'এত ধাক্কা আমি সামলাতে পারব না।' বিধ্বস্ত নেতাইয়ের গলায় ডুবন্ত মানুষের আর্তনাদ ফুটে উঠল, 'প্লিজ অন্য কোনও সহজ উপায়ে আপনি আমাকে বাঁচান।

নইলে আত্মঘাতী হব।'

নেতাইয়ের সঙ্কটটা করণিকটি ধরতে পেরে সহৃদয় হয়ে উঠল, 'আপনি তাহলে আর একটু কষ্ট করে রিসিভিং-এ যান। আমার নাম করে ফাইলটা একবার নিয়ে আসুন। দেখি কতটা কি করা যায়!'

রিসিভিং বলল, 'চাইলেই কী আর ওভাবে ফাইল পাওয়া যায়? এতই যদি জরুরি তো ওকে এসে সই করে নিয়ে যেতে বলুন।'

উঁচু দরের করণিকটি দ্বিধাহীন তাই করল। নোটশিট পড়ে মৃদু হাসল। তারপর পেশমেকারের মূল রসিদটি অন্য একটি ফাইল থেকে বের করে জেরক্স করিয়ে আনালো। জেরক্স কপিটা অ্যাটেস্ট করিয়ে সেই ফাইলে গেঁথে রাখল। আলাদা একখানা নোটশিট নিয়ে তাতে কীসব লিখল। দরকারি সইসাবুদ করিয়ে নিয়ে ওই নোটশিট আর পেশমেকারের মূল রসিদখানা নেতাইয়ের হাতে দিয়ে বলল, 'সোজা আপনাদের অ্যাকাউন্টস সেকশনে গিয়ে দিন।'

অ্যাকাউন্টস সেকশনের করণিক চটে আগুন। মেজাজ তুঙ্গে তুলে বলল, 'আপনার হাত মারফত রসিদটা এভাবে পাঠানোর অর্থ কী? আমাদের নোটশিট কোথায়? ওই নোটশিট সই করে রসিদটা আমি নিতে পারব না।'

সেক্রেটারিয়েটের দুঁদে করণিকটি শুনে চাপা হাসল। ফের একখানা নোটশিট বের করে বলল, 'ওদের নোটশিট আমরা কিছুতেই ফেরত দেব না। দেখাচ্ছি মজা, নেবে না আবার!'

নোটশিটখানায় অ্যাসিসট্যান্ট অ্যাকাউন্টস অফিসার সমীপে খচাখচ লেখা হল, পে অ্যাণ্ড অ্যাকাউন্টস অফিসের চাহিদামতো পেশমেকারের মূল রসিদখানা পাঠানো গেল। ইত্যাদি ইত্যাদি। তারপর নিজের অফিসারকে দিয়ে সই করিয়ে নিয়ে নেতাইকে বলল, 'যান। এবার আর না নিয়ে পারবে না।'

অফিসার টু অফিসার—না নিয়ে উপায় কী? কিন্তু মরতে মরণ নেতাইয়ের। করণিকটির কপালে ভাঁজ ফুটে উঠল। ফের ফ্যাঁকড়া তুলল, 'মেমো নম্বর কোথায়? কীসের ভিত্তিতে রেকর্ড করব?'

দ্রুত সময় গড়িয়ে যাচ্ছিল। একটু পরেই হাট ভাঙতে শুরু করবে। নেতাই আর সময় নষ্ট করল না। একদৌড়ে দোতলায় নামল।

মেমো নম্বর পড়ল বটে, কিন্তু এখন তো আর ওগুলি নেতাইয়ের হাতে দেওয়া যায় না। তাহলে উপায়?

নেতাই জিজ্ঞেস করল, 'যদি আমি সই করে নিয়ে যাই?'

ডেসপ্যাচ বলল, 'আপনাকে তো চিনি না।'

'তাহলে অন্তত পিওন বুকে এন্ট্রি করে দিন।'

'তা না হয় দিলাম। কিন্তু ক'টা বাজে এখন? পিওন পাবেন কোথায়?'

'বেশ তো পিওনের কাজটা না হয় আমিই করে দিচ্ছি। বিশ্বাস না হয়, সঙ্গে যে-কোনও একজন পাহারাদার পাঠান। প্লিজ। সারাদিন আজ ছুটি নিয়ে এখানে পড়ে আছি। টিফিন পর্যন্ত খাওয়া হয়নি।' ভাবাবেগ, জল চিকচিক চোখের কোণ, ভেজা গলার ফলশ্রুতি হিসেবে শেষ পর্যন্ত সব বাধা বাঁধন খুলে গেল বটে, নেতাই খুশি মনে বাড়ি ফিরতে পারল না।

এরপর না আঁচালে বিশ্বাস নেই—আশঙ্কা বুকে নেতাইয়ের দিন কাটছিল এক একটি মাসের মতো। সর্বক্ষণ বুক ধুকুপুকু উদ্বেগ উত্তেজনায় শরীর কাবু কাহিল হয়ে পড়ছিল। অথচ, হাতে পাওনা ছুটি নেই যে, বাড়িতে ক'দিন বিশ্রাম নেবে।

হঠাৎ একদিন বিষণ্ণ বিকেলে পাড়া চমকে সত্যর বাড়ির সুমুখে একটি ট্যাক্সি এসে থামতে দেখা গেল। সবাইকে অবাক করে ভেতর থেকে নেতাই নামল। ধীর পায়ে উঠোন দাওয়া চৌকাঠ পেরিয়ে গতি হারিয়ে ফেলল। দেওয়াল ধরে চোখ বুজে দাঁড়াল। সম্পূর্ণ সুস্থ সত্য ছুটে এসে ছেলেকে ধরে নিয়ে বিছানায় শোয়ালো। পাড়ায় খবর পেয়ে জগু হীরু ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়েই এলো। হীরু ডাক্তার অনেকটা সময় নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা করে অনুমান করল, এটাও সম্ভবত সত্যর মতো হার্ট ব্লকড কেস। ঘামে ভিজে একসা জামার পকেট থেকে পেশমেকার বাবদ পাওয়া চেকটা নেতাই অনেক কষ্টে জগুর দিকে এগিয়ে ধরল।

*ছবি ঃ কৃষ্ণেন্দু চাকী*

# সর্বজনীন

এমন অনেকেই আছে যাদের মুখের আদলে বিশেষ কোনও খুঁত-চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায়। আপাতদৃষ্টিতে চিহ্নটি কুশ্রী বিসদৃশ লাগতে পারে। কিন্তু, অনেক সময় সেই খুঁতটি সঠিক সৌন্দর্য বাড়িয়ে থাকে। আদরে কদরে তখন তার নাম হয়ে যায়, বিউটি স্পট। ঠিক তেমনি অনেক উজ্জ্বল নামযশঅলা বংশ পরিবারের সন্ধান মেলে যেখানে গুণগত নিম্নমানের একজন সদস্যের উপস্থিতি নজরে পড়ে। বেমানান বেখাপ্পা ব্যতিক্রম সেই ব্যক্তির কপালে বিউটি স্পট বিশেষণ না জুটুক, অন্যদের তুলনায় আদর কদর কোনও অংশে কমতি থাকে না। নিশ্চিন্তপুরের কেনারাম হালদারের সন্তান সোনা এমনই এক যথার্থ দৃষ্টান্ত।

বৃত্তান্তটা খোলসা হওয়ার জন্য একটু পেছন থেকে শুরু করা দরকার।

কেনারামের পিতৃপুরুষেরা ছিলেন জোতজমি কৃষি-নির্ভর। হাজার রকম গাছগাছালি আর পুকুর দিঘি গোয়াল নিয়ে বিস্তর বিঘা বাস্তুজমির ওপর হালদারদের দুর্গতুল্য পেল্লাই প্রাসাদ ছিল। ছিল, সিংহদুয়ার নাটমন্দির আষাঢ়ের রথ আর স্বপ্নে পাওয়া মনসা বিগ্রহ। কিন্তু, জমিদার বলতে যা বোঝায় হালদাররা তা ছিলেন না। যথেষ্ট বিত্তশালী হওয়া সত্ত্বেও কেউ জমিদার কেতায় দিন গুজরানও করতেন না।

উত্তরাধিকার-সূত্রে তিনকড়ি হালদারের ভাগে যা জুটেছিল তাতে একান্নবর্তী পরিবারে মোটামুটি স্বচ্ছলতা ছিল। তিনকড়ির সাকুল্যে নয়টি সন্তান। পুত্র কামনায় প্রথম ছয়টিই কন্যা। তিনপুত্র—বেচারাম ফেলারাম কেনারাম। সর্বকনিষ্ঠ কেনারামের মগজে অতি অল্প বয়স থেকেই একটা দুশ্চিন্তা ঘাই মারত। সেটি হল, ভবিষ্যতে পৈতৃক সম্পত্তি ফের ভাগাভাগি হবেই হবে। তখন বরাতে যা মিলবে তাতে কোনওমতেই আর শুধুমাত্র জমিজমা নির্ভর সংসার চালান যাবে না। অতএব, আগেভাগে নিজেকে অন্যমুখী রোজগেরে করে তুলতে পারলে পরে পস্তাতে হবে না।

ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সচেতন হলে কি হবে, কেনারামের মেধা ছিল কম। তাছাড়া, লেখাপড়ায় উৎসাহ আকর্ষণও বোধ করত না। সেজন্য, স্বপ্নও দেখত না তেমন কিছু। লক্ষ্যও ছিল, কোনওরকমে স্কুলের গণ্ডি পার হওয়া পরীক্ষায় পাশ দেয়া। তারপর যাহোক কিছু একটা হাতের কাজ শিখে নিয়ে রোজগেরে হওয়া।

যেমন ইচ্ছা তেমন কর্ম। ভাল নম্বর পেয়ে পাশ করলেও কেনারাম কলেজমুখী হয়নি। পরিবর্তে, মোটর ড্রাইভিং আর মেরামতিতে তালিম নিয়েছে। খুব বেশিদিন বেকার থাকতে হয়নি। সুযোগটা এসে গিয়েছিল বরাতজোরে গায়ে পড়ে।

ইটভাটার মালিক হয়েও সুরেন পাল নিশ্চিন্তপুরের যথেষ্ট ধনী মানী ব্যক্তি। সবকিছুতেই চোদ্দআনা বনেদিপনা। সুরেনের সাবেকি অস্টিন গাড়ি ছিল একটা। সেটি চালাত বাপের আমলের বুড়ো বদ্যিনাথ। হাঁপানি ব্যামোতে কাহিল বদ্যিনাথ বখা ছেলে তারকনাথের ভবিষ্যৎ গড়তে নিজ হাতে গাড়ি চালাতে শিখিয়েছিল। উদ্দেশ্য সফল হলে কি হবে, তারকনাথ বাপের মতো সত্যনিষ্ঠ প্রভুভক্ত ছিল না। না ছিল, উচিত অনুচিত-বোধ। সুরেনের ছোট মেয়ে মন্দিরাকে স্কুলে দিতে নিতে গিয়ে মাথা ঠিক রাখতে পারেনি। বামন হয়ে চাঁদে হাত বাড়াতে গিয়েছিল। ব্যস্ পত্রপাঠ বিদেয় হয়ে যায়।

সেই থেকে একজন সৎচরিত্রের ড্রাইভারের সন্ধানের ছিলেন সুরেন। একে তো পাড়াগাঁয়ে ড্রাইভার মেলাই মুশকিল তো আবার চরিত্র বিচার। অত সহজে কি পাওয়া যায়? সেদিক থেকে কেনারাম ছিল যথার্থ যোগ্য। লোকমুখে খবর পেয়ে সুরেন দু'দণ্ড দেরি করেননি। স্বয়ং গাড়ি হাঁকিয়ে এসে হাজির। যথাযথ মর্যাদা দিয়ে কেনারামকে দায়িত্ব নিতে বাধ্য করেন।

ব্যস্, কেনারামকে আর পায় কে? একে তো মোটামুটি লেখাপড়া জানা তায় দেখতে ভাল। বাপের বিষয় আশয় স্বচ্ছলতা তো আছেই। পাত্র স্বয়ং রোজগেরে। স্বনির্ভর পাত্রের দর কত! বছর না ঘুরতেই বিয়ে হয়ে গেল।

কেনারামের দূরদর্শিতার প্রমাণ মিলল তিনকড়ি মারা যাওয়ার পর। ছ'মাস পার না হতেই একান্ন ভেঙে তছনছ একশা। পৃথক তিন হেঁশেল হলেও ছাদ তো একটাই। মনোমালিন্য খিটিমিটি স্বার্থ-সংঘাতে অশান্তির চূড়ান্ত। ফলশ্রুতি, আড়াই বছরের মাথায় বিষয়সম্পত্তি ভাগ বাঁটোয়ারা হল। পাঁচিল বেড়ায় তিনপক্ষের মধ্যে সহজ যাতায়াত, মুখ দেখাদেখি পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেল।

তো সেই অস্থির সময় দারিদ্র্যের কোপ বলতে যা বোঝায় তা সবচাইতে বেশি এসে পড়েছিল কেনারামের ওপর। কেননা, তুলনায় ওর পুষ্যি সবচাইতে বেশি। ফের সকলেই আবার পড়ুয়া। সমস্যা সমাধানের সহজ পথ অবশ্য হাতের নাগালেই ছিল। আশুতোষ মনোতোষ তখন বেশ ডাগর। অনায়াসেই ওদের দু'জনকে কলেজ পড়া ছাড়ান দিয়ে জুতা কারখানার চাকরিতে ঢুকিয়ে দেয়া যেত। ওদের রোজগারে সংসারে স্বচ্ছলতা ফিরে আসত। কিন্তু, কেনারাম সহজসিধা সেই পথে পা বাড়ায়নি। পরিবর্তে, লড়াকু মানসিকতার মানুষটা রাতে গ্যারেজে গাড়ি মেরামতির কাজ ধরেছিল।

ঘাম রক্ত ঝরানো বাড়তি পরিশ্রমে কেনারামের লক্ষ ছিল, সন্তানদের যথোপযুক্ত লেখাপড়া শিখিয়ে সম্মানজনক জীবিকায় প্রতিষ্ঠিত করা। গোপন স্বপ্ন দেখত, ওরা সকলে যথেষ্ট নামযশের অধিকারী হয়ে হালদার বংশের মুখ উজ্জ্বল করুক। তো হাজারো কাঁটায় ভরা বাগানে সুবাস-ফুল ফোটানো কি সহজসাধ্য? সন্তানদের ভিত ভবিষ্যৎ ঠিকঠাক গড়ে তুলতে কেনারাম যথেষ্ট ঝুঁকি নিয়েছিল। নিজেকে প্রাণপাত উৎসর্গ করেও হালে পানি পায়নি। তাই বলে হতাশায় ভেঙ্গে পড়ে আত্মসমর্পণের সাদা পতাকাও ওড়ায়নি। জীবনযুদ্ধের রসদ জোগাতে ভিটে বাড়িটুকু ছাড়া বাকি সম্পত্তি বিক্রি করে দিয়েছে। আত্মীয় শুভাকাঙক্ষীদের মনে হয়েছে, এসব আহাম্মকি। সব সমালোচনায় সিদ্ধান্তে অবিচল কেনারামের জবাব ছিল বিজ্ঞজনের মতো। বলত, যেকোনও সাফল্যের পিছনে কমবেশি ত্যাগ নিষ্ঠা সংগ্রাম থাকেই। হয়তো সবসময় সেসব সকলের নজড়ে পরে না। সাফল্যের আনন্দ-আলোয় সবকিছু ঢাকা পড়ে যায়।

কেনারামের প্রচেষ্টা সংকল্প ব্যর্থ হয়নি। অনায়াসে না হলেও সাফল্য এসেছিল। একমাত্র কনিষ্ঠ সোনা বাদে বাকি সন্তানেরা হয়ে উঠেছিল এক একটি রত্নবিশেষ। সবার আগে আশুতোষ মনোতোষ শিবতোষ সরকারি দপ্তরে বড় অঙ্কের বেতনে সম্মানজনক পদে বসল। পরে প্রাণতোষ বেসরকারি কলেজে অধ্যাপনা শুরু করল। জ্ঞানতোষ হল নামী পত্রিকায় সাংবাদিক। আর শিশুতোষ ভেটানারি ডাক্তার। একমাত্র মেয়ে মণিমালা অর্থনীতিতে এম. এ পাশ করে আরও পড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। আচমকা এসে যাওয়া আমেরিকায় পাকাপাকি বসবাসকারী সুপাত্র প্রসেনজিৎ-এর সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল।

একই বীজে ফসল হয়েও সোনা যে জুয়েল হতে পারেনি তার পেছনে যথেষ্ট কারণ ছিল। ওর জন্মটাই ছিল, অপ্রত্যাশিত ব্যতিক্রম। কেনারামের বয়স তখন আটান্ন, নিভাননীর তেতাল্লিশ। ডাক্তারি মতে, নিশ্চিন্ত নির্ভয়ের লক্ষণগুলি যথেষ্ট সুস্পষ্ট। তৎসত্ত্বেও আচমকা অঘটন ঘটে গিয়েছিল। একে তো অষ্টম গর্ভের সন্তান সোনা, ফের সাড়ে আটমাসে অপরিপুষ্ট আকারে আগাম আগমন। ওর মরণবাঁচন নিয়ে পাক্কা দেড় বছর ছিল টানটান উদ্বেগ উত্তেজনা।

কলির কেষ্ট সোনা জন্মানোর পর থেকেই কেনারাম পরিবারে সুখ স্বচ্ছলতা শুরু। ব্যস্ আর যায় কোথায়। কৃষ্ণতোষের আদুরে নাম হয়ে গেল সোনা। মা বাপের দুরন্ত সোনার সাতখুন মাপ মকুব। দস্যি ছোট্ট ভাইটির যেকোনও দাবি আব্দারে দিদি দাদাদের দু'হাত খোলা। নবাবী কেতায় সোনা বেড়ে উঠল বটে, ঠিকঠাক লেখাপড়া করল না। না হল চরিত্রের ভিত পাকাপোক্ত।

অধিকাংশ মহাপুরুষরা নাকি গর্ভধারিণীকে যথেষ্ট কষ্ট দিয়ে জন্মেছেন। ছোটবেলায় দস্যিপনায় মা বাবাকে যথেষ্ট জ্বালিয়েছেন। লেখাপড়ায় ছিলেন অনুৎসাহী। ঈশ্বর ও ভাগ্যবাদী নিভাননীর এরকমই বিশ্বাস। অতএব, সোনার তেমন লেখাপড়া হবে না এ আর বিচিত্র কী?

দশক্লাসের পরীক্ষায় তিনবার গাড্ডা মেরে হতাশ সোনা বলল, খামোকা ভস্মে ঘি ঢেলে লাভ নেই। সবার দ্বারা সব কিছু হয় না। আমি আর পড়ব না।

বলে কি ছেলেটা! অবাক কেনারাম মর্মাহত। রাগে অগ্নিশর্মা। ছেলেটাকে আদরে বাঁদর করার জন্য সবচাইতে বেশি দুষল নিভাননীকে। চাকরিসূত্রে আশুতোষ শিবতোষ প্রাণতোষ শিশুতোষ তখন দূর দূর ঠিকানায়। আক্রমণ থেকে ওরা রেহাই পেলেও মনোতোষ জ্ঞানতোষ ছাড় পেল না।

সোনাকে একদিন একান্তে ডেকে কেনারাম বোঝাল, আর পড়বি না মানে! অন্তত দু'একটা পাশ টাশ না দিলে পেট চলবে কেমন করে? আমার তো জমিদারি নেই যে বেচে খেয়ে জীবন কাটিয়ে দেবে।

চেষ্টা তো কম করলাম না। সোনা মাথা নিচু করে মিনমিন করল, মাথায় কিছু না ঢুকলে কি আর করব?

বুঝলাম, মেধা সকলের সমান হয় না। লেখাপড়া প্রসঙ্গ পাল্টে কেনারাম বলল, তেমন বিদ্যে না থাকলেও আজকাল ভাল খেলতে পারলে রোজগার-পাতি মন্দ হয় না। চাকরিও জোটে। জ্ঞানতোষ তোকে বুটটুট কিনে দিয়েছিল। অথচ তুই কিনা মাঠে যাওয়াই ছেড়ে দিয়েছিস। সারাজীবন কি আর মাউথ অর্গান বাজালেই চলবে? ঠাণ্ডা মাথায় ভবিষ্যৎটা ভেবে দেখিস একবার। নইলে পরে পস্তাতে হবে।

সম্পর্কে বড় শুভাকাঙ্ক্ষীরা সকলেই লেখাপড়া না-শেখার কুফল সম্পর্কে কমবেশি বোঝালে কি হবে, সোনার সিদ্ধান্ত নড়চড় হল না। ওর সাফ কথা, নিজেই বুঝতে পারছি পাশ করা অসম্ভব। তাহলে ফালতু কেন ফের পরীক্ষায় বসতে যাব! বেকার এক কিল্লি টাকা খরচ। পণ্ড পরিশ্রম। ফেল-বদনাম।

সেই থেকে কেনারামের সাজানো সুখের বাগানে অশান্তির সূত্রপাত। সোনাকে কেন্দ্র করে উঠতে বসতে কেনারামের খিটিমিটি লেগেই থাকত। অকারণে দুর্ব্যবহার ছোটবড় দু'দশ কথা থেকে কেউই রেহাই পেত না। সকলেই যখন কমবেশি অতিষ্ঠ সেইসময় প্রমোশন পেয়ে মনোতোষ চলে গেল পুরুলিয়ায়। জ্ঞানতোষ বদলি হল পত্রিকার দিল্লি অফিসে। বাপের ভিটেয় পড়ে রইল সবেধন নীলমণি একা সোনা।

সোনার ওপর গর্ভধারিণী নিভাননীর রাগ ক্ষোভ তো দূরের কথা, ছিল অন্ধ

স্নেহ ভালবাসা। ছেলেটা যে মরার মুখ থেকে ফিরে বেঁচে আছে তাই যথেষ্ট। বাপ ছেলের মধ্যে ব্যবধান তিক্ততা-মিটিয়ে ফেলতে কেনারামকে হামেশা বোঝাত, ছেলেটাকে সবসময় বিষনজরে দেখতে থাকলে হিতে বিপরীত হতে পারে। খবরের কাগজে আজকাল কতরকম অঘটনের সংবাদই তো ছাপা হয়। বেশিদূর যেতে হবে কেন? দীননাথ মণ্ডলের মাত্র তেরো বছরের ছেলে বকু পরীক্ষায় খারাপ রেজাল্ট করে বকুনি খেয়ে রেলে গলা দিতে গিয়েছিল। আর মেজদির ছেলে নকু? মা বাবার বেহিসেবি শাসনে নিপাত্তা হয়েছিল। সোনাও যদি ধিক্কারে তেমন কিছু ঘটিয়ে বসে? হাতের পাঁচটা আঙুল কি আর সমান হয় কখনও।

নিভাননী সাতপাঁচ অশুভ আশঙ্কা করে কেনারামকে পরামর্শ দিল, তুমি বরং খোকাদের বলে দেখ। ওদের অফিস টফিসে কেউ যদি কোনও কাজকাম জুটিয়ে দিতে পারে তো কোনও সমস্যাই আর থাকে না।

ওই বিদ্যেতে চাকরি! প্রস্তাব শুনে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল কেনারাম। রূঢ় জবাব দিল বিকৃত ভঙ্গি করে, চাকরি কি আর হাতের মোয়া? নাকি গাছের ফল? আজকাল পিয়ন পেয়াদা দারোয়ান গোছের চাকরি জোটাতে হলেও পার্টি ইউনিয়ন মন্ত্রী নেতা—কারও ব্যাকিং দরকার হয়। নয়তো বড় অঙ্কের ঘুষটুস দেয়া দরকার পড়ে। তাছাড়া, অন্য ছেলেরা তো আর ওর মতো অপদার্থ গর্দভ না। সকলেই কমবেশি আত্মমর্যাদাসম্পন্ন। গুণধর ভাইটিকে কোন পরিচয়ে যাহোক কিছু একটা চাকরি জুটিয়ে দিতে গিয়ে নিজেদের মানসম্মান খোয়াতে যাবে!

কেনারাম তো অসমীচীন কিছু বলেনি। যথেষ্ট যুক্তিযুক্ত জবাব শুনে নিভাননী মনকে অন্যরকম প্রবোধ দিল, কি আর এমন বয়স হয়েছে সোনার যে এখনই যাহোক কিছু একটা রোজগারে নামতে হবে? চাকরি পাওয়া মানেই তো আর ছ'জনার মতো ভিটে মাটি ছেড়ে দূরে চলে যাওয়া ব্যাপার স্যাপার। বুড়ো বুড়ি বাবা মাকে কে তখন দেখভাল করবে? নিঃসঙ্গ শূন্য বুকে দিনগুজরান তখন দুঃসহ হয়ে উঠবে। তার চাইতে চাঁদপানা মুখখানা চোখের সামনে থাকা ঢের ভাল। হোক না সে বে-রোজগেরে।

অতএব, বছরের পর বছর গড়িয়ে যায় বেকার সোনা দিব্যি আনন্দে চড়েবড়ে খায়দায় ঘুমোয়। সিনেমা জলসা দেখে। টেপ ডেক বাজায়। কলকাতায় বড় ক্লাবের খেলায় মাঠে যায়। আমেরিকা থেকে মণিমালার পাঠানো ভি সি আর-এ মন পসন্দ ছবি দেখে। দিল্লি থেকে দাদা জ্ঞানতোষের পাঠানো ভেট ক্যামেরা নিয়ে মাঝেমধ্যে ট্যুরিস্ট হয়ে যায়। পোশাক আশাক হাতখরচে কোনও অভাব থাকে না।

হঠাৎ একদিন ভরদুপুরে কেনারামের শ্বাসকষ্ট দেখা দিল। সোনা বাড়িতেই

ছিল। একদৌড়ে ডাক্তার ডেকে আনল। হরনাথ ডাক্তার প্রাথমিক পরীক্ষানিরীক্ষা করে রায় দিল, ম্যাসিভ স্ট্রোক। গতিক মোটেই সুবিধার মনে হচ্ছে না। একমুহূর্ত সময় নষ্ট না করে এক্ষুণি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া দরকার।

আট সন্তানের মধ্যে একা সোনা যা ব্যতিক্রম, কমজোরি। কিন্তু, জন্মদাতার চিকিৎসা বলে কথা। সোনা আশঙ্কা করল, তিলমাত্র ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটলেও কেউই ছেড়ে কথা কইবে না। তখন যত দোষ নন্দ ঘোষের। সাতপাঁচ ভেবে সোনা কোনও ঝুঁকি নিল না। হাসপাতালে না গিয়ে কেনারামকে নিয়ে সোজা কলকাতার আকাশ-ছোঁয়া খরচের নার্সিং হোমে তুলল। ভর্তি-পর্ব সেরে নিকট-দূরে সর্বত্র ঝটিতি এস টি ডি আর আই এস ডি করে নিশ্চিন্ত হল।

জরুরি খবর পেয়ে কেনারামের সন্তানেরা যে যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি সপরিবারে এসে হাজির। সোনার সঠিক সিদ্ধান্তে সকলেই খুশি। কেউ কেউ ওর বুদ্ধির তারিফ করল। মণিমালা না এলেও উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় প্রস্তাব পাঠাল, প্রয়োজন হলে সে কেনারামকে আমেরিকায় নিয়ে চিকিৎসার যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করতে প্রস্তুত।

মণিমালার প্রস্তাবটা সকলের মনে ধরলে কি হবে, সবার আগে দরকার প্রাথমিক সংকট কাটিয়ে ওঠা। অতএব চলল, দু'হাত খোলা দেদার খরচাপাতি। হাত বাড়িয়ে দিতে কেউ কারও চেয়ে কম যায় না। অদ্ভুত এক প্রতিযোগিতার মানসিকতা সকলের। কিন্তু, ঘাটতিশূন্য প্রচেষ্টাতেও সাফল্য মিলল না।

কেনারাম সাকুল্যে সতেরো দিন ইনটেনসিভ কেয়ারে বেঁচেছিল। মৃত্যুসংবাদ শুনে শোকাহত ভিড়ের ভেতর থেকে একমাত্র সোনা বুক ফাটানো আর্তচিৎকার করে কান্নায় ভেঙে পড়ে। কিছুতেই থামতে চায় না। শুধু কি ডাক ছাড়া কান্না? মাঝে মাঝে কত যে খেদ কথা। ওকে সামলান দায়। কেউ সান্ত্বনা দিয়ে সমঝাতে যায় তো উল্টো সিধে শুনে ক্ষান্ত দেয়। কিছুটা সময় ওকে হালকা হওয়ার সুযোগ দিয়ে জ্ঞানতোষ বোঝাল, তুই এত ভেঙ্গে পড়ছিস কেন? বাবা তো আমাদেরও। বাবা কি কারও চিরদিন থাকে কখনও? বয়স তো কম হয়েছিল না।

তাছাড়া, প্রবোধ দিতে মনোতোষ দোহার টানল, এরপর বাবা যদি পঙ্গু হয়ে বিছানায় পড়ে কষ্ট পেত? একবার ভেবে দেখ তো, সবাইকে জীবিত রেখে দেখে বাবার যাওয়াটা কেমন রাজার মতো।

প্রাণতোষ স্বগতোক্তি করল, বাবা আরও অনেক বছর বাঁচলে নিজেদেরকে ভাগ্যবান মনে করতাম ঠিকই, কিন্তু বাবার ভাগ্যটাও দেখতে হবে। কাউকে কষ্ট না দিয়ে নিজে কোনও কষ্ট না পেয়ে কেমন চলে গেল। এ শুধু কৃতকর্ম আর অর্জিত পুণ্যের ফল।

হয়তো আরও অনেকে এরকম নানা জ্ঞান-কথা শোনাত, কিন্তু সোনা সেই সুযোগ দিল না। অতিষ্ঠ হয়ে হক কথা শুনিয়ে বসল, তোরা এত সহজভাবে নিতে পারছিস কেন জানিস? বাবা চলে যেতে তোদের যে কারও কোনও ক্ষতিই হল না। ন'মাসে ছ'মাসে একবার বাড়িতে আসতিস। কেউ কেউ বছরে দু'বছরে একবার। এখন থেকে এলে আর বাবাকে দেখবি না—এই যা।

এক নিঃশ্বাসে ঝাঁজ মেশানো কথাগুলি বলার পর সোনা ফের হাউমাউ করে কেঁদে উঠল, কিন্তু আমি যে বাবাকে রোজ দেখতাম। মাসের তিরিশটা দিন একসঙ্গে কাটাতাম। আমি যে কত একা হয়ে গেলাম তা তোরা কেউই বুঝছিস না। আজ থেকে আমার মাথার ওপর ছাতা নেই ছাদ নেই ছায়া থাকল না।

কে বলল, থাকল না? সেই সময়কার মতো উপস্থিত সকলে সোচ্চার আশ্বাস দিল, আমরা তো রইলাম।

পরে পারলৌকিক ক্রিয়াকর্ম মিটে যাওয়ার পর একদিন জরুরি বৈঠক বসল। নিভাননী আর সোনার ভবিষ্যৎ নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা ভাবনাচিন্তা বিনিময় হল। তারপর যে যার কর্মস্থলে ফিরে যাওয়ার আগে ঐকমত্যে পৌছানো সিদ্ধান্তটা সোনাকে শোনাল আশুতোষ। যথেষ্ট দরদ মিশিয়ে অল্প কথায় বলল, ভিটেমাটি ছেড়ে মা আমাদের কারও সঙ্গেই যেতে রাজি না। এখন থেকে বাড়ি ঘরদোর আর মাকে দেখভাল করার দায়িত্ব তোর। এখানকার সংসার খরচাপাতি আমরা সবাই মিলে যেমন চালাচ্ছিলাম চালিয়ে যাব। বাবা নেই বলে তুই খামোকা চিন্তা করিস না। বাবার অবর্তমানে দাদারাইতো বাবার মতো। তোর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এবার আমরা সিরিয়াসলি ভাবব। তোকেও ভাবতে হবে।

ব্যস্, সোনাকে আর পায় কে? আর কোনও দুশ্চিন্তাই রইল। না রইল এখন মাথার ওপর রক্তচক্ষু শাসন। অতএব, কিছুদিন পার হতেই সব শোক তাপ হতাশা উধাও। সোনা একটি স্বাধীন উড়ন্ত পাখি হয়ে গেল।

এখন ফি মাসের পয়লা সপ্তাহে সোনার হাতে ছ'খানা আড়াইশো টাকার চেক অথবা মনিঅর্ডার এসে পড়ে। সাকুল্যে দেড় হাজার টাকা বিনা পরিশ্রমে প্রাপ্তি। সেইসঙ্গে গাছগাছালির এটা সেটা বিক্রির টাকা যোগ করলে অঙ্কটা যা দাঁড়ায় সেটা ছোটমোট চাকরির মাস মাইনের চাইতে ঢের বেশি। বিধবা নিভাননীর জন্য কীই-বা খরচ এমন। ফলশ্রুতি, বেকার সোনার পোয়াবারো। পকেট ভারী। হাতে অফুরন্ত সময়। দেহে উচ্ছল যৌবন। অতএব, সোনা নয়নাপাড়ার উমেশ গাঙ্গুলির মেয়ে শশীর প্রেমে পড়ল।

গাঁয়ে যুবক যুবতীর ঘনিষ্ঠ মেলামেশা পাঁচকান হতে সময় লাগে না। যতটুকু

ঘটনা তার দশবিশ গুণ বেশি রটনা। মুখরোচক খাবারের চাখাচাখি চলতে থাকে। সোনা-শশীর ঘটনা রটনাটা একসময় উমেশ গাঙ্গুলির কানেও পৌঁছাল।

উমেশ দশ গাঁয়ের মধ্যে একমাত্র উকিল। রাশভারী বদমেজাজী মানুষ। সব কিছুতেই নাক উঁচু আচরণ। সোনা-শশী সম্পর্ক শুনে হালদারদের ওপর বেজায় চটল। কিন্তু, সোনাকে ধমকি দেয়ার বদলে ঘর সামলাতে আগে শশীকে বোঝাল, রূপে গুণে সাক্ষাৎ লক্ষ্মী তুই। ধর্মের ষাড়টা কিনা বামন হয়ে চাঁদে হাত বাড়াতে চায়! জানি, কাঁচামনে তুইও কিছু ভুলচুক করেছিস। সেসব আমি মাফ করে দিলাম। ফের যেন আর কোনও ভুল করিস না মা। মেলামেশা তো দূরের কথা ওর ছায়াও মাড়াস না। ঠিক সময়ে যুগ্যি পাত্র খুঁজে মহাধুমধাম করে আমি তোর বিয়ে দেব। আমার ওপর বিশ্বাস রেখে দেখ। তাতে তোর লাভ ছাড়া লোকসান হবে না।

উঠতি বয়সের প্রেম ভালবাসায় লাভ লোকসান বিচার! উমেশের নরম কথায় কাজের কাজ কিছুই হল না। সোনা-শশীর মেলামেশায় সতর্কতা এলো মাত্র। ওদের মন দেয়ানেয়া ব্যাপারটা লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে গেল। কিন্তু গ্রামগাঁয়ে আত্মীয় অনাত্মীয় মাত্রই অভিভাবকমনা। এতজনের নজর এড়াবার মতো তেমন নিশ্চিন্ত গোপন জায়গাই বা কোথায় এত?

রগুদার খবরটা ফের একদিন উমেশ উকিলের বৈঠকখানায় ফিসফিসিয়ে হাজির। ব্যস্, রাগ লজ্জায় উমেশের চোখকান লাল। মাথায় আগুন। অন্দরমহলে দবদবিয়ে ছুটল। সোজা শশীর ঘরে ঢুকল। এবার আর শান্ত নরম কথায় মন ভেজানোর ধারেকাছে গেল না। মেজাজ সপ্তমে চড়িয়ে ধমকাল, মাথাফাতা খারাপ হয়েছে তোর? আমার কথা অমান্য—এতদূর স্পর্ধা! ফের যদি শুনি, হালদারদের ওই বখা বাউণ্ডুলের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ রেখেছিস তো খুন করে ফেলব। ওই ছিঁচকে ছোকরাকেও ছেড়ে কথা কইব না। আইনের এমন প্যাঁচকলে ফেলব যে বুঝবে, কত ধানে কত চাল। জেলের ঘানি টানাব নয়তো ফাঁসিতে লটকাব।

ভরা যৌবনের প্রেম ভালবাসায় ভাবাবেগ বেশি। শশীর মনপসন্দ গান, পীরিতি কাঁঠালের আঠা। তাছাড়া, টিভি-র দৌলতে দুঃসাহসের অনেক কিছুই শেখা। শশী বিন্দুমাত্র বিচলিত সঙ্কুচিত হল না। উল্টে আজন্ম মুখচোরা শান্ত নম্র স্বভাবের ব্যতিক্রম আচরণ করে বসল। দুম করে মুখের ওপর সাফ কথা শোনাল, বিয়ে আমি সোনাদাকেই করব। তোমার কীসে এত বাধা?

কি বললি! বিস্ময় উত্তেজনায় উমেশ হতবাক। সাময়িক হতভম্বতা কাটিয়ে দ্বিগুণ গলা ফাটাল, বাধা হব না? হালদারদের সঙ্গে গাঙ্গুলিদের বিয়ে!

ওসব সেকেলে ভাবনা। আমি ওসব জাতপাত মানি না।

উমেশ উকিলের মেয়েকে বিয়ে করার কী যোগ্যতা আছে ওই ডিক্‌লে ছেলেটার?

ও খাটো কীসে? শশী অকুতোভয়। সোনার স্বপক্ষে যুক্তি দেখাল, দরকার হয়নি তাই এখনও রোজগার করতে নামেনি—এইটুকুই যা ঘাটতি। নইলে পাত্র হিসেবে দেখতে শুনতে সুন্দর। স্বভাব চরিত্রে কোনও দোষ নেই। দশ গাঁ ঘুরলেও অমন আর একটা ভদ্র শিক্ষিত ফ্যামিলি খুঁজে পাবে না। অতবড় বাড়িটা এখন বুড়ি মাকে নিয়ে একা সোনাদা ভোগ করছে। মা আর কদ্দিন? দাদারা কেউই আর ওই ভিটেয় থাকতে আসবেন না। যে যার মনের মতো জায়গায় ফ্ল্যাট কিনে, বাড়ি বানিয়ে থাকবেন। সবাই বলেছেন, এখানকার সব স্বত্বদখল সোনাদার নামে লেখাপড়া করে দেবেন। আর কী চাই তোমার?

অর্থলোলুপ উমেশের মাথার রক্ত নিমেষে পায়ে নেমে এলো। চতুর উদ্দেশে সুর নরম করল, তা না হয় বুঝলাম। শুধুমাত্র ভবিষ্যতের ভরসায় তো আর বেকার কোনও ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেয়া যায় না। আমার মান ইজ্জতের দিকটাও তো তোকে ভেবে দেখতে হবে। ওকে আগে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে যোগ্যতা দেখাতে বল। তারপর না হয় ভেবে দেখা যাবে। তদ্দিন তোদের মেলামেশাটা বন্ধ রাখা দরকার। নইলে গাঁয়ের লোকের মুখ বন্ধ রাখা যাবে না।

সরল বিশ্বাসে শশী উৎসাহিত হল। সোনাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে বোঝাল, বাবা তো খারাপ কিছু বলেনি। বেকার বদনাম ঘোচাতে দাদাদের ধরে যাহোক কিছু একটা চাকরি জোটাতে চেষ্টা কর।

সোনা আহ্লাদে আটখানা। উড়ন্ত ডানা গুটিয়ে বাস্তবমুখী হওয়ার চেষ্টা শুরু করল। প্রথমেই জরুরি ভিত্তিতে দাদাদেরকে খোলামেলা চিঠি লিখল। কিন্তু নানা মুনির নানা মত। চিঠির বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে ওদের নিজেদের মধ্যে চিঠি চালাচালি মতামত বিনিময় হতে সময় কেটে গেল অনেকদিন। তারপর একসময় সকলে মোটামুটি সহমত সিদ্ধান্তে পৌঁছাল, আজকের দিনে চাকরি মোটেই সহজলভ্য নয়। চেষ্টাতে কোনও ঘাটতি না থাকলেও সোনার নিজস্ব উপার্জনের ব্যবস্থা করা কবে সম্ভব তা অনিশ্চিত। তবে সেটা আজ না হোক কাল অবশ্যই হবে। কিন্তু যৌবন? একবার গেলে কোনওকালেই আর ফিরবে না। তাছাড়া, সোনাকে এখনই বিয়ে দিতে পারলে মা-র শেষ জীবনের দিনগুলিতে অন্তত একজন পুত্রবধূর সেবাযত্ন জুটবে। মোদ্দা কথা, লোভনীয় পাত্রী হাতের মুঠোয় পেয়ে সুযোগ হাতছাড়া করা উচিত হবে না। প্রয়োজনে মাস-বরাদ্দের টাকার অঙ্কটা কিছু বাড়িয়ে দিতে সকলেই প্রস্তুত। তবু গাঙ্গুলিবাড়ির মেয়ে শশীকে হালদার পরিবারের বউ করে আনা চাই-ই-চাই।

সোনা-শশীর বিয়ের বিষয়টা ঐকমত্যে সকলে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিল। স্থির করল, আগামী দিনের লড়াইয়ের প্রস্তুতি কৌশল হিসেবে আপতত ওদেরকে রেজিস্ট্রি বিয়েতে বেঁধে রাখা হবে। তারপর দেখা যাবে, কোন আইনবলে ধূর্ত অহঙ্কারী উমেশ উকিল সোনাকে জেলের ঘানি টানায় অথবা ফাঁসিতে লটকায়।

যথাসময়ে সোনা-শশীর রেজিস্ট্রি বিয়েও হয়ে গেল। কিন্তু গোপনীয়তা রক্ষার সুস্পষ্ট নির্দেশ থাকলে কি হবে আইনসিদ্ধ স্বামী স্ত্রী বলে কথা। মেলামেশায় ওরা ক্রমশ এত দুর্বার বেপরোয়া হয়ে উঠল যে সেকেলে নিভাননীর ভাল ঠেকল না। জরুরি বার্তা পেয়ে মনোতোষ ছুটে এলো। সরাসরি উমেশ উকিলের কাছে বিয়ের প্রস্তাব রাখল।

উমেশ আতিথেয়তা আপ্যায়নে ত্রুটি রাখল না বটে কিন্তু এক গোঁ—এ বিয়ে অসম্ভব। মনোতোষ সংযত সতর্কতার সঙ্গে বলল, সোনা-শশী পরস্পরকে চায়। এক্ষেত্রে আপনি আমি তৃতীয় শক্তি ওদের বিয়ে আটকাতে পারি কি? আমরা কেউ না-চাইলেও বিয়ে ওদের হবেই।

আমি না চাইলেও যদি তা সম্ভব চেষ্টা করেই দেখুন না। খামোকা সময় নষ্ট করছেন কেন?

শুভ কাজ তাই। মনোতোষ দাঁড়িয়ে বলল, আমরা চাইছিলাম আর দশটা বিয়ের মতো ওদের বিয়েটাও আলাপ আলোচনা ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সুসম্পন্ন হোক। আপনি না চাইলে সেরকম আশা ব্যর্থ হবে বটে, কিন্তু বিয়েটা ওদের হবেই।

উমেশের যত রাগক্ষোভ গিয়ে পড়ল শশীর ওপর। শশী নজরবন্দিনী হল। সর্বক্ষণ চলল শাসন গর্জন খিটিমিটি। উঠতে বসতে দুর্ব্যবহার। মানসিক অত্যাচার।

অতিষ্ঠ তিতিবিরক্ত শশী একদিন সুযোগ বুঝে বাপের ভিটে ছেড়ে সোজা থানায় গিয়ে হাজির হল। বৈধ বিয়ের সাবুদ দেখিয়ে বলল, আমি এখন শশী হালদার। স্বামী শ্রীকৃষ্ণতোষ হালদার। আনুষ্ঠানিক বিয়ের অপেক্ষায় এতদিন আমি আমার বাবা শ্রীউমেশ গাঙ্গুলির কাছেই ছিলাম। কিন্তু অনিবার্য কারণে আজ আমি স্বেচ্ছায় বাপের বাড়ি ছেড়ে স্বামীর ঘরসংসার করতে যাচ্ছি। ঘর পালানো কিংবা ফুসলানোর অভিযোগ এনে যদি কেউ থানায় ডায়েরি করতে আসে তাহলে যেন গুরুত্ব দেয়া না হয়।

বৃত্তান্ত শুনে শশীকে বুকে টেনে নিল নিভাননী। এতকাল যক্ষের ধনের মতো আগলে রাখা গুচ্ছের গহনা পরিয়ে আশীর্বাদ করল।

সামাজিক মতে সোনা-শশীর বিয়ে হল না বটে, কিন্তু পরবর্তীকালে দিনক্ষণ দেখে চোখ ধাঁধানো বৌভাত অনুষ্ঠান হল। একা উমেশের সামর্থে যা সম্ভব ছিল

না হালদারদের তরফে সম্মিনিত চাঁদা আশীর্বাদী আর প্রীতি উপহারে ওদের কপালে যা জুটল তা ঢের ঢের বেশি।

নিভাননীর এখন যথেষ্ট বয়স হয়েছে। হতশ্রী ঘরে লক্ষ্মী এসে সব শূন্যতা ভরিয়ে দিয়েছে। সেবাযত্নে বিন্দুমাত্র ঘাটতি নেই। তবু কিছু একটা অভাব বোধ করে নিভাননী। বাকি সাধ ইচ্ছা বলতে একটাই এখন, ছোট ছেলের ঘরের নাতি নাতনির মুখ দেখা। তাহলেই ষোলোয়ানা তৃপ্তি পরিপূর্ণতা। উঠতে বসতে যদি এমন কোনও সাধ-কথা আক্ষেপ কানে আসে তো কতদিন আর নির্বিকল্প থাকা সম্ভব?

যথাসময়ে সোনা-শশীর ফুটফুটে সুন্দর একটি কন্যা সন্তান জন্মাল। নিভাননী আদর করে নাম রাখল, মিষ্টি। মিষ্টির জন্য চারদিক থেকে প্রীতি উপহারের বন্যা বয়ে গেল। আমেরিকা থেকে পিসি মণিমালার পাঠানো বিলিতি ভেট এলো। কপাল আর কাকে বলে? উমেশ আর গোঁ ধরে মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারল না। নাতনি বলতে এই প্রথম। স্বভাবতই বেবাক রাগ ক্ষোভ অভিমান ভুলে যথাযোগ্য তত্ত্ব নিয়ে সকলে হাজির। ফেরার সময় উমেশ যথাযথ মর্যাদা দিয়ে মেয়ে-জামাই নাতনিকে নিয়ে গেল। আনুষ্ঠানিক সামাজিক বিয়ে দিলে যা যা সামগ্রী দিত এতদিন পরে হলেও সোনা-শশীকে তার কোনওটা থেকেই বঞ্চিত করল না।

বারোয়ারি ব্যাপারে ব্যক্তি বিশেষের গায় তেমন কোনও আঁচড় লাগে না। অথচ সম্মিলিত চাঁদার বিরাট অঙ্কে উৎসব অনুষ্ঠান হয়ে ওঠে চোখ ধাঁধানো জাঁকাল। মিষ্টির অন্নপ্রাশনের বেলাতেও ব্যতিক্রম কিছু ঘটল না। ফের একদফা প্রীতি উপহার আশীর্বাদীর পাহাড় জমে গেল। সেই থেকে শুরু চোখ টাটানি। গোপন ফিসফিসানি, নিজেদের ছেলেমেয়ের অন্নপ্রাশনে একার পক্ষে এত ঘটা করা সম্ভব হয়নি। ওদের কপালে তাই এত কিছু জোটেওনি।

এদিকে বছরের পর বছর গড়িয়ে যায়। বাজারে জিনিসপত্রের দরদাম বাড়ে বিস্তর। মিষ্টিকে ভাল কোনও স্কুলে ভর্তি করা দরকার। নিভাননীর শরীরে নিত্যনতুন গোলযোগ দেখা দিচ্ছে। ডাক্তার ওষুধ পথ্য খরচ বাড়ছে তো বাড়ছেই। অথচ, ছ'খানা মনিঅর্ডার অথবা চেকে টাকার অঙ্ক বাড়ার নাম নেই। মনে অসন্তোষ জমলেও চাপা অভিমানে সোনা কাউকেই নিজের অভাব অনটনের কথা লিখল না। পরিবর্তে, স্ত্রী সন্তানের প্রতি দায়দায়িত্ব কতর্ব্যবোধে স্বনির্ভর হয়ে উঠতে চাইল। দাদাদের স্বয়ং রোজগেরে হওয়ার বাসনা জানাল।

বাজারের দরদাম ক্রমশ আকাশমুখী হওয়ার সমস্যাটি একা সোনার বেলায় না। ওর বিয়ের পর একবারই মাত্র বরাদ্দ বেড়েছিল। পঞ্চাশ বেড়ে আড়াই থেকে

তিনশো। কিন্তু আরও বাড়ানো দূরের কথা, তিনশো টাকা পাঠাতে এখন অনেকেরই স্বচ্ছলতায় টান পড়ে। তা সে যতই উপার্জন করুক না কেন। তাছাড়া, পৃথক বংশজাত বউদের ছ'রকম মন মানসিকতা আত্মা উদারতা। রক্ত সম্পর্কের দাদাদের স্নেহ-দুর্বলতার সঙ্গে মিলবে কেন? একটি বিষয়ের হিসাবে বড় ছ'বউ সহমত। সেটি হল, বাবার বিষয় সম্পত্তি তো একা সোনাই ভোগ করছে। তারপর ভিন্ন ভিন্ন হিসেব নিকেশ মন্তব্য। দু'চার মাথা এক হলেই সমালোচনার ঝড় ওঠে। যেমন, মাসভর খেটে কোন দাদা কত বেতন পায়? সোনা কিনা বিনা পরিশ্রমে মাস গেলে মুফতে হাতের মুঠোয় প্রায় দু'হাজার টাকা পেয়ে যায়! পুজোর সময় কার ছেলেমেয়ের ক'খানা জামাকাপড় মেলে? মিষ্টির কপালে এক ডজন জুটে যায়! আর মণিমালা? যেহেতু সোনা দুর্বল অক্ষম তাই ওদের বেলায় যত দু'হাত খোলা। বিলিতি ক্যামেরা টিভি টেপ রেকর্ডার মিক্সি ও ইস্তিরি কী নেই ওদের? মিষ্টিরতো প্রায় সবকিছুই বিলিতি। শশীই কি কম পায় কিছু? সব দিক থেকেই সোনা-শশী-মিষ্টি লাভবান। আমাদের মতো ওদের কোন কিছুতেই চিন্তাভাবনা নেই। ওরা সব চাইতে নিশ্চিন্ত সুখী। ইত্যাদি ইত্যাদি।

অনেকদিন হল যে যার স্বামীর ওপর চাপ দিচ্ছিল হাত গোটানোর। তা নাহলে নাকি সোনা চিরদিন অন্যের বরাদ্দ টাকায় মজাই মেরে যাবে। জীবনেও নিজের পায়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করবে না। ঠ্যালায় পড়লে তবেই পারবে। স্বভাবতই স্বয়ং সোনার তরফ থেকে স্বাবলম্বী হওয়ার বাসনা-সংবাদে সকলেই খুশি হল। কিন্তু চাকরি জুটিয়ে দেয়া কি আর অতই সহজ? একে তো ওই বিদ্যে। তারপর যথেষ্ট বয়স হয়েছে এখন। ব্যবসাই একমাত্র সহজ সমাধান পথ।

জ্যেষ্ঠতম হিসেবে প্রথম প্রস্তাব রাখল আশুতোষ। কিছুকাল চিঠি চালাচালির পর ঐকমত্যে প্রস্তাবটি সমর্থিত হল। প্রস্তাবটি যথাসময়ে নির্দেশ হিসেবে সোনার হাতে পৌঁছাল। সেইসঙ্গে মাসের বরাদ্দের অতিরিক্ত ছ'খানা দু'হাজার টাকার ড্রাফট আর চেক।

স্টেশনারী দোকানদারি করতে হবে! ব্যবসা সোনার মনে ধরল না। শীত গ্রীষ্ম বর্ষা রোদ জল ঝড় কোনও প্রতিকূল অবস্থাতেই রেহাই নেই। না আছে সি এল, ই এল, মেডিকেল লিভ। বোনাস মিলবে না। শরীরে টুকটাক গোলযোগ হলেও ঝাঁপ বন্ধ রাখা চলবে না। দু'দিন অন্তর পাইকারি বাজারে মাল গস্ত করতে ছুটতে হবে। আরও হাজার সমস্যা। লোকসানের ঝুঁকি থাকবে। সর্বোপরি না চলবে কোনওরকম ফাঁকি। সবক্ষণ ব্যস্ততায় সংসার সামাজিক জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠবে।

এতকাল চড়েবড়ে মহানন্দে নিশ্চিন্তে কাটিয়ে এখন এত হ্যাপা আর বন্দিদশা

সোনার ভাল লাগবে কেন। অথচ পাওয়া ধন পায়ে ঠেললে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে পারে।

দ্বিধাদ্বন্দ্বে শশীর পরামর্শ চাইল সোনা। শশী বোঝাল, ছোট দিয়ে শুরু করাই ভাল। যোগ্য হয়ে উঠতে পারলে না হয় স্টেশনারী দোকানদারি ছেড়ে বড় কোনও ব্যবসা ধরবে।

বড় ব্যবসা! সোনা ভুরু কোঁচকাল, কত টাকা লাগে জান?

বলছি তো, আগে যোগ্য হয়ে ওঠো। তখন শুধু তোমার দাদারাই নয় খুশি হয়ে আমার বাবা দাদাও নিশ্চয়ই দেবে।

অতএব, সাকুল্যে অনুদানের বারো হাজার টাকায় সোনা স্টেশনারী দোকান খুলে বসল। কিন্তু বসলে কি হবে মনের কোনও যোগ নেই। ভালবাসতে না পারলে কোনও কাজে সাফল্য আসে কখনও? অসফল কাজে ধৈর্য ধরার মতো চরিত্রও নয় সোনার।

এদিকে ব্যবসা শুরু করায় মাস-বরাদ্দে টাকার অঙ্ক নেমে এসে দাঁড়িয়েছে বারশোতে। সেজন্য সোনার ক্ষোভ চিন্তার অন্ত নেই। লাভ বলতে তো রাই কুড়িয়ে বেল। তা সেই বেলটার সাইজ কত বড় তা ভেবে দেখবে না কেউ! সোনার আশঙ্কা হল, মাস-বরাদ্দটা ক্রমশ কমতেই থাকবে। মা মরলে নিশ্চিত শূন্যতে এসে দাঁড়াবে। তখন কী দশা হবে?

অতএব, নিভাননী বেঁচে থাকাকালেই সোনা পাকাপোক্ত ব্যবস্থা আদায় করে নিতে চিঠিতে সর্বত্র জানাল, দোকানে বিক্রিবাট্টা নেই বললেই চলে। এই ব্যবসায় মুনাফা খুবই কম। একে তো প্রয়োজনের তুলনায় পুঁজি যৎসামান্য মাত্র। তার ওপর নিত্যনতুন প্যাকেট লেবেল পাল্টায় বলে পুরনো সেই জিনিস অবিক্রিত থেকে যায়। শীতের জিনিস গরমে, গরমের জিনিস শীতকালে নষ্ট হয়। এছাড়া আরও নানা সমস্যা। ঘরভাড়া ইলেকট্রিক বিল ইত্যাদি খরচাপাতি মিটিয়ে যা মুনাফা হাতে আসে তাতে সংসারের খরচ চালান দায়। কোথায় পুঁজি বাড়বে, সেখানে উল্টে পুঁজিতে হাত পড়তে চলেছে। এই ব্যবসায় কোনও ভবিষ্যতই আমি দেখছি না। এর চাইতে সামান্য বেতনের যেকোনও চাকরি ঢের বেশি নিরাপদ। তেমনটিই আমার পছন্দ।

তো শিবতোষ মেটিয়াব্রুজের সুতোকলে চাকরি জুটিয়ে দিল। মেশিনে কাজ। মাইনে পত্তর মন্দ না। হলে কী হবে সারা শরীরে যে তুলো কালিঝুলি লেগে যায়। পাশের শ্রমিক মদ গিলে কাজে আসে। কথায় কথায় খিস্তি ছোটায়। সোনার পক্ষে মানিয়ে নেয়া সম্ভব কখনও? মাত্র তিনমাসের মাথায় দিল চাকরি ছেড়ে। মনোতোষ

বজবজের চটকলে ঢোকাল। সেখানেও সেই একই পরিবেশ। প্রথম সপ্তাহের বেতন পেয়ে সোনা আর ওমুখো হল না। মনোতোষ আসামে একটা চাকরি দিতে চেয়েছিল। নামী ইঞ্জিনিয়ারিং সংস্থার লেবার কনট্রাকটরের অধীনে তদারকি কাজ। থাকতে হবে সাইটে যেখানে ব্যারেজ তৈরি হচ্ছে সেখানে। শুনে নিভাননী শশী একজোটে কেঁদেকেটে একশা। রোদ জল ঝড়ে তাঁবুতে থাকা জীবন সোনারও পছন্দ না। সেটা আর জানান দেয়া দরকার হল না। নিভাননী শশীর বাধা দেয়া অজুহাতে পার পেয়ে গেল। সবশেষে বিপত্তি ঘটল শিশুতোষের বুদ্ধিমতে লেদ মেশিনের কাজ শিখতে গিয়ে। শুধু তো কাজ শেখা মাত্র নয়, হাতখরচও মিলবে। নিজের যোগ্যতায় যত তাড়াতাড়ি কাজ শিখবে ততই ভাল। চাকরির বাইরে অতিরিক্ত উপার্জনের ধান্দায় লেদ কারখানা গড়তে মূলধন জোগাবে শিশুতোষ। পরিশ্রম সোনার। লাভের অংশ আধা আধা ভাগ হবে। উত্তম প্রস্তাব। লোভনীয় আকর্ষণ সন্দেহ নেই। রঙিন স্বপ্নে বিভোর বিপুল উৎসাহে কাজ শিখতে শুরু করল। কোথায়? বেলেঘাটার খালধারে আলো বাতাসহীন বস্তির দূষিত পরিবেশে। ফের হাড় ভাঙা খাটুনির ধকল। সোনার বুকে দোষ ধরে গেল। সব স্বপ্ন ভেঙে তছনছ। পাক্কা একবছর ধরে অপরাধী শিশুতোষের খরচে চিকিৎসা চলল। রোগ সারল বটে, কিন্তু ভাঙা শরীর আর আগেকার মত হয়ে উঠল না।

ফলশ্রুতি, সোনা পুনরায় দাদাদের দেয়া নিরাপত্তার ছায়া ফিরে পেল।

বছরের পর বছর গড়াল। সোনার চুলে পাক ধরল। উমেশ উকিল নিভাননী গত হল। সোনার দু'টি মাড়ি-দাঁত পড়ে গেল। অন্য একটিও নড়বড়ে। কিন্তু, নিশ্চিন্ত আরাম আনন্দের জীবনে তেমন কোনও হেরফের ঘটল না।

সোনা অক্ষম অপদার্থ হলেও মিষ্টির ওপর কোনও প্রভাব পড়েনি। এতকাল নিঃসন্তান ছোটমামা মামির স্নেহ আদর বিলাস-ছায়ায় নাম করা স্কুলে পড়ছিল। কলকাতায় হোস্টেলে থেকে কলেজে পড়বে ঠিকঠাক, বড় জ্যেঠা বড়মা বাধা দিল। ওদের একমাত্র সন্তান চিরন্তন থাকে লণ্ডনের স্নারেস ব্রুকে। এক বিদেশিনীকে ভালবেসে বিয়ে করে সেখানে স্থায়ী ঘরসংসার পেতেছে। এখানে এণ্টালি পদ্মপুকুরের ওনারশিপ ফ্লাটটা নাকি খাঁ খাঁ করে। অতএব, নিঃসঙ্গ শূন্যতা ভরাট করতে মিষ্টিকে অবশ্যই চাই।

মিষ্টি অনায়াসলভ্য পদ্মপুকুরের শৌখিন ফ্লাটে থেকে কলেজ ইউনির্ভাসিটি পড়া-পর্ব শেষ করল। তারপরও ছাড় পেল না। ফ্লাটের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারিণী হিসেবে ওদের দু'জনকে দেখভাল করার দায়িত্ব কর্তব্যে বাঁধা পড়ে আশুতোষ পরিবারের আরও একজন হয়ে গেল।

তো মিষ্টির এবার বিয়ে দেয়া দরকার। জন্মদাতা সোনা স্বভাবমতো প্রতিক্রিয়াহীন নিস্পৃহ নির্বিকার। তাতে কি এমন এসে যায়? এক ফুলের অনেক মালি। পিতৃমাতৃ-কুলের শুভাকাঙক্ষীদের সংখ্যা তো কম না। আগে ভাগে সকলেই প্রায় ধরে নিয়েছে, ভবিষ্যতে সোনার কন্যাদায়ের ভারবহন ভাগাভাগি করে নিতে হবে। হয়তো কারও ক্ষেত্রে কম অথবা বেশি। সেজন্য, আগাম আর্থিক প্রস্তুতিও নেয়া আছে। রূপে গুণে বংশের সেরা মিষ্টির বরটি কেমন হতে হবে সে সম্পর্কে রকমফের স্বপ্ন সকলের। অনুষ্ঠান সম্পর্কে পরিকল্পনা নানান।

মিষ্টির জন্য প্রতিযোগিতামূলক পাত্র-সন্ধান চলছে তো চলছেই। পাত্রী দেখানোর অন্ত নেই। মিষ্টিকে পাত্রপক্ষের পছন্দ যদিবা হয় পাত্রকে কিছুতেই মনে ধরে না। একের পছন্দ পাত্র কিছুতেই অপরের বিচারে যথাযথ হয় না। অতএব, ঐকমত্যের অভাবে নাকচ হয়ে যায়। গড়িয়ে যেতে থাকে দিন মাস বছর।

হঠাৎই একদিন শশীকে একান্তে ডেকে মিষ্টি বলল, আমার জন্য আর কারও পাত্র খোঁজার দরকার হবে না। পলাশ গাঁয়ের পূর্ণেশকে তো তুমি চেন। ওকেই আমি বিয়ে করব। বাবাকে তুমিই জানিয়ে দিও।

অবাক হলেও শশী ভালমন্দ কোনও মন্তব্য করল না। পিছন ফিরে নিজের অতীত নিয়ে কিছুক্ষণ ভাবল। তারপর পূর্ণেশ সম্পর্কে অজ্ঞাত অনেক কিছু জেনে নিল। কথায় বলে, শুভস্য শীঘ্রম। সোনা সময় নষ্ট না করে সর্বত্র জানাল, পূর্ণেশ একমাত্র সন্তান। ছোটবেলায় মা বাবাকে হারিয়েছে। তবু নষ্ট হয়ে যায়নি। কাকাদের অনাদরে চরম দুঃখকষ্টে দিন কাটিয়েছে। কঠোর পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে আজ সে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে। মিষ্টির সঙ্গে এম এ পাশ করে এখন নিশ্চিন্তপুর উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলে শিক্ষকতা করছে। আর্থিক দিক থেকে তেমন শক্তসমর্থ না হলেও ছেলেটি আদর্শবান নীতিনিষ্ঠ ও সৎচরিত্রের। আমাদের কোন পুত্র-সন্তান নেই। আশা রাখি, জামাই সম্পর্ক হলে সে বৃদ্ধ বয়সের আমাদের দু'জনকে দেখভাল করবে। আমি অক্ষম বাবা। তোমরা যারা মিষ্টির বিয়ে দেবে তাদের সিদ্ধান্ত আমি মেনে নিতে বাধ্য। ওর বিয়ে সম্পর্কে সকলের আশা আকাঙ্ক্ষা স্বপ্ন আমার অজানা নয়। মিষ্টি ভাব ভালবাসায় নিজে পাত্র পছন্দ করায় সকলেই কম বেশি হতাশ হবে, দুঃখ পাবে তাও জানি। তবু, শশী আর আমার ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে এই পাত্রের সঙ্গে বিয়েতে অমত না করলে খুশি হব।

গাঁয়ের বাইরে ভিন্নতর পরিবেশে থাকা এবং যথেষ্ট শিক্ষিত সুবাদে সকলেই প্রগতিশীল। সময়ের গতির সঙ্গে মানিয়ে চলতে অভ্যস্তও বটে। সুতরাং, অমত দূরের কথা বিরূপ কোনও প্রশ্নই উঠল না। হোক না প্রেম ভালবাসায় আগাম

মেলামেশা, রীতিমতে পাত্রী দেখানো হল। আনুষ্ঠানিক পাকা কথায় বিয়ের দিনক্ষণ নির্ধারিত হয়ে গেল। দেনাপাওনার প্রসঙ্গ না উঠলেও আগাম জানিয়ে দেয়া হল, এই আমাদের শেষ কাজ। দানসামগ্রী তত্ত্বে কোনও ঘাটতি থাকবে না, নতুন সংসার পাততে যা যা দরকার—সব সাজিয়ে দেয়া হবে। আড়ম্বর হবে মানমর্যাদার দিকে নজর রেখে।

হলও তাই। সামর্থ আন্তরিকতা ঔদার্য অনুযায়ী দশজনে হাত বাড়ালে বিন্দু থেকে সিন্ধু হবে আশ্চর্য কী। মিষ্টি-পূর্ণেশের বিয়ে নয়তো যেন নিশ্চিন্তপুর তরুণদলের চোখ ধাঁধানো কালীপূজার আড়ম্বর। রেকর্ড ভাঙা পরিমাণ গহনা পেল মিষ্টি। হালফিল শৌখিন তত্ত্ব দানসামগ্রী মিলল। ফ্রিজ ভি সি পি ওয়াশিং মেশিন ইত্যাদি বিলাসদ্রব্য পর্যন্ত বাদ পড়ল না। যথেচ্ছ প্রীতি উপহার আশীর্বাদীর ছড়াছড়ি।

দেখেশুনে অনেকেরই চোখ টাটাল। খরচের বহর দেখে ঈর্ষায় দেহ জ্বলল। কিন্তু, একান্তে প্রথম মুখ খুলল মেজ বউ মণিদীপা, বড্ড বেশী বাড়াবাড়ি হল না? আর কারও মেয়ের বিয়েতে বোধহয় এর সিকি ভাগও হয়নি। দশজনের চাঁদায় হলে যা হয় আরকি।

ব্যস্ উস্কানিতে ন-বউ নীপা বলল, আমার তন্দ্রার জন্য অত ভাল পাত্রটা হাতছাড়া হয়েছিল শুধু ওদের দাবি মতো সামর্থ ছিল না তাই। সেজ বউ সানন্দা আর চুপ করে থাকতে পারল না। নিজের কষ্টকথা জানাল, আমার মৌ-র বিয়েতে বাধ্য হয়ে নিজের সব গয়নাগাটি দিয়েছি। কতটাকা লোন করতে হয়েছিল তা তো কাউকে বলিইনি। আসলে সবই কপাল। তা না হলে জন্ম দিল কে আর কন্যাদায় মুক্ত হল কারা! ছোট বউ সুনেত্রা দোহার টানল, খাঁটি কথা। আসলে একজন বাদে সকলেই যে সক্ষম। এখন মনে হচ্ছে, অক্ষম হলেই ভাল ছিল। তাহলে আর সারা জীবনের সঞ্চয় খুইয়ে মেয়ের বিয়েতে নিঃস্ব হয়ে দিন কাটাতে হত না।

শশীবিহীন বৈঠকে এরকম হাজার আক্ষেপ ক্ষোভ বাঁকা মন্তব্য পরে ফিসফিসানিতে পৌঁছে গেল। কিছু কিছু সোনা-শশীর কানেও পৌঁছাল। কিন্তু কোনও প্রতিক্রিয়া হল না। বরং দু'জনেই আনন্দ খুশিতে আত্মহারা। আগন্তুকরা যে যার ডেরায় ফিরে যেতে সোনা আত্মতৃপ্তির খোশমেজাজে অদ্ভুত এক আচরণ করে বসল। সংগৃহীত তহবিলের উদ্বৃত্ত থেকে শশীর জন্য একখানা বিছেহার গড়িয়ে দিল। বাকি অংশ থেকে মোটা অঙ্কের চাঁদার বিনিময়ে নিশ্চিন্তপুর তরুণদল পূজা কমিটির সভাপতির পদটি দখল করে বসল।

*ছবি ঃ শংকর বসাক*

# অন্তত একজন

সাত সকালে দোকান খুলতে এসে সাইন বোর্ডের দিকে নজর পড়তেই গোকুলচন্দ্র যেন আচমকা ধাক্কা খেলেন। হতবাক ছ'ফুট লম্বা টান টান চেহারার মানুষটা একটু খাটো হয়ে গেলেন। শরীরের সর্বত্র কাঁপন-ধরা চাপা উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল। ধাতস্থ হতে কয়েক মুহূর্ত সময় লাগল।

মনঃক্ষুণ্ণ গোকুলচন্দ্র বোবা গাল পাড়লেন, হ্যারে শালার বজ্জাতরা। গোটা জাতটার মুখেই তো এখন আলকাতরা। দিন কে দিন কত যে তলিয়ে যাচ্ছিস তা যদি বুঝতিস তো জাতটার এই বেহাল দশা হয় কখনও?

দোকান ঘরটা পাকা প্রশস্ত সড়কের ধারে। সাটার তুললে সুমুখের সিংহভাগ শ্বেতপাথর বসানো চৌকো উঁচু পাটাতন। তার ওপর কাচঘর। ভেতরে দাঁড়িপাল্লা এক খাবলা গাছ-গুঁড়ি আর মোটা কুশন। কাচঘরের পাশ দিয়ে ভেতরে ঢুকলে পেছন-দেয়াল ঘেঁষা ছোট চেয়ার টেবিল। টেবিলের ওপর কাঠের ক্যাশ বাক্স। চেয়ারে বসলে মাথার ওপর দেয়ালে টাঙানো মা কালীর বিরাট প্রাচীন তেলচিত্র। নিচে কুলুঙ্গিতে প্রদীপ ধূপদানি কাঁসার গেলাস রেকাবি। কমণ্ডলুতে গঙ্গাজল।

কালী-সাধক গোকুলচন্দ্র বিমর্ষ মনে যথারীতি আচমন করলেন। কমণ্ডলু থেকে গঙ্গাজল নিয়ে চারদিকে ছিঁটিয়ে দিলেন। তারপর চেয়ারের ওপর উঠে দাঁড়ালেন। সঙ্গে করে আনা ঠোঙা থেকে সন্দেশ ক'খানা রেকাবিতে রাখলেন। ফ্রেমে আঁটা মা কালীর তেলচিত্রে একশো আট জবা ফুলের মালা পরিয়ে দিলেন। প্রদীপ জ্বাললেন। ধূপধুনো দিলেন। সবশেষে কৃতাঞ্জলিপুটে আনত মাথা ছোঁয়ালেন। মুদিত চোখে মা কালী বন্দনা মন্ত্র জপ করলেন। মন্ত্রপাঠ অন্তে আজ অতিরিক্ত প্রার্থনা করলেন, অবোধ ওদেরকে সুমতি দাও মা। আমাকে দিও সহ্য করার শক্তি।

দোকানটায় এককালে শুধুমাত্র পাঁঠার মাংসই পাওয়া যেত। আজকাল পাঁঠার বড়ই আকাল। তাই একরকম বাধ্য হয়েই গোকুলচন্দ্র কেবলমাত্র চানা খাসির মাংস বিক্রি করেন। কিন্তু নলিকাটা জবাই করেন না। এখনও প্রাচীন বিধিমতে রামদা দিয়ে এক কোপে মাথা-বিচ্ছিন্ন করা বলি দিয়ে থাকেন। নামযশ ঐতিহ্যের খাতিরে দোকানের বিশাল সাইনবোর্ডটা এখনও অসংশোধিতই থেকে গেছে। বড় বড়

হরফে উজ্জ্বল ঘোষণা, 'বাঙালির পাঁঠার দোকান।'

তা গতকাল রাতের অন্ধকারে বাঙালির শুধু ওই 'র' অক্ষরটার ওপরেই ওরা গাঢ় কালো আলকাতরা মাখিয়ে দিয়ে গেছে।

ওরা কারা?

চেয়ারে বসে টেবিলে দাঁড় করানো দু'হাতের করতল-খাপে থুতনি বসিয়ে গোকুলচন্দ্র ভাবছিলেন, ওরা কারা? ওরা ষাট সত্তরের দশকে জন্ম নেয়া দিশেহারা উদ্‌ভ্রান্ত আহাম্মক বেআক্কেলে এক নতুন ধারা। ওদের বিবর্ণ ঠোঁটে বিতৃষ্ণা ভরা। কোটরগত চোখে রূঢ় রুক্ষ জিঘাংসা। রুখুসুখু লম্বা চুলে ঢাকা কান। ভাঙা ভাঙা চোয়াল। মানসিকতায় অগভীর। হালকা হাওয়ার মতো হৃদয়ানুভূতি। দুর্বল স্বাস্থ্যের অধিকারী। অনুকরণযোগ্য-আদর্শ ব্যক্তিত্ব থেকে বিশ হাত দূরে থাকতে অভ্যস্ত ওরা। গোকুলচন্দ্রর চিন্তার পরিধি বিস্তার লাভ করল। ভেবে অবাক হলেন, সময়কালের সঙ্গে উপদ্রবের চরিত্র ভাবগতিক কত দ্রুত নিম্নগামী হয়ে পড়ছে! ঐতিহ্যময় সংস্কৃতি ছেড়ে বাঙালিরা আত্মঘাতী কোন পথে পা বাড়িয়েছে?

প্রথম দিকে উৎপাতটা শুধুমাত্র পাড়ার ছেলেদের উদ্যোগে বারোয়ারী পূজা-উৎসবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। পরবর্তীকালে স্বাধীনতা দিবস আর পিকনিক এসে জুড়ে বসল। আর হালে বড় খেলা আর ভোটে জিতলেও মাগনা মাংস চাই-ই-চাই। তা আবার দু'এক কেজিতে তুষ্ট করা যায় না। আগে ছিল আব্দার। এখন তো দাবিও না। রীতিমতো হুকুম জুলুম ছিনতাই।

তা মাগনা মাংস দেওয়ার তো একটা সীমা আছে। যা আকাশ ছোঁয়া দরদাম এখন। সামান্য একশো গ্রাম মাংস নয়তো যেন নিজের দেহের এক খাবলা অংশ। সে জিনিস কি আর দরাজ হাতে দাতব্য করার মতো? তার চেয়ে টাকার অঙ্কে চাঁদা দেওয়া ঢের ভাল।

এবার মাংস চাওয়ার উপলক্ষটা ছিল নেহাতই নতুন। সরকার তরফে বাংলা বন্‌ধ ডাকা হয়েছিল। কোন রাজ্যে নাকি বেআইনি অগণতান্ত্রিকভাবে নির্বচিত সরকারকে বরখাস্ত করে রাষ্ট্রপতির শাসন জারি করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে বন্‌ধ ডাকা। আজকাল বন্‌ধ ডাকলেই ছুটির মেজাজে ষোলোআনা সফল। কিন্তু হেমু গোস্বামী লেনের অরাজনৈতিক ছেলেদের ছুটি কাটবে কেমন করে? তারা দত্ত লেনের ছেলেদের সঙ্গে প্রশস্ত পাকা সড়কে প্রদর্শনী ফুটবল খেলার আয়োজন করেছিল। লাউড স্পিকারে ধারা বিবরণীর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বিশিষ্ট অতিথি সভাপতি আমন্ত্রিত অতিথি—আরও অনেক গণ্যমান্যরা উপস্থিত থাকবেন। দু'দলের খেলোয়াড় সমর্থকরা তো আছেই। বেশ জমজমাটি অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা।

তো হেমু গোস্বামী লেনের নকুল নান্টু গজু বিটু গদাই ওরা ক'দিন আগে এসে দশ কেজি মাংস দাবি করে বসল।

এত মাংস! চমকে উঠে চোখ কপালে তুলে গোকুলচন্দ্র বললেন, একটা গোটা খাসি চাইছ দেখছি!

একরকম তাই। পালের গোদা গজু বলল, বন্‌ধের দিন আপনি তো আর ব্যালান্স মাংস বিক্রি করতে পারবেন না। একটা ছোটমোটো খাসিতে কত মাংস হয় আইডিয়া নেই। দশ কেজির কম বেশি যা হয় তাই দেবেন।

অসম্ভব। গোকুলচন্দ্র বিতর্কে না গিয়ে নতুন সিদ্ধান্তের কথা জানালেন, এবার থেকে কোনও ব্যাপারেই আর মাংস দেয়া যাবে না। বদলে একশো টাকা নগদ চাঁদা নিয়ে যাও।

ওরা মানবে কেন? শুরু হয়ে গেল টানাপোড়েন। ওরা পাঁচ কেজি পর্যন্ত নামলেও গোকুলচন্দ্র এককথার মানুষ। একশো টাকার গোঁ ধরে বসে রইলেন। ব্যস, ওরাও গোঁয়ার্তুমি করে ছোটবড় দু'চার কথা বলে খালি হাতেই চলে গিয়েছিল। বন্‌ধ-এর দিন প্রদর্শনী খেলাটা হয়েছিল বটে তবে তেমন জমজমাট হয়নি। ভোজটোজ বাতিল তো আনন্দফুর্তির বারো আনাই মাটি।

সেই থেকে হেমু গোস্বামী লেনের ছেলেদের সঙ্গে গোকুলচন্দ্রর বিরোধ তিক্ততার সূত্রপাত। আড়াল আবডাল থেকে বাঁকা কটু দু'চার কথা ছুঁড়ে দিলেও গোকুলচন্দ্রর মুখোমুখি হয়ে কোনও অসম্মান করেনি। চাপা রাগ ক্ষোভ গোঁসার ফলশ্রুতি, রাতের অন্ধকারে সাইনবোর্ডে আলকাতরা মাখানো ওই নষ্টামি।

গোকুলচন্দ্র নড়ে চড়ে বসে এই প্রথম টের পেলেন, কাচঘরের কর্মীটি যথাসময়ে এসে কাপড় বদলেছে। লুঙ্গি আর স্যাণ্ডো গেঞ্জি পরে কাচঘরে বসে আছে। হাতে চপার ছুরি। এদিকেই তাকিয়ে আছে। কী ভাবছে? কাচঘরের সামনে দাঁড়ানো খদ্দের দু'জনেই বা ফ্যাল ফ্যাল তাকিয়ে আছে কেন? ওরা কি সাইন বোর্ডটা দেখেছে? সড়কের ওপারের রেশন দোকানের লাইনে দাঁড়ানো ছোটবড় ছেলে আর মেয়েমদ্দরা এপারে সাইন বোর্ডটার দিকে তাকাচ্ছে কি? গোকুলচন্দ্র বুকের ভেতর তির তির প্রবাহ কাঁটা-যন্ত্রণা অনুভব করলেন। সাইনবোর্ডটা ট্রাম বাসযাত্রীদের নজর কাড়ছে কি? অথবা বাজারমুখী কারও কারও চোখে কৌতুক? ঠোঁটের কোণে মজা পাওয়া বাঁকা হাসি?

গোকুলচন্দ্রর মনে হল, সম্ভবত শরীরের গভীরতর কোথাও ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে। সেই ক্ষতস্থান থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে রক্ত ঝরছে। রক্তশূন্যতার ভয়ঙ্কর পরিণাম আশঙ্কা করে আঁতকে উঠলেন। লজ্জায় মুষড়ে পড়ায় আজ আর বলি দিতে মন

সরল না। প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকা খদ্দের দু'জনকে জানিয়ে দিলেন, আজ দোকান বন্ধ। কাচঘরের কর্মীটিকেও ছুটি দিয়ে দিলেন।

মুহূর্ত বিলম্ব না করে গোকুলচন্দ্র দোকানের সাটার বন্ধ করলেন। তালা লাগিয়ে চাবির গোছা ফতুয়ার পকেটে রাখলেন। তারপর এদিক সেদিক তাকালেন না। রণক্লান্ত পরাজিত সৈনিকের মতো বাড়ির দিকে পা বাড়ালেন।

গোকুলচন্দ্রর একমাত্র নাতি নোটনও এই সামাজিক জলবায়ুতে বেড়ে ওঠা রাগী দুরন্ত অশান্ত যুবকদের একজন হলেও অনেক কিছুতেই ব্যতিক্রম। পাড়া বেপাড়ায় আড্ডা-ফাড্ডা দেয় না। পার্টির ধারে কাছে যায় না। কলেজের ছাত্র হলেও তেমন কিছু পড়াশুনা নিয়ে ব্যস্ত থাকে না। খেলা আর গান-পাগল ছেলে। ক্রিকেট ফুটবল ভলি টেনিস—সব উল্লেখযোগ্য খেলাতেই মাঠে যায়। বাকি সময় ঘরে বসে টেপডেক চালায়। গুচ্ছের ক্যাসেট আর খেলার ম্যাগজিনই ওর প্রিয়সঙ্গী।

গোকুলচন্দ্রকে অসময়ে ঘরে ফিরতে দেখে নোটন নিজের ঘর ছেড়ে বের হল। শরীর ঠিক আছে কি না জানতে চাইল। নোটনের মেজাজ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল বলেই গোকুলচন্দ্র সংক্ষেপে উত্তর সারলেন, তেমন কিছু না। শরীর মোটামুটি ঠিকই আছে।

তাহলে? ঘাম জবজবে গোকুলচন্দ্রকে সোফায় বসিয়ে দিয়ে ফ্যান ছেড়ে দিল নোটন। ফতুয়া খুলে ফেলতে সাহায্য করল। বউমা অরুণা ততক্ষণে ঠাণ্ডা সরবত নিয়ে এসে হাজির। অরুণাও উদ্বেগ নিয়ে প্রশ্ন করল, দোকান ছেড়ে চলে এলেন অথচ বলছেন, কিচ্ছু না?

সত্যিই কিছু না। সরবত খেয়ে গেলাসটা ফেরৎ দিয়ে গোকুলচন্দ্র বললেন, তুমি তোমার কাজে যাও মা। নোটনার সঙ্গে কিছু জরুরি কথা আছে।

ঘটনার বিবরণ শুনে নোটন তড়াক করে লাফিয়ে উঠল। মেজাজ তুঙ্গে তুলে অভিযুক্ত করল, হেমু গোস্বামী লেনের ছেলেরা মাগনা মাংস চেয়ে হুজ্জুতি করে অথচ আজ পর্যন্ত আমি বা বাবা কেউ জানলাম না!

হুজ্জুতি কেন বলছিস? গোকুলচন্দ্র আগুনে জল ঢালতে চাইলেন, ওদের বাবা কাকা জ্যেঠারা আমাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধাভক্তি করেন। ওদের ঠাকুর্দারা আমার বন্ধু ছিলেন। ওদেরকে তো নাতির মতোই দেখি, ভালবাসি। ওরাও আজ পর্যন্ত অশ্রদ্ধা কিছু করছিল না। এবার যেন সব কেমন গোলমেলে হয়ে গেল। হতাশ গোকুলচন্দ্র বিষণ্ণ চোখে তাকালেন, কেন এমন হল বলতে পারিস?

পারি। ধপ করে পাশে বসে নোটন গম্ভীর জবাব দিল, দিয়ে দিয়ে তুমি ওদের নোলা বাড়িয়ে দিয়েছ। এখন আর খাই মেটাতে পারছ না তাই।

বোধহয় সেটাই ঠিক। গোকুলচন্দ্র অপরাধীর মতো মিন মিন করলেন, তোরা আজকালকার ছেলেরা কিছুতেই সন্তুষ্ট হোস না। ওরে, চাহিদার কি কোনও অন্ত আছে? বুঝবে এবার। ভালবাসায় যা পেয়ে আসছিল চিরজীবনের জন্য তা হারাল।

তাতেই থেমে থাকলে হবে না দাদু। নোটন চোয়াল শক্ত করে বলল, ওরা তোমাকে যে বেইজ্জতি করেছে তার উপযুক্ত জবাব দেব আমি।

এখনকার জবাব বলতে তো দেখা যায়, মারপিট রক্তারক্তি খুন খারাপি। যুক্তি তর্কের কোনও লড়াই থাকে না। জোর যার মুলুক তার। গোকুলচন্দ্র প্রমাদ গুনলেন। রক্তারক্তি হেস্তনেস্তর আশঙ্কায় নোটনকে বোঝালেন, অযথা মাথা গরম করিস না দাদুভাই। যারা সহ্য করতে জানে তারাই যথার্থ শক্তিধর।

তাই বলে অন্যায় জুলুমের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে মানা করছ তুমি? অবাক নোটন উসকে দিতে বলল, তুমি না অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপসহীন স্বাধীনতা সংগ্রামী।

বটেই তো। গোকুলচন্দ্র দু'হাতের শক্ত পেশীর জোরে নোটনের কাঁধে অল্প চাপ দিলেন। এক চিলতে নিরুত্তাপ হাসির দাওয়াই ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, লড়াই যুদ্ধ হয় সমপর্যায়ের যোদ্ধাদের মধ্যে। ওরা কারা? দোর্দণ্ডপ্রতাপ দুর্ধর্ষ ইংরেজ-বিরোধী জীবনপণ লড়াই ছিল আমার। বছরের পর বছর ঘরছাড়া রক্তাক্ত লড়াই করেছি। চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে বেড়ানো আমার মাথার দর উঠেছিল। করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গেতে সামিল হয়ে ধরা পড়ে গেলাম। এদিকে জেল খাটছি। আইন মোতাবেক বিচারও চলছে। বিচারের রায়ে ফাঁসির হুকুম অবধারিত বুঝতে পেরেও মুষড়ে পড়লাম না। ফন্দি এঁটে জেল থেকে পালালাম। তারপরেও চুপচাপ হাত পা গুটিয়ে বসে থাকিনি। আরও কত কী। তোর বাবা মা কিছু কিছু জানে। তুই তো জানতেও চাসনি কোনওদিন। এক মুঠো দীর্ঘশ্বাস উড়িয়ে গোকুলচন্দ্র বাস্তবে ফিরে এলেন, তাই তো বলছিলাম আমার উজ্জ্বল নামযশের কথা ভুলে গিয়ে ওদের বিরুদ্ধে লড়াই-এ নামা মানায় কখনও?

আমি তো আর তোমার মতো আশি বছর বয়সী রিনাউণ্ড পার্সন না। কিছুটা স্তিমিত হলেও নোটন নিজের জ্বালাটা জানাল, ওদের ওই নোংরামি ইতরামির জবাব না দিয়ে মুখ বুজে হজম করতে আমার প্রেস্টিজে লাগছে। তোমার অপমান কি আমাদের সকলের অপমান না?

অবশ্যই। গোকুলচন্দ্র খুশি হলেন। নোটনের পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললেন, অত্যাচারে ওরা তো আর ইংরেজদের চেয়ে বেশি কিছু না। ওদের বংশ-পরিচয় জানিস কিছু? এটা তো মানিস যে, তুই একজন স্বাধীনতা সংগ্রামীর নাতি। সেজন্যই ওদের সঙ্গে তোর লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়া মানায় না। অহিংস শান্তির পথে যুক্তিতর্কের

কোনও লড়াই চাস তো বল আমি তোকে বাধা দেব না।

গোকুলচন্দ্রর প্যাঁচকলে পড়ে নোটন বোবা বনে গেল। অনেক চেষ্টা করলেও তেমন কোনও যুতসই রণকৌশল মগজে এল না। কিছুক্ষণ নির্বাক থাকার পর সহজ সোজা শান্তির পথ বাতলালো, তুমি বরং দোকানটার দখল ছেড়ে দাও। দেড় দু'লাখ টাকা সেলামি পেয়ে যাবে। ব্যস, আর কোনও ঝুট ঝামেলাও থাকবে না।

বলিস কীরে! অবাক গোকুলচন্দ্র চোখ কপালে তুলে বললেন, অ্যা-ও-তো টাকা?

এত অবাক হওয়ার কি আছে? নোটন যুক্তি দেখাল, মেইন রোডের ওপর এতবড় স্পেসের দোকান। পেছনে ছোট খুপড়িঘরও আছে। এখানকার মার্কেটটা বেশ জাঁকালো হয়ে উঠছে। ফাঁকা জমিগুলিতে প্রোমোটারদের মাল্টি স্টোরেড বিল্ডিংস বাড়ছে। যা পজিশন। অফার দিলে তেলের ডিলার ছগনলাল আগরওয়াল এক্ষুণি লুফে নেবে। দেড় দু'লাখের ইয়ারলি সুদ কত ভেবে দেখ। দু'পা নাচিয়ে হেসে খেলে তোমার হাত খরচ চলে গিয়েও অনেক ব্যালান্স পড়ে থাকবে। কাজ কি তোমার বুড়ো বয়সের গতর খাটিয়ে?

তাহলে তো সেই অবাঙালি কালোয়ারদের কবলেই চলে গেল। প্রস্তাবটা মনে ধরলেও মনের সায় পেলেন না গোকুলচন্দ্র। মনের গোপন খেদ-কথা শোনালেন, গোটা শহরটাইতো এভাবে হাতছাড়া হতে বসেছে। এই শহরের পৈত্রিক ভিটেবাড়ি বেচে একের পর এক লোকজন শহর উপকণ্ঠের দিকে চলে যাচ্ছে। আমি তদ্দিন বেঁচে থাকব না, কিন্তু তুই দেখে নিস সেখান থেকেও একদিন পিছু হটতে হবে। তাড়া খেয়ে পিছু হটতে হটতে শেযমেশ কি ডায়মণ্ডহারবারের জলে ডুবে মরবে?

এসব কমিউনাল সেন্টিমেণ্ট ঠিক না দাদু।

বাঙালির আর একটা মোক্ষম দোষ। গোকুলচন্দ্র দোষটা ব্যাখ্যা করলেন, যে কোনও সম্প্রদায় নিজস্ব গোষ্ঠীর সংগঠন করলে আমরা অপরাধ দেখি না। বাঙালিরা গড়লে শুধু আমরাই সাম্প্রদায়িক বদনাম দিয়ে গেল গেল রব তুলি। সাধে কি আর কোনও একজন মহান ব্যক্তি বাঙালিকে 'আত্মবিস্মৃত' জাতি বলেছিলেন।

নোটন অস্বস্তি বোধ করছিল। গোকুলচন্দ্রকে বোঝাতে চেষ্টা করল, যে সরকারই ক্ষমতায় আসুক না কেন সকলেই ওদের ফেভারে। সময়ের সঙ্গে তাল রেখে চলতে হবে। একা তুমি গোটা জাতের জন্য ভেবে মূল-স্রোতের গতি ঠেকাবে কেমন করে?

ঠেকাতে পারব না ঠিকই। তাই বলে গা ভাসাতেও বাধে। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় কি সাম্প্রদায়িক ছিলেন? ওঁকে আমি কাছ থেকে দেখেছি। সব মানুষকেই

ভালবাসতেন। কিন্তু বাঙালিকে নিয়ে স্বপ্ন দেখতেন। এমন আর কেউ স্বপ্ন দেখতে জানে না এখন। উল্টে ওঁর স্বপ্নের গড়া জায়গাগুলি ভেঙে তছনছ করে দিচ্ছে। আমিও যদি এই মূলস্রোতে অন্যদের মতো গা ভাসাই তো ওরা বাঙালির 'র' অক্ষরটায় আলকাতরা লেপে কি আর এমন অপরাধ করেছে? তাহলে ওদের ওপর গোঁসা করে দোকানঘরটা হাতবদল করতে যাব কেন?

নোটন আর নিরর্থক তর্ক বাড়াতে চাইল না। হতাশ হয়ে নিরুচ্চার ভাবল, এতবড় আর্থিক সুযোগ হাতছাড়া করাটা পাঁঠামো তো বটেই।

রাত্রে নেপালচন্দ্র অন্যভাবে বোঝাতে চেষ্টা করলেন, নোটনের প্ররোচনার ফাঁদে তুমি ভুলেও পা বাড়িও না বাবা। ক'জন চ্যাংড়া ছোকরার বালখিল্য তামাশাকে এত গুরুত্ব দেয়া ঠিক হবে না। তুমি সেকালের নীতিনিষ্ঠ মানুষ। একালের সঙ্গে মানিয়ে চলতে একটু কষ্ট তো হবেই। সম্মানজনক একটা কিছু সমঝোতায় আসতে হবে। মদের দোকানদারীর অভিজ্ঞতায় দেখছি, সুরাক্ষেত্রে সকলেই একাত্ম। সেই সুবাদে সব পার্টির ইতর সুজনদের সঙ্গেই আমার গুড রিলেশন আছে। ছোটখাটো এই ব্যাপারটাতে আপস আলোচনায় মিটমাট আনা যাবে।

আশ্বাসমতো ক'দিন পর কোন এক বৃহস্পতিবার নেপালচন্দ্র বৈঠকের ব্যবস্থা করলেন। গোকুলচন্দ্র আগাম জানতেন না। বাজার করে ফিরে এসে টের পেলেন।

গোকুলচন্দ্র বাজারের থলে নামিয়ে রেখে শোওয়ার ঘরের উড়ন্ত পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখলেন, কারা যেন সোফায় বসে আছে। সংখ্যায় তিনজন। একজনই শুধু চেনা পরিচিত। বাপের দেয়া নাম দেবেন্দ্র সরকার। কিন্তু ওই নামে মহল্লায় কেউ চেনে না। ছোনা সরকার নামেই পরিচিত।

ছোনা এই অঞ্চলের বনেদি বাড়ির ছেলে। বাপ ঠাকুর্দার নাম করা সোনার গহনার ব্যবসাপত্তর ছিল। ওঁরা দানধ্যান কৃষ্টিতে যথেষ্ট যশস্বী ছিলেন। কিন্তু ছোনা অকালে অন্যমুখী হয়ে পড়ে। ছোট বয়স থেকেই অশান্ত। নির্ভীক নিঃশঙ্ক। মহল্লার যে কোনও লোকের বিপদ আপদে ওর ঝাঁপিয়ে পড়া অভ্যেস। সেই সুবাদে পরবর্তীকালে রাজনীতিতে জড়িয়ে বড় রকমের মাতব্বর হয়ে ওঠে। মানুষ জন্তুর হুঙ্কার পেশী শক্তির অধিকার আর মহাবিকারের কালা দিনগুলিতে কত রাতে ওদের বাড়িতে অতর্কিত হামলা হয়েছে। স্লোগান শোনা গেছে, ছোনা সরকারের মুণ্ডু চাই, মুণ্ডু চাই। ছোনা তবু বাপ ঠাকুর্দার ভিটে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যায়নি। রাতের পর রাত এ বাড়ি সে বাড়ির ছাদে ঘুমিয়েছে। নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে ছোনা আজ পাদপ্রদীপের আলোয় এসে দাঁড়িয়েছেন। এখন কর্পোরেশনের একজন কাউন্সিলর।

কিন্তু ছোনার দু'পাশে বসে আছে ওরা দু'জন কারা? পেটাই ইস্পাত শরীর হলে কী হবে, ব্রণ আর কাটাফাটা বদখত দাগে ভরা মুখ। খাটো-ছাট চুল। পরনে বেখাপ্পা রঙচঙে পোশাক। একজনের চোখে ভিলেন মার্কা রোদ-চশমা। অপরজনের গালে চাপ দাড়ি। এক চোখ ট্যারা। কুৎসিত চাহনি। গোকুলচন্দ্র দু'জনের কাউকেই চিনতে পারলেন না।

নেপালচন্দ্র অনুগত মোলায়েম সুরে ওদের তিন জনকে কীসব বোঝাচ্ছিলেন। সামনে রাখা ভারী জলখাবার আর চা। অমায়িক ছোনা প্রতিক্রিয়াহীন। চুপচাপ শুনছিলেন। বাকি দু'জন ভারিক্কি চালে মাথা নাড়লেও কোনও কথা বলছিল না।

গোকুলচন্দ্রর উপস্থিতিতে বৈঠক আলোচনা শুরু হল। প্রথম মুখ খুলল ছোনার ডান দিকের চাপ-দাড়ির জন, নেপুদার থেকে ফুল কেসটা শুনলাম দাদু। আপনি স্বাধীনতা সোনগ্রামী ও ওস্তাদ মানুষ। পাড়ার ইজ্জতওয়ালা মানুষের ওপরে কিনা হুজ্জোত! থানা পুলিশ টিকটিকি এম এল এ সব্বাই ছোনাদার পকেটে। দোক্ষিণ পাড়া ইলাকাটা বিলকুল আমাদের কব্জায় আছে। মাঙ্‌সোতো ছোঃ, একটা কড়িও ঠ্যাকাবেন না শ্লাদের।

ভারী জলখাবারে নেপালচন্দ্র চপ কাটলেট দিয়েছিলেন। ছোনার বাঁ দিকের রোদ-চশমার জন দেশলাই কাঠি দিয়ে দাঁত খোঁচাচ্ছিল। বুক পকেটে হাত রাখলেও ছোনার ইঙ্গিতে সিগারেটের প্যাকেটটা বের করল না। দাঁত খোঁচানো কাঠিটা ফস্ করে জ্বেলে ফেলল। অ্যাসট্রেতে ফেলে ভরসার বাণী শোনাল, কাল থেকে নিভভয়ে বুক চিতিয়ে দোকান খোলা স্টার্ট করুন। একদম ঘাবড়াবেন না। এই কানা ঘেঁচু আর ট্যারা টোকার জিম্মায় রইলেন আপনি। অল টাইম পোটেকশান দেব। শুধু টাইমলি বিল্লুর চায়ের দোকানের ঠেকে একবারটি খবর পাঠাবেন, ব্যস্। শ্লার চামচিকারা এট্টু ট্যা ফোঁ করেচে কি ছাল ছাড়িয়ে নেব। বেশি খামচা খামচি করতে গেলে সিধা মায়ের গভ্ভে সেঁধিয়ে দেব।

গোকুলচন্দ্রর গা ঘিন ঘিন করে উঠল। বৈঠকে বসে থাকতে অসহ্য লাগছিল। ঘাবড়ানো আর প্রোটেকশন শব্দ দু'টো যেন বিষকাঁটা মনে হল। শরীরময় তীব্র জ্বালা অনুভব করলেন। হঠাৎই উত্তেজিত হয়ে ধমকে উঠলেন, কাকে কী কথা শোনাচ্ছ তোমরা। তেরো জন দুর্ধর্ষ ইংরেজ মেরেছি আমি। এখনও মাসে ক'টা বলি দিই তা জানো? এই বয়সেও এতটুকু হাত কাঁপে না আমার। একালের বীরপুরুষদের ঢের ঢের জানা আছে। ওদের যত মস্তানি ওস্তাদি সব নিরস্ত্র দুর্বলদের ওপর। তাও কিনা পার্টি-দাদা আর থানা পুলিশের ছাতার তলায় থেকে দলবেঁধে বোমা পটকা অস্ত্র নিয়ে। নয়তো অন্ধকারের আড়াল থেকে কাপুরুষের মতো চোরা গোপ্তা খুন খারাপি

পালোয়ানি। তবু বুঝতাম, যদি কখনও অত্যাচারী ধনী ভেজালদার ব্যবসায়ী আর নারীর ইজ্জত লুঠকারীদের বিরুদ্ধে কাউকে চড়াও হতে দেখতাম। হবে কী! আজকাল সব পালোয়ান আর সমাজসেবীরাই তো ওদের হাতের মুঠোর লোক। পুলিশি ব্যবস্থা এখন একটা প্রহসন মাত্র।.....

গোকুলচন্দ্র যেন আর থামতে জানেন না। বলেই চলেছেন। ওঁর উচিত কথার তোড়ে ঘেঁচু টোকা হতভম্ভ। সিঁদুরে মেঘ দেখলেন নেপালচন্দ্র। কিন্তু, রাজনৈতিক অভিজ্ঞতায় পরিপক্ক ছোনা ধীর শান্ত প্রতিক্রিয়াশূন্য।

গোকুলচন্দ্রর লাগামছুট শ্লেষ বিদ্রূপ মেশানো নির্বিচার আক্রমণ চলছে তো চলছেই। দরাজ গলার আওয়াজে ঘর গম-গম করছিল। ঘরের অন্য কারও মুখে টু শব্দটি নেই। কিন্তু একা ছোনা ছাড়া অস্বস্তিতে ছটফট করছিল বাকি সকলেই।

কিছুক্ষণ পর অস্বস্তিকর পরিস্থিতি সামাল দিতে ছোনা উৎসাহী হলেন। গোকুলচন্দ্রকে থামিয়ে দিতে এক চিলতে হাসি মুখে বললেন, প্লিজ আপনি আগে শান্ত হোন। এই বয়সে এত উত্তেজিত হয়ে পড়া ঠিক হচ্ছে না। ব্লাড প্রেসার বাড়তে পারে। তাতে আপনারই ক্ষতি হবে।

ছোনার কথায় কাজ হল। গোকুলচন্দ্র লাগাতার বিষ-ঝরানো বন্ধ করলেন। ছোনা এবার বললেন, আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপারে অযথা আমাদের নাক গলানোটা সম্ভবত আপনার পছন্দ হয়নি। কিন্তু আমাদের অপরাধটা কোথায় দেখছেন? আমরা তো আর এমনিতে গায়ে পড়ে সমস্যা মেটাতে আসিনি। নেপু ডেকে এনেছে। তো ডেকে এনে নিজের ঘরে পেয়ে এভাবে অপমানিত করার অর্থ কী? তার চেয়ে সোজা কথায় আমাদেরকে চলে যেতে বললেই তো পারতেন।

গোকুলচন্দ্র নিজের ভুল বুঝতে পারলেন। ছোনা চলে যাবেন বলে উঠে দাঁড়াতে হাত ধরে নিরস্ত করলেন। উত্তেজনা আয়ত্তাধীনে এনে সুর নরম করলেন, এই বুড়োর বেফাঁস কথায় রাগ করো না ছোনা। তোমার বাবা ছিলেন আমার বন্ধুলোক। তুমি তো এ বাড়ির ছেলের মতো। নেপু তো আমার শোবার ঘরেই এনে বসিয়েছে। কোনওরকম অনাদর অযত্ন করেনি। কিন্তু আমার প্রশ্ন হল, এ তুমি কাদেরকে সঙ্গে নিয়ে এসেছ? দু'জনে কি ভাষায় কি ঢঙে একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলছিল তুমি নিজেও শুনেছ তো।

মুখ সামলে বাত বলবেন দাদু। ঘেঁচু তড়াক করে লাফিয়ে উঠে ফোঁস করল, ঘরে পেয়ে এভাবে পেস্টিস ফাটাবেন না বলে দিচ্ছি। রেজাল্ট বহুত খারাপ হবে।

আস্পর্ধা তো তোমার কম না ছোকরা। আগুনে ঘি পড়ার শিখার মতো গোকুলচন্দ্র দপ করে জ্বলে উঠলেন। ঘেঁচুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পাল্টা মেজাজ দেখালেন, আমার

ঘরে বসে আমাকেই চোখ রাঙিয়ে ভয় দেখাচ্ছ তুমি? সব কিছুর একটা সীমা আছে।

আমরা এরকমই। ঘেঁচুর সমর্থনে টোকা উঠে দাঁড়াল। মেজাজ তুঙ্গে তুলে তড়পাল, আপনার চে ঢের ঢের আচ্ছা আচ্ছা ভদ্দোর লোক আমাদের আঙুলের ইশারায় ওঠবস করে। চেনেন না জানেন না তাই তখন থেকে একতরফা উল্টাপাল্টা ফালতু লেকচার ঝেড়ে যাচ্ছেন। নেহাত ছোনাদা সঙ্গে আছে তাই। নৈলে—

নৈলে কী? গোকুলচন্দ্র বুক টান করে নিঃশঙ্ক জিগ্যেস করলেন।

পোথম খেপেই টের পাইয়ে দিতুম আমরা কারা।

ছোনা মনে মনে ভাবলেন, আপাতত এইটুকুই যথেষ্ট কাজ দেবে। তাই ওদের দু'জনকে লাগাম টেনে ধরে শান্ত সংযত করলেন। ওরা দু'জনেই ফের বসে পড়ল।

ছোনার টনিকে গোকুলচন্দ্র গুটিয়ে গেলেন না। বরং পাল্টা আক্রমণ করলেন, আমার এই বয়সে আর তোমাদেরকে চেনাজানার দরকার হবে না। মনে রাখবে, এটা কোনও রক বাজার বা চায়ের দোকান না। পরিচয় তোমাদের যা কিছু হোক না কেন, আমার শোবার ঘরে বসে চোখ রাঙাবে হুমকি দেবে তা কখনও বরদাস্ত করব না। আমিও নেহাত ফালতু কেউ না।

পাল্টা হুমকি শুনে ঘেঁচু টোকা একসঙ্গে লাফিয়ে উঠতে যাচ্ছিল, ছোনা ইশারায় নিস্তেজ করলেন। নিজেকে যথেষ্ট সংযত রেখে গোকুলচন্দ্রর দিকে তির্যক দৃষ্টি ফেললেন। ভুরু কুঁচকে দৃঢ়তা দেখালেন, আপনি ঠিক কী বলতে চাইছেন তা বুঝলাম না। দয়া করে যদি খুলে বলেন।

ওরা যে আমার ঘরে ঢুকে শান্তিভঙ্গের অপরাধ করছে, আইনত তার শাস্তি কি তা জানো?

ওদেরকে তোয়াজ করে ডেকে এনেছেন নেপালচন্দ্র। এতক্ষণ ভয় সংকোচে অসহায় নির্বাক জবুথবু বসেছিলেন। গোকুলচন্দ্রর ইঙ্গিতটা ধরতে পেরে ছোনা রীতিমতো অসন্তুষ্ট হলেন। নেপালচন্দ্রর দিকে তাকিয়ে রাগ ক্ষোভ বিরক্তি প্রকাশ করলেন। আর এক মুহূর্ত এই ঘরে বসে থাকা সমীচীন মনে করলেন না। আইনের জালে জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কায় ঝটিতি দুই সাগরেদকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। নেপালচন্দ্রও ওদেরকে অনুসরণ করলেন।

নেপালচন্দ্রর চোখ মুখে লজ্জা ভয় আতঙ্ক। বাড়ির সুমুখ রাস্তায় ওদের পেছনে অপরাধীর মতো ম্লান বিষণ্ণ করুণ। ছোনা দাঁড়িয়ে পড়লেন। ওঁর অসহায় অবস্থার দিকে তাকিয়ে রূঢ় হলেন না। তরল তিরস্কার করলেন, ঘটনাটা কী ঘটল নেপু? তুমি তো ভাল করেই জানো ঘেঁচু আর টোকা আমার পান্না হীরা স্টোন। ওদেরকে

ধারণ করেছি বলেই না অনেক বড় বড় বিপদ থেকে রক্ষা পেয়ে যাচ্ছি। তোমার মদের কারবারে ওরা দু'টিতে ব্ল্যাক ক্যাটের কাজ করছে বলেই তো নিশ্চিন্তে ব্যবসাটা চালিয়ে যেতে পারছ। তোমার পেছনে আমি আর ওরা আছি বলেই না আজ পর্যন্ত সরকারি বেসরকারি কোনও দিক থেকেই তোমার কারবারে কোনওরকম হুজ্জোতি হয়নি। তোমার গায়ে এতটুকু আঁচড় লাগেনি। বলতে পার আমারও স্বার্থ আছে। সেটা আছে বলেই মুখটি বুজে সহ্য করে গেলাম। কিন্তু তোমার স্বার্থটাও দেখবে তো। জানি, বাবার প্রতি তোমার দারুণ শ্রদ্ধা, ভক্তি, আনুগত্য। আমাদের সামনে কিছু বলা মুশকিল ছিল। আমরা চলে যাওয়ার পর অন্তত নিজের স্বার্থে বাবাকে বুঝিও, ওঁর ওরকম আচরণ উচিত হয়নি।

এই পর্যন্ত পরিস্থিতিটা তবু মোটামুটি আয়ত্তের মধ্যে ছিল। ঘোরালো ঘোলাটে করে তুলল ঘেঁচু। ছোনার মুখ থেকে নিজেদের প্রশস্তি দরদাম গুরুত্ব শুনতে শুনতে গ্যাস বেলুনের মতো ফেঁপে উঠেছিল। ওজন ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল। খাঁচা-ছুট বাঘের মতো গর্জন করে উঠল, ঘর থেকে বেইজ্জত করে আজ কাদেরকে ভাগালেন তা ভেবে দেখবেন দাদু, নৈলে পরে টের পাবেন। বিপদে পড়লে এই ঘেঁচু আর টোকা তখন ভরসা। আমাদের পায়ে এসে পড়তে হবে তখন।

ওরা বেরিয়ে আসার পর গোকুলচন্দ্র উত্তেজনায় ঘরের ভেতর অশান্ত পায়চারী করছিলেন। ঘেঁচুর ছুঁড়ে দেয়া কথাগুলো কানে গেল। একজন সমাজবিরোধীর এত দর্প! গোকুলচন্দ্র অপমানিত হলেন। লজ্জা ঘেন্নায় সারা শরীর রি রি করে উঠল, ছিঃ ছিঃ পাড়া প্রতিবেশীরা কী ভাবল! আর কি মাথা উঁচু করে মুখ দেখানো যাবে? ভাবতে গিয়ে গোকুলচন্দ্র অসুস্থ বোধ করলেন। যত রাগ ক্ষোভ গিয়ে পড়ল নেপালচন্দ্রর ওপর।

নেপালচন্দ্র মুখোমুখি হতেই গোকুলচন্দ্র ফুঁসে উঠলেন, ছিঃ ছিঃ নেপু। ওই নচ্ছার অমানুষগুলোর সঙ্গে ভাল সম্পর্কের বড়াই করিস তুই। তোর জন্যই আজ আমাকে এভাবে অপদস্থ হতে হল। বার বার তোকে মানা করেছিলাম, মদের কারবারে যাস না নেপু। শুনলি না। আরে শুধু কি অঢেল টাকা কামালেই হল? মান সম্ভ্রমের দিকটা দেখতে হবে না?

নেপালচন্দ্র কাকে কী বোঝাবেন? নিজের বাবাকে ভাল করেই জানেন? অন্যায়ের সঙ্গে আপসহীন জেদি মানুষ। আদর্শবান নীতিনিষ্ঠ চরিত্রবান তিনি। সব দিক থেকেই নেপালচন্দ্র বাবার চেয়ে বিস্তর খাটো। শুধুমাত্র জন্মদাতা বলেই না, এক অসাধারণ ব্যক্তিত্বের বিরুদ্ধে মুখ খোলার মতো দুঃসাহস আজ অবধি হয়নি। বিপাকে পড়ে নেপালচন্দ্র মিন মিন করে বললেন, অর্থ-অভাব নেই বলে আমিও তো কত বলেছি,

তোমার যথেষ্ট বয়স হয়েছে। এবার ওই কসাইগিরি ছাড়ো। ছাড়লে তুমি?

ওসব কারণ কেন দেখাস? আসলে এই ব্যবসাটা তোর অপছন্দ। তুই চাস না বলেই ছেড়ে দেব? আরে আমি তো আর জাতে কসাই না। নিজে মাংসও খাই না। বিধিমতো বলি দেই মাত্র। কসাই তো এখন চারদিকে গিজ গিজ করছে। কেউ কেউ আবার গুপ্তঘাতক। মানুষ হয়ে মানুষের হাড় রক্ত মাংসও খাচ্ছে অনেকে।

তুমি বাবা দোষ নিও না। নেপালচন্দ্র সমীহ করে বললেন, তোমার কথাতেই ধরা পড়ছে, দিনকাল দারুণ বদলে গেছে। এককালে সৎ নীতিনিষ্ঠদের সংখ্যাই বেশি ছিল। এখন তার উল্টো। বাঁচতে গেলে অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনেক কিছু মেনে নেয়া ছাড়া উপায় নেই। তুমি বাস করবে একালে আর চিন্তা-ভাবনা মানসিকতা নিয়ে থাকবে পঞ্চাশ বছর আগেকার কালের, তা চলে না। আমাকে যে কম্পিটিশন করে পেটের ব্যবস্থা করতে হয় সেটা বুঝতে চাইছ না কেন?

গোকুলচন্দ্র কোনও জবাব দেয়ার আগেই নোটন এসে ঘরে ঢুকল। সকালের ঘটনাটা পাঁচকানে রিলে হয়ে নোটনের কানে ভাসা ভাসা পৌঁছতেই ছুটে বাড়ি এসেছে। চোখমুখ উত্তেজনা উদ্বেগভরা। দেখতে ভয়ঙ্কর লাগছিল।

বিস্তারিত শোনার পর নোটন নেপালচন্দ্রর সঙ্গে সহমত হল। গোকুলচন্দ্রর দোষ ধরে বলল, দাদু তুমি বেশি বাড়াবাড়ি করে ফেলেছ। সব সময় বড্ড বেশি উচিত কথা বলে খামোকা সমস্যা বাড়াও। এখানেও তুচ্ছ ব্যাপারটাকে জটিল করে তুলেছ। এত উচিত কথা শোনানোর কোনও দরকার ছিল না। বাবা আর আমার দিকটাও চিন্তা করা উচিত ছিল।

অন্য সময় হলে ছোট মুখে উচিত অনুচিতের কথা শুনে গোকুলচন্দ্র তেলেবেগুনে জ্বলে উঠতেন। দাবড়ি দিয়ে ফের দু'দশ উচিত কথা শুনিয়ে ছাড়তেন। কিন্তু গৃহ অশান্তি এড়াতে চেয়ে কোনও জবাব দিলেন না। বিতর্কে জড়াতে চাইলেন না। মুখ বুজে বাপবেটার যুগ্ম আক্রমণ হজম করে গেলেন।

এমনিতে গোকুলচন্দ্র অবশ্য থানায় যেতেন না। কিন্তু ছেলে আর নাতির দিকটা ভাবতে গিয়ে অজানা আশঙ্কা হল। সারা দুপুর দুচোখের পাতা এক করেও ঘুমোতে পারলেন না। দুশ্চিন্তায় ছটফটালেন। বিকেলে সকলের অগোচরে থানায় গেলেন।

ও সি ডায়েরি নিতে চাইলেন না। শুভাকাঙ্ক্ষীর মতো বোঝালেন, দিনকাল খারাপ তা তো বুঝতেই পারছেন। ওদের পেছনে পলিটিক্যাল পাওয়ার আছে। আপনার হয়ে কে বলবে? শুনে যতদূর বুঝেছি তাতে ছেলে নাতিও মনে হয় না আপনাকে মদত দেবে। একা আপনি কতদূর লড়াই করতে পারবেন? তার চেয়ে ওদেরকে না ঘাঁটিয়ে মিউচাল করে নিন।

ওরা এসেছিল বুঝি? গোকুলচন্দ্র অবাক হলেন।

এসেছিল বৈকী। সিগারেটের ধোঁয়া উড়িয়ে ও সি বললেন, তৎক্ষুণি এসেছিল। আপনার মতো ভাবতে এত সময় নেয়নি। ছোনা সরকার রাজনীতি করা চতুর লোক। আগাম ঠিক আঁচ করেছিলেন যে আপনার মতো একজন একরোখা লোক থানার সাহায্য চাইতে পারেন। তাই আগেভাগে এসে আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ ডায়েরি করে সেই পথটা মেরে দিতে চেয়েছিলেন।

আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ? ডায়েরি? বলেন কি!

আমি অবশ্য ডায়েরি নেইনি। ও সি ফের ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, ছোনাবাবুকেও বুঝিয়ে সুজিয়ে আপসে মিটিয়ে নিতে বলে ফেরৎ পাঠিয়ে দিয়েছি।

গোকুলচন্দ্রর বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিল। কপালে ভাঁজ পড়ল। আজকাল এরকম তো সচরাচর দেখা যায় না। থানা পুলিশ তো পলিটিক্যাল মাতব্বরদের তাঁবেদারি করে মাত্র। এটাও ও সি-র কোনও ছলচাতুরি নয়তো?

মানুষ চরিয়ে চাকরি করায় অভিজ্ঞ ও সি গোকুলচন্দ্রর চোখ মুখ দেখেই বুঝতে পারলেন যে, ওঁর সত্যি কথাটা আদৌ বিশ্বাসযোগ্য হয়নি। চেয়ারে হেলান দিয়ে দোল খেতে খেতে বললেন, আমি এটা করলাম কেন ভাবছেন তো?

গোকুলচন্দ্র হ্যাঁ বা না কোনও জবাব দিলেন না। শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। ও সি চেয়ার-দোল থামালেন। সিগারেটের টুকরোটা ছাইদানিতে গুঁজে বললেন, কেন জানেন? বিকজ ইউ আর নোন টু মি। আমি আপনার পাস্ট লাইফ জানি। আই রেসপেক্ট ইউ।

কী করে জানলেন? গোকুলচন্দ্র সহজ হয়ে নড়ে চড়ে বসলেন। কৌতূহলি হয়ে উঠলেন, আপনাদের তো বদলির চাকরি। এ থানায় যেদিনই এসে থাকেন না কেন এর আগে কোনও দিনই আমার থানা পুলিশ কোর্ট কাছারির দরকার হয়নি।

তবু কেমন করে জানলাম? ওসি দুর্লভ হাসি ছড়িয়ে বললেন, নেপালবাবুর সঙ্গে আমার রিলেশনটা খুবই ফ্রেণ্ডলি। ওঁর কাছ থেকে শুনে শুনে আপনার লাইফ হিস্ট্রি আমার প্রায় মুখস্ত হয়ে গেছে। সত্যিই আপনারা ভাগ্য করে একটা সুসময়ে জন্মেছিলেন। সে সময় নিজের দক্ষতা যোগ্যতা দেখানোর সুযোগ ছিল। কোয়ালিটি কোয়ালিফিকেশনের কদর ছিল। আর এখন? বুক উজাড় করা একমুঠো দীর্ঘশ্বাস ছড়িয়ে ও সি বললেন, ওসবের কোনও স্বীকৃতিই নেই।

গোকুলচন্দ্রর শুনতে ভাল লাগছিল। অবাক হয়ে ও সি-র দিকে তাকিয়ে থেকে অনুমান করলেন, দেশ স্বাধীন হওয়ার দু'এক বছর আগে জন্মেছেন হয়তো। সুতরাং অনেক বিশ্বাস ছিল। চাকরিতে ঢুকে অনেক স্বপ্ন দেখেছিলেন। বিশ্বাস স্বপ্ন দু'টোতেই

আঘাতের টোল পড়েছে। মেরুদণ্ডটা এখনও শক্ত আছে। বোধহয় আর বেশিদিন থাকবে না। বাত বেদনা শুরু হল বলে।

ও সি ফের একটা সিগারেট ধরালেন। দু'কাপ চা এল। নিজে এক কাপ চা নিয়ে অপর কাপটা গোকুলচন্দ্রর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, নিন খান।

আবার চা কেন? গোকুলচন্দ্র ও সি-র ব্যবহারে অবাক হলেন।

খান না। ও সি কী ভেবে সিগারেটটা ছাইদানিতে রেখে দিলেন। যথেষ্ট আন্তরিক হওয়ার চেষ্টা করলেন, আসলে রাতদিন চোর বাটপাড় হাজার রকমের ক্রিমিনালদের নিয়ে কাটাতে হয়তো তাই আপনার মতো একজনকে এত কাছে পেয়ে ভাল লাগছে। দূষিত আবহাওয়ার মধ্যে একটু ফ্রেশ এয়ার পেয়ে রিল্যাক্স ফিল করছি। আমাদের ট্রাজিডিটা কোথায় জানেন? ছোটবেলায় এক ধরনের খেলা খেলতাম। চার টুকরো ছোট্ট কাগজে চোর ডাকাত পুলিশ দারোগা লেখা হত। তারপর হোমিওপ্যাথ পুরিয়ার মতো টুকরো চারটে ভাঁজ করা হত। দু'হাতের খোলের মধ্যে নাড়িয়ে সেগুলোর দান ফেলা হত। চারজন চারটে পুরিয়া খুলে দেখত। যার ভাগ্যে দারোগা উঠত সে মেজাজি হাঁক ছাড়ত, কৌন হ্যায় পুলিশ? যার ভাগ্যে পুলিশ উঠত সেও বুক ফুলিয়ে বলত, হ্যাম হ্যায়। চোর বা ডাকাত কোনও একজনকে পাকড়াও করে আনার নির্দেশ দিত দারোগা। যথা আজ্ঞা ঠিক ঠিক আসামি ধরতে পারলে দারোগা পুলিশের পুরস্কার মিলত একশো আর আশি।

এ খেলা তো আমরাও খেলতাম। চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে গোকুলচন্দ্র বললেন।

আপনাদের খেলাটা ছিল যথার্থ। বাস্তবে ওরকমই ঘটে থাকত। এখনকার ছেলেদেরকে আর ওই খেলা খেলতে দেখি না। কারণ, ওরাও জেনে গেছে বাস্তবটা অন্যরকম। এটাই আমাদের চাকরির ট্র্যাজিক দিক।

গোকুলচন্দ্র আর মন্তব্য জুড়লেন না। বাস্তবে ফিরে আসতে চাইলেন। যে সমস্যা নিয়ে থানায় এসেছিলেন সেই প্রসঙ্গে ফিরে গেলেন, আমাকে এবার ফিরতে হবে যে। তার আগে বোধহয় জেনে যাওয়া দরকার যে, ছোনা সরকার আমার বিরুদ্ধে কী অভিযোগ নিয়ে ডায়েরি করতে এসেছিলেন।

সেসব শুনে কী লাভ? ও সি এড়িয়ে যেতে চাইলেন।

আপনি মিউচুয়ালের পরামর্শ দিলেন যে। গোকুলচন্দ্র কথার প্যাঁচ কষলেন, নিজের দোষত্রুটিগুলি না জানলে সংশোধন হবে কেমন করে?

অভিযোগ কি আর একটা? সবচেয়ে মারাত্মকটা হল, আপনি নাকি খাসির সঙ্গে কুকুর ছাগলের মাংসও ভেজাল দেন। পাব্লিকের কমপ্লেন পেয়ে ওরা আপনার সঙ্গে

আলোচনায় বসতে গিয়েছিলেন। আপনি অকথ্য গালিগালাজ করেছেন। গলা ধাক্কা দিয়ে ঘর থেকে বের করে দিয়েছেন।

ডাহা মিথ্যা কথা। বিশ্বাস করুন আমি—

আমি জানি। ও সি থামিয়ে দিয়ে বললেন, ছোনাবাবু তো এমন মনগড়া অভিযোগও করলেন যে, এককালে আপনি গোপনে নকশালদের মদত করতেন। সেই সময় সুদের কারবারী ওমপ্রকাশ ঝুনঝুনওয়ালা আর পুলিশ পার্সন জিয়াউদ্দিনের মার্ডার কেসে আপনার হাত ছিল। এখন আনন্দমার্গীদের সমর্থক আপনি। সাম্প্রদায়িক উস্কানিও দিয়ে থাকেন। আরও কত কী যে আলতু ফালতু অভিযোগ!

গোকুলচন্দ্র কিছুক্ষণ নির্বাক উদাস বসে রইলেন। তারপর ধাতস্থ হয়ে বললেন, সাম্প্রদায়িক কে নয় বলুন তো? যে কোনও ভিত্তিতে মানব জাতিকে বিভাজন মাত্রই সাম্প্রদায়িকতা। দেশ স্বাধীন হওয়ার এত বছর পরও ভারতবর্ষের আপামর মানুষ মিলে একটা জাতি হয়ে উঠতে পারল না। এখনও দেশ জুড়ে জাতপাতের ভিত্তিতে ভোট হয়। এই যে বিভিন্ন পার্টির লোক বলে পরিচিতিতে বিচ্ছিন্নতা হানাহানি খুন হিংসা—এসব কি বিভেদ সাম্প্রদায়িকতার পর্যায় পড়ে না?

অতশত গভীর তত্ত্বকথায় লাভ কি আমার? ও সি হাই তুলে চেয়ারে গা এলিয়ে দিলেন। কাজের কথায় মোড় ঘোরাতে চাইলেন, আপনিও মঙ্গল চান তো অযথা জটিল তত্ত্ব নিয়ে মাথা ঘামাতে যাবেন না। আজকের দিনে নীতির লড়াই বিরোধে যাওয়া মানেই আত্মঘাতের পথ বেছে নেয়া। তার চেয়ে একটু নরম হয়ে গোঁড়ামি থেকে কিছুটা সরে আসুন। কম্প্রোমাইস করে বাকি জীবনটা সেফলি কাটিয়ে দিন।

খামোকা বিরোধ ঝুট ঝামেলা আমিও চাই না। গোকুলচন্দ্র মেরুদণ্ড সটান করে সাফ কথা শোনালেন, কিন্তু কীসের কম্প্রোমাইস! জ্ঞানত আমি কোনও অন্যায় করিনি। সুতরাং মাথা নুইয়ে সারেণ্ডার কম্প্রোমাইসের প্রশ্নও আসে না। আমার দ্বারা তা আদৌ সম্ভব না।

আপনার এই অবুঝ গোয়ার্তুমির রেজাল্ট কি হতে পারে তা জানেন? ও সি চোয়াল শক্ত করে চোখ কটমটিয়ে তাকালেন।

কাপুরুষদের দ্বারা খুন হতে পারি আমি। তার বেশি কিছুতো নয়? ইতিহাসে এরকম ভুরি ভুরি নজির পাওয়া যাবে।

মৃত্যুকে আপনি পরোয়া করেন না তা আমি জানি। যিনি মরেন তাঁর তো কিছু হয় না। আমি বলছি অন্য কথা। এরপর হয়তো নেপুবাবুর নামে কাস্টমস এক্সাইজ এনফোর্সমেণ্ট ডিপার্টমেণ্টে উড়ো চিঠি পড়বে। আপনার বিরুদ্ধে অ্যান্টিকোরাপশন

হেল্‌থ আই বি ইত্যাদিতে কমপ্লেন হবে। দোকানের সামনে পোস্টারিং, পিকেটিং চলবে। আপনার নাতি নোটনকেও উগ্রপন্থী দলের একজন বলে যেকোনও অন্তর্ঘাত কেসে জড়িয়ে ফেলতে পারে। তখন আপনাদের পারিবারিক অবস্থাটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা একবার ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখুন তো।

এতরকম দৃষ্টান্ত দেখিয়ে গোকুলচন্দ্রকে কাহিল করার চেষ্টা হলেও তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না। বরং নিজেদের নিষ্কলুষতায় যথেষ্ট আস্থাশীল বলে বুকের পাটা দেখিয়ে বললেন, ব্যস তাতেই বাপ নাতি সকলে মিলে অপরাধী সাব্যস্ত হয়ে যাব? এতই সহজ?

সে তো প্রমাণসাপেক্ষ অনেক পরের কথা। কিন্তু আননেসেসারি হ্যারাসমেণ্ট? সেটা তো এড়াতে পারবেন না। পার্টি-পাওয়ারের চাপে পড়ে আমরাও তখন আর হাত পা গুটিয়ে ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে থাকতে পারব না। আনপ্লেজেণ্ট অ্যাকশন নিতেই হবে।

বলেন কি? সব কিছু জেনেশুনেও অন্যায়ের পক্ষ নেবেন?

কী আর করা যাবে। ও সি চাকরিগত অসহায়ত্ব ব্যক্ত করলেন, ছাত্রজীবনের আন্দোলনে আমারও বজ্রমুষ্ঠি ছিল। মিটিং মিছিলে স্লোগান দিতাম, অন্যায়ের সঙ্গে কোনও আপস নয়। কিন্তু এখন অন্যায়ের সঙ্গে আপস করে চাকরি বজায় রাখতে হচ্ছে। পেটের ধান্দায় না মানিয়ে নিয়ে উপায় কী। আপনাকেও অনুরোধ, স্বাধীনতা সংগ্রামীর সেন্টিমেন্টটা সিকেয় তুলে রেখে মূলস্রোতে মিশে যান। ছোনা নেপুবাবুর সঙ্গে আমার যে পিসফুল রিলেশন রয়েছে সেটা অটুট রাখতে দিন।

গোকুলচন্দ্র বুঝতে পারলেন, নালিশ জানাতে তিনি ভুল জায়গায় এসে পড়েছেন। তাই অযথা আর সময় নষ্ট করলেন না। থানা ছেড়ে পথে নামলেন।

চলার যেন আর কোনও শেষ নেই। গোকুলচন্দ্র বিক্ষিপ্ত মনে পথ চলছিলেন। পুরনো দিনের অনেক স্মৃতি ভাসা ভাসা মনে পড়ছিল। সে সময় পথ নিয়ে কত যে উদ্দীপক গান লেখা হয়েছিল। আজাদ হিন্দ ফৌজের সেই বিখ্যাত 'কদম কদম বাড়ায়ে যা' আর নজরুলের 'চল চল চল ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল' আজও উজ্জীবিত করে তোলে। হালে সুভাষ মুখার্জির 'পথই একমাত্র পথ' লাইনটাও বেশ মনে গেঁথে আছে।

হঠাৎই গোকুলচন্দ্রর মনে হল, ওপরমহলের চেনা পরিচিতদের কাছে গিয়ে সমস্ত ঘটনা জানিয়ে বিহিত চাইলে কেমন হয়? বিশ্বাস হারিয়ে পরক্ষণেই ভাবলেন, ওঁরাও তো এই দূষিত সামাজিক জলবায়ুতে নিশ্চিন্তে বেঁচেবর্তে থাকা আপসকামী। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতিতে দীক্ষিতদের অন্যতম এক একজন। থানাবাবুর মতো

একই উপদেশ দেবেন। সমস্যার কিস্যু সুরাহা হবে না তো খামোকা কিসের জন্য ফের সময় নষ্ট করা। দৌড়ঝাঁপ পণ্ডশ্রম।

গোকুলচন্দ্র পায়ে পায়ে প্রায় বাড়ির কাছাকাছি এসে পড়লেন। সন্ধ্যা-আহ্নিকের সময় হয়ে গেছে দেখে সহজ সোজা অন্ধকার গলিপথ ধরলেন। গলির বাঁকে পেছন দিক থেকে আসা সাইকেলটার গতি নরম হল। অল্প বয়সী আরোহীটি নিচু স্বরে বলল, থানায় নালিশ করে কাজটা ভাল করলেন না দাদু।

গোকুলচন্দ্র হকচকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। দ্রুত প্যাডেল চালিয়ে উধাও হয়ে যাওয়া ছেলেটির পেছন দিকটাই শুধু দেখতে পেলেন। চিনতে পারলেন না।

বাড়িতে নোটন মুখিয়েই ছিল। সোজাসুজি প্রশ্ন করল, তুমি থানায় গিয়েছিলে দাদু?

গোকুলচন্দ্র অস্বীকার করলেন না।

নোটন ফের জিজ্ঞেস করল, হেমু গোস্বামী লেনের ওদের নামে নালিশ জানিয়ে এলে?

না।

তবে যে ওরা আমাকে বলল।

হয়তো ওরা ভয় পেয়েছে তাই।

গোকুলচন্দ্র রাস্তায় সাইকেল থেকে ছুঁড়ে দেয়া হুমকির ঘটনাটা গোপন রাখলেন না। শুনে নোটন বিরক্তি প্রকাশ করল, নিজেকে তুমি বড্ড বেশি বীরপুরুষ ভাব। সব সময় অন্যদেরকে আণ্ডার এস্টিমেট করা অভ্যাস তোমার। ওরা কিন্তু মোটেই ভয় পাওয়ার ছেলে না। যেভাবে শত্রু বাড়িয়ে যাচ্ছ তাতে আমি বাবাও টার্গেট হয়ে পড়ব। শেষ পর্যন্ত পাড়ায় টেকা দায় হবে।

গোকুলচন্দ্র কোনও জবাব দিলেন না। বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না। সন্ধ্যা-আহ্নিক করতে চলে গেলেন।

রাত্রে ফের প্রশ্নর মুখে পড়লেন গোকুলচন্দ্র। খাবার টেবিলে অসম্ভব গম্ভীর নেপালচন্দ্র বললেন, বিকেলে তুমি থানায় গিয়েছিলে বাবা?

গিয়েছিলাম। দুধের বাটিতে শেষ চুমুক দিয়ে গোকুলচন্দ্র পাল্টা প্রশ্ন করলেন, নোটন লাগিয়েছে বুঝি? বাপব্যাটায় মিলে কী শাস্তি দিতে চাও বলে ফেল।

এটা তুমি কী বলছ! অবাক অপ্রস্তুত নেপালচন্দ্র বিনম্র সুরে বললেন, থানার ও সি তালুকদার আমাকে সব বলেছেন। আমি আরও দু'একজন ওয়েল উইশারের সঙ্গে আলোচনা করেছি। সকলেরই এক কথা, জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে বিবাদে যাওয়া উচিত হবে না। রাজনীতিতে আজকাল আর প্রকৃত দেশসেবক

আদর্শ পুরুষ কোথায়? অধিকাংশই তো প্রফেশনাল ধান্দাবাজ। নয়তো ক্রিমিনাল। থানা পুলিশও নিরপেক্ষ না। ভাবগতিক দেখেশুনে সাধারণ ছাপোষা মানুষরা ভয়ে জবুথুবু হয়ে দিন কাটাচ্ছে। তোমার আমার সাপোর্টে কেউ এগিয়ে আসবে না। একা একা লড়াই করা যায় কখনও? তুমি আজ আছ কাল নেই। নোটন আর আমার দিকটা ভাববে না তুমি?

গোকুলচন্দ্র নিরুত্তর হাতমুখ ধুতে উঠে দাঁড়ালেন।

নোটন ধৈর্য হারিয়ে মুখ খুলল, যে যা বলছি শুনে যাচ্ছ। কোনও জবাব দিচ্ছ না কেন? কিছু অন্তত বলবে তো?

গোকুলচন্দ্রর চোখে বিস্ময়ের ভাবান্তর লক্ষ্য করা গেল। কপালে কয়েকটি রেখা ফুটে উঠল। বিষাদ বিবর্ণ ঠোঁটে উদাস জবাব দিলেন, বলার মতো কিছুই নেই তো কি আর বলব?

গোকুলচন্দ্র আর এক মুহূর্ত দাঁড়ালেন না। হাতমুখ ধুয়ে শোওয়ার ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। উত্তরসূরিদের জন্য উদ্বেগ আশঙ্কায় গোকুলচন্দ্রর ঘুম আসছিল না। বিছানায় ছটফটিয়ে যুতসই একটা কিছু উপায় সিদ্ধান্ত হাতড়ে বেড়ালেন। ইস্পাত-কঠিন বুকের ভেতরটায় যে ধস নামছে তা টের পাচ্ছিলেন। নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট বোধ হচ্ছিল। বেশ কয়েকবার জল খেয়ে বাথরুমে ঘুরে এলেন। শেষ রাতের দিকে যা একটু ঘুম হল।

পরদিন সকালেই খবর এল, মদের দোকানের সামনে কারা যেন নোংরা জঞ্জাল ফেলে রেখে গেছে প্রচুর। মাংসের দোকানের সাটারে লেপা হয়েছে মানুষের ময়লা। নেপালচন্দ্রর ঘরে ছুটে এল নোটন। নোটনকে সঙ্গে নিয়ে গোকুলচন্দ্রর ঘরে ঢুকলেন নেপালচন্দ্র। দু'জনেই রীতিমতো উত্তেজিত।

গোকুলচন্দ্র পূজা-আহ্নিক সেরে এসে ছেলে আর নাতির বিক্ষোভের সামনে পড়লেন। অভিযোগ আক্রমণ লাগামছুট বাক্যবাণ এবার ঘরের আপনজনদের দিক থেকে। গোকুলচন্দ্র দুর্বল হয়ে পড়লেন। অনড় নির্বাক দাঁড়িয়ে থেকে বুঝতে পারছিলেন, আপসহীন লড়াইয়ের মানসিকতা আর ব্যক্তিত্ব-অহঙ্কারে চিড় ধরছে ভেতরে ভেতরে।

নেপালচন্দ্র বললেন, এখনও সময় আছে গোয়ার্তুমি থেকে একটু সরে আসো বাবা।

নোটন অনুরোধ জানাল, শান্তিতে বেঁচে থাকার জন্য কিছু একটা পথ খুঁজে বের করো দাদু।

ভবিষ্যতে অপ্রিয় যে সব ঘটনা ঘটতে পারে ও সি-র বলা সেই আশঙ্কাগুলি

গোকুলচন্দ্রর স্মরণে এল। স্পষ্টতই বুঝতে পারলেন, নেপু আর নোটনার নিশ্চিন্ত ভবিষ্যতের জন্য একটি মাত্র পথই খোলা আছে এখন। সেটা হল, ওই বদখত চেহারার নচ্ছার ছেলে দু'টির কাছে নিজের অসহিষ্ণু উদ্ধত আচরণের জন্য মার্জনা ভিক্ষা চাওয়া। অর্থাৎ কিনা ওদের হুমকিমতো পায়ে পড়া ব্যাপার স্যাপার আর কী। ছেলে আর নাতি সেরকমই কিছু আশা করছে কি না গোকুলচন্দ্র তা জানতে চাইলেন।

ওদের দু'জনের তরফ থেকে তাৎক্ষণিক কোনও জবাব পেলেন না। নীরব সম্মতি মনে করে গোকুলচন্দ্র বললেন, একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী নীতিনিষ্ঠ আশি বছর বয়সী ব্যক্তির পক্ষে এভাবে আত্মসমর্পণ কেমন করে সম্ভব?

অসম্ভব বলে কিছু থাকতে পারে না বাবা। দুর্বলচিত্তের নেপালচন্দ্র বললেন, ছোনাকে আমি বুঝিয়ে সুঝিয়ে ডেকে আনব। ওর কাছে অন্তত একবারটি তোমার দুর্ব্যবহারের জন্য দুঃখ প্রকাশ করো। বাকিটা আমি আর ছোনা মিলে ঠিক সামলে নেব। নইলে আমার কারবার লাটে উঠে যাবে। এরপর জঞ্জাল ময়লা এসে বাড়ির সদর দরজায় পড়বে। নোটনার মেজাজ তো ভাল করেই জানো। এমন ঝাঁপিয়ে পড়বে যে ওকে বাঁচিয়ে রাখাই মুশকিল হবে।

নোটন সহমত হতে পারল না। অন্যমত ব্যক্ত করল, ওভাবে ইজ্জত খোয়ানোর চেয়ে বরং ছগনলালকে দোকানটা দিয়ে দাও। বেশ কিছু দিনের জন্য তীর্থধর্ম করতে যাও। যত আক্রোশ তো এখন তোমার ওপর। আউট অব সাইট, আউট অব মাইণ্ড। অনেক দিন কেটে গেলে এসব ঘটনা কেউ আর মনে ধরে রাখবে না। তাতে তোমার সম্মান-উঁচু মাথাটা যেমন আছে ঠিক তেমনই থাকবে।

গোকুলচন্দ্র দু'টি প্রস্তাব পরামর্শই মন দিয়ে শুনলেন। তাৎক্ষণিক কোনও সিদ্ধান্তের কথা জানালেন না। গভীরভাবে আরও দু'চারদিন ভাববার সময় চেয়ে নিলেন।

গোকুলচন্দ্র এক সময় অমানবিক অত্যাচারী ইংরেজদের বর্বর কুশাসনের কবল থেকে স্বদেশভূমির সার্বিক মুক্তি চেয়েছিলেন। স্বাধীন নতুন দেশ গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। সেই স্বপ্নভঙ্গ হয়েছিল অনেকদিন আগেই। তখন থেকেই আত্মতৃপ্তিতে ব্যর্থ হওয়া বিরক্ত বিমুখ।

অতি সাম্প্রতিক ঘটনার পর থেকে গোকুলচন্দ্রর মনে বিতৃষ্ণা এসে বাসা বাঁধল। উদ্যমহীন হতাশ অসন্তুষ্টচিত্তে নিরিবিলি নির্জন কোনও নির্বাসনে চলে যেতে ইচ্ছে হল। সর্বপ্রথম তিনি পার্থিব সৃষ্টি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিতে আবেগ আতিশয্য আরাম সুখ ভোগ বর্জন করলেন। তারপর সীমাবদ্ধ ার দেয়ালের মধ্যে নিজেকে সম্পূর্ণ গুটিয়ে নিলেন। সবশেষে আরও বড় রকম

অনর্থ আশঙ্কায় কথার ওপর শাসন কর্তৃত্ব কায়েম করে নীরব নিশ্চুপ মৌনী হয়ে গেলেন।

তেরো দিন একান্তে মানসিক নিস্তব্ধতা চিন্তা নিয়ন্ত্রণ আর মনের বিশ্রামের পর গোকুলচন্দ্র কাক ডাকা আবছা আলোর ভোরে গঙ্গাস্নানে গেলেন। স্নানান্তে পূর্ব আকাশের নবীন সূর্যকে কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণামপূর্বক বন্দনা মন্ত্র পাঠ করলেন। ঘরে ফিরে এসে শুচিবস্ত্র পরলেন। ঠাকুর ঘরে দীর্ঘক্ষণ পূজার্চনা করলেন। নিরম্বু উপবাসীটি অতঃপর টেবিলে কাগজকলম নিয়ে লিখলেন, চরিত্রবান আদর্শনীতি-নিষ্ঠ আত্মসম্মান মর্যাদা-সম্পন্ন মানুষদেরই কেবল মেরুদণ্ড থাকে। মেরুদণ্ডহীন মানুষেরাই আত্মসমর্পণকারী ও আপসকামী হয়। মনেপ্রাণে যাকে গ্রহণ করা যায় শুধুমাত্র তার কাছেই আত্মনিবেদনে আনন্দ পাওয়া যায়। অন্যায়ের সঙ্গে আপসহীনরা কখনও আত্মঘাতী হতে ভয় পায় না। এই আত্মহননের নাম, জীবন উৎসর্গ।

ওইদিন সান্ধ্য পত্রিকার শিরোনামে চাঞ্চল্যকর সংবাদ ছিল, মাংসের দোকানে মা কালীর তেলচিত্রের সামনে স্বাধীনতা সংগ্রামী গোকুলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের রক্তাক্ত মৃতদেহ .........।

***ছবি ঃ পুতুল ঘোষাল***

**জন্ম** : ১৯৪৩। অধুনা বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলায়। **শিক্ষা** : কলকাতার সুরেন্দ্রনাথ কলেজ থেকে বাংলায় স্নাতক। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এ। **রাজনীতি** : কলেজ ইউনিভার্সিটিতে ছাত্র ইউনিয়ন নির্বাচনে নির্বাচিত প্রতিনিধি। **জীবিকা** : পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গেজেটেড অফিসার হিসেবে অবসরপ্রাপ্ত।

**সাহিত্য** : দ্বৈত সম্পাদনায় 'কুঁড়ি' হাতে লেখা পত্রিকা প্রকাশ। কলেজে 'কাকলি' দেয়াল পত্রিকা সম্পাদনা। ১৯৬২তে সুরেন্দ্রনাথ কলেজ পত্রিকার সম্পাদক। বিশ্ববিদ্যালয়ে 'আজকাল পরশু' দেয়াল পত্রিকা অঙ্কন লিখন সম্পাদনা। লিটল ম্যাগাজিন 'প্রত্যয়' প্রকাশ ও সম্পাদনা 'দরবারী সাহিত্য'র সাহায্যকারী সম্পাদক **অঙ্কন** : বহু পত্রপত্রিকা ও গ্রন্থের প্রচ্ছদ শিল্পী উল্লেখযোগ্যর মধ্যে অন্যতম 'সুরেন্দ্রনাথ কলেজ পত্রিকা', 'তারাশঙ্কর নাট্যসমগ্র', 'কবিয়াল কবিগান', 'বোধিসত্ত্ব কল্পকথা' নিরূপ মিত্রর নাটক 'আততায়ী ও একা' ইত্যাদি। হস্তশিল্প মৃৎশিল্পেও পারদর্শী। **লেখা প্রকাশ** : উল্লেখযোগ্য যেসকল পত্র পত্রিকায় লেখা প্রকাশিত হয়েছে—দেশ, আনন্দবাজার, আনন্দমেলা, বর্তমান, প্রতিদিন, আজকাল, যুগান্তর, অমৃত, বসুমতী, সত্যযুগ, বঙ্গলোক, ধবনি, দ্বীপবাণী,শিলাদিত্য ইত্যাদি। **প্রিয় নেশা** : ভ্রমণ। **বিশেষ পছন্দ** : প্রকৃতি। নির্জন নদী তীর। শিউলি ফুল। গোলাপি রঙ। **অপছন্দ** : হৃদয়হীনতা।

একথা অনস্বীকার্য, বাজার-চলতি গল্প উপন্যাসের জনপ্রিয়তা তাঁর নেই। নেই, বিশাল ব্যাপক আলোকিত প্রচার-পরিচিতি। তবুও, বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্প জগতের আলোচনায় অন্যতম যোগ্য ব্যক্তিত্ব প্রভাস ভদ্র।

গল্প লেখেন অনেকেই। তিনি আরও বেশি কিছু। কেননা, তাঁর গল্পে উৎকীর্ণ থাকে একটি সুস্পষ্ট বক্তব্য—প্রত্নযুগের শিলালিপির মতো। মুখ ঢেকে-যাওয়া বিজ্ঞাপনের ভাষা নয়; একথার সমর্থন মেলে বাংলা সাহিত্যের বিদগ্ধ সমালোচক থেকে বরেণ্য কথাকারের কলমেও। এমনকি, শিল্প বিষয়ক শেষ কথা বলার অধিকার যাঁর, সেই পাঠকেরও। তাঁর নিজের কথায়ও অভিন্ন সুর, 'বক্তব্য বলতে যা কিছু আমার—গল্পতেই।'

ভাষা প্রভাসের হাতে সুঠাম, ঋজু—যেন গান্ডীবের শর, যা দিয়ে অনায়াসে বিদ্ধ করেন বিষয়বস্তুর চোখ—সহজাত পর্যবেক্ষণ শক্তিতে।

'দেশ' ও 'বর্তমান'-এ প্রকাশিত ব্যতিক্রম একজন প্রভাস ভদ্র-র এমনই নির্বাচিত বারোটি গল্পের সমৃদ্ধতর সংকলন 'অন্তত একজন।'